ভগিনী নিবেদিতা

প্রকাশকের কথা

অনেক বই-এর মাঝে আমরা কদাচিৎ দু'একটি বই হাতে পাই। এমন বই যাদের বিষয়বস্তু যেমন অনন্য, তেমনি তাদের ভাষা। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে ফেলে দেওয়ার একটা সর্বনাশা প্রবণতা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা জানি না বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানুষ তার ধ্রুপদী ভাবনাচিন্তাকে কতখানি ও কীভাবে বর্জন করতে চায়। আধুনিক বিশ্ব যে সমাজ উপহার দিতে চায় তা এতই গতিময় যে সেখানে দু'বার ভাবার অবকাশ বিরল। কিন্তু আমাদের প্রাচীন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, ঋষিরা তো আমাদের ভাবনা ভাবছেন গুটি কয় মানুষ যাঁরা বাণিজ্যিক জগতকে আলো দেখাতে ব্যস্ত, মানুষের মননকে সেভাবে নয়। সুদূর কোন্ এক অঞ্চলের কোন্ এক সংস্কৃতিতে লালিত কোন্ এক ব্যক্তির হাতে আছে এমন যাদুকাঠি যার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন ভাষা তথা সংস্কৃতির আবহাওয়াতে জাত মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ নিজে বুঝতে এবং ভাবতে ভুলে যাচ্ছে।

আমরা সেই দুরবস্থা হতে একটু রেহাই পেতে চাই। কিন্তু চাই বললেই তো পাওয়া যাবে না। চাইবার শক্তিও থাকা চাই এবং যেটা চাই সেটা কেমন তাও জানা চাই। এতসব চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা খুঁজে চলেছি এমন সব বই যেগুলির আবেদন চিরন্তন, যেগুলি ভাবিয়েছে আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে যাঁরা বহন করেছিলেন বাংলার সেই বহু-কথিত নবজাগরণের আলোকবর্তিকা। ইদানীং পৃথিবী ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকায় আমাদের সেই মনন যেন হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য সব ক্ষুদ্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হয়ে। আমরা ক্ষুদ্রকেই বৃহৎ আকার দিতে চাই এবং সেজন্য বেছে নিতে চাই এমন কিছু বই যারা সর্বদাই বৃহৎ।

এই বইখানির জন্য বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ-এর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এই বই-এর অনুলিপি লিখে সাহার্য্য করেছেন আমার সহধর্মিণী অরুণা ভট্টাচার্য। তাঁকে এবং বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পাঠক এই বৃহৎকে অনুভব করলেই বুঝব ক্ষুদ্রের এই বৃহৎ প্রচেষ্টা মহৎ।

সম্পাদকীয়

প্রেসিডেন্সি কলেজের ডাকসাইটে ছাত্র, ময়মনসিংহের দুয়াজানি গ্রামের খ্যাতনামা সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি (১৮৮৫-১৯৬৫) তিনটি বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে (সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতি) যতখানি না সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করেছিলেন তাঁর লেখনীর পরাক্রম দেখিয়ে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের চিন্তার স্বচ্ছতা এবং অবলোকন শক্তি; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকার আশ্রয় (বস্তুত, একসময়ে তিনি এই মাসিক পত্রিকার সহ-সম্পাদকও ছিলেন) গিরিজাশঙ্করের প্রকাশকে ত্বরান্বিত এবং বলশালী করে তুলেছিল। তারই ফলে রচিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি ভাবগর্ভ গ্রন্থ — যাদের কেন্দ্রবিন্দুতে নিবাস করেছিলেন চৈতন্য-রামমোহন-রামকৃষ্ণদেব থেকে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মতো সমাজবিপ্লবীরা এবং বসবাস করেছিল সমগ্র বঙ্গদেশ তথা ভারতীয় সমাজ।

এঁদের মধ্যে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা — সেই সুবিদিত আইরিশ মহোদয়া — যিনি স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করে গোটা ভারতবর্ষটাকেই ভালোবেসে ফেললেন। সে ভালোবাসা কতখানি, ভারতবাসীর মতোই অথবা ততোধিক সে বিচার করার প্রয়োজন বোধকরি আজ আর নেই। নিবেদিতা 'অভারতীয়' — এই শব্দটি প্রয়োগের কোনও যোগ্যতা কি আর এখন আছে? স্বামীজির প্রতি তাঁর সানুরাগ শ্রদ্ধা তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্নিকৃষ্ট করেছিল — কিন্তু সেই সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি — তিনি ভারতীয়তার বিশাল অঙ্গনে ততদিনে তাঁর কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে গেছিলেন। স্বভাবতই দেশপ্রেমিক গিরিজাশঙ্কর ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে নিবেদিত-আত্মা নিবেদিতার স্বরূপ উদঘাটনে তৎপর হয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে (দেখতে দেখতে এরও পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল) পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এর ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে চলেছিল যখন — তখনই এটি সংশ্লিষ্টজনেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিছুটা দেরিতে হলেও ন-বছরের মাথায় এর দ্বিতীয় সংস্করণও মুদ্রিত হয়।

২

বইটিকে যাতে কেউ নিবেদিতার জীবনী বলে মনে না করেন — সে বিষয়ে লেখক আগেই পাঠককে অবহিত করে দিয়েছেন — বাইশ বছর বয়সে

স্বামীজি-সন্দর্শনের আগে মার্গারেটের যে জীবন — তা এই গ্রন্থের পরিধিভুক্ত হয়নি। সূচিপত্রটি দেখলেই লেখকের গ্রন্থরচনার পরিকল্পনাটি পাঠকের চিত্তগত হয়ে পড়ে। এবং তখনই পাঠক জানতে পারেন এটি একটি তথাকথিত বর্ণনাত্মক বই-ও নয়। সারা ভারতব্যাপী যে স্বাধীনতার একটা আন্দোলন সূচিত হয়েছিল — তারই কেন্দ্রে নিবেদিতাকে স্থাপিত করে গিরিজাশঙ্কর তৎকালীন ভারতীয় মানসকে অনুধাবন করার জন্যে যেমন স্বরাজ-পিপাসু নানা মানুষ ও তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগকে অনিবার্য করে দেখেছেন, তেমন সমসাময়িক ঘটনাবলিকেও এই গ্রন্থে বিজড়িত করে দিয়েছেন। স্বদেশী যুগের চরিত্র, কংগ্রেস ও তার অর্ন্তদ্বন্দ্ব, নানা পত্র-পত্রিকার ভূমিকা, ডন সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা, রাজনীতির বাইরে যে সাহিত্য-সংস্কৃতি জগৎ — তার সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ এক বিস্তারিত ও বিস্ফোরক পটভূমিকার জগৎটির আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন। একটা ইতিহাস কতগুলি ঘটনার সমাহার মাত্র নয় — ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রাসায়নিক ফল, গিরিজাশঙ্কর তাঁর গ্রন্থে তা প্রতিপাদনে উৎসাহী হয়েছেন।

পাঠকের অজানা থাকার কথা নয় যে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে নিবেদিতা কতখানি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাবনা হয়তো কিছুটা স্মৃতিতে এলোমেলো হয়ে থাকতে পারে ভেবে আমরা এর একটি সারসংক্ষেপ রচনা করে তাতে শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করেছি।

তাঁর ২৮ বছর বয়সে লন্ডনে বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাৎকারটিই (১৫ নভেম্বর ১৮৯৫) নোবেলের জীবনের শুভক্ষণ কিনা জানি না, কিন্তু মুক্তিকামী ভারতবর্ষের জীবনে তা যে শুভলগ্ন ছিল — তা সম্ভবত সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব আপোশহীন ছিল। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সাহায্যেই তিনি ব্রিটিশদের বোঝাতে সক্ষম হবেন যে, আর এখানে তাদের থাকা চলবে না। উত্তরভারত ভ্রমণে গিয়ে তাঁর ধারণা যে কত ভিত্তিহীন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ইংরেজের সম্রাজ্যবাদী স্বরূপ দেখে লজ্জা ও ঘৃণায় তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখলেন — 'এদেশের লোকের প্রতি ইংরেজের আচরণ সম্পর্কে কথা এই যে, তা দেখলে তোমার মুখ আমারই মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠত।' অতএব যে ভাষায় কথা বললে ইংরেজ শুনতে বাধ্য হবে, সে ভাষায় কথা বলার জন্যে নিবেদিতা প্রস্তুত হয়ে উঠলেন।

একটা প্রশ্ন মনে স্বভাবতই জেগে ওঠে — এই জাগরণ মন্ত্র উচ্চারণের উত্তরাধিকার নিবেদিতা কোথা থেকে পেয়েছিলেন। আমরা জানি — ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং তাঁরা এ সময় থেকেই স্বরাজ-এর জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন। তাঁদের মতো করে না হলেও স্বামীজির মধ্যেও একটা বিপ্লবী সত্তা বর্তমান ছিল — যা রূপায়ণের দায়িত্ব তিনি নিবেদিতাকেই অর্পণ করেছিলেন। স্বদেশী তরুণেরা গীতার সঙ্গে বিবেকানন্দের পুস্তিকারাজি অবশ্য পাঠ্য ভাবতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। স্বামীজি তাঁর অনুরক্তদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন — 'আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের উপাস্য দেবতা হোন ভারতজননী।' সেই বাণীই নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতজননীই তাঁর উপাস্য হয়ে উঠেছিলেন। এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্যে স্বামীজিকে অতিক্রম করে যেতেও তিনি দ্বিধান্বিত হননি। এবং এই শক্তিবলেই তিনি দেশমুক্তিকামী অরবিন্দকে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ তাঁকে নিত্য সক্রিয় করে তুলেছিল। সেজন্যেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একটি লেখায় (১৩৩৫, পৃ. ২০) স্পষ্টত বলতে পেরেছিলেন — 'তিনি যোদ্ধৃপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন।' এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি আর একটু এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন — 'নিবেদিতা দৃষ্টিভঙ্গী শুধু বৈপ্লবিক নহে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই অতি মারাত্মক রকমের বিপ্লববাদী, বিপ্লবকর্মী ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি তিনি 'Nihilist of the worst type' ছিলেন। এই শেষ মন্তব্যটি অবশ্য বিচার্য। তবে গিরিজাশঙ্কর এই মন্তব্য করেছিলেন 'শোনা কথা'র উপর ভিত্তি করে — এটুকুও আমাদের মনে রইল। শোনা কথা অনেক সময় গোনা উচিত নয় — তিনি মারাত্মক রকমের বিপ্লবী ছিলেন — তার জীবনের যাবতীয় তথ্য এই শোনা কথার প্রতিবাদ করবে অবশ্যই। এ কথা আমরা জানি যে, সরকার এক সময় তাঁকে কারান্তরালে নিয়ে যাবে — এ কথা অনুভব করে নিবেদিতা এ দেশ ত্যাগ করেছিলেন। অনেকে আবার এমন কথাও বলে স্বস্তি পান যে, যেহেতু তিনি শ্বেতাঙ্গিনী সেহেতু ব্রিটিশ ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর জানা-শোনার সুবাদে — তাঁর লোমস্পর্শ করবে কি? তাঁরা যদি জানতেন, সরকার তাঁর উপর কতখানি নজর রেখে চলেছিল এবং তাঁর চিঠিপত্র সব খুলে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁরা বোধহয় জানতেন না হোমরুল আন্দোলনে যোগ দেবার 'অপরাধে' শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তকে এক বছর অন্তরীন থাকতে হয়েছিল। তাছাড়া এই সব যে মহিলা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণাকর্মে, তাঁর লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন

তার পক্ষে মানসিকভাবেই মারাত্মক ধরনের বিপ্লবী হয়ে ওঠা মুশকিল ছিল। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ-নিবেদিতার বিপ্লবসাধনার সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারত। আমরা তা থেকে নিবৃত্ত হলাম এ কারণেই যে, এতদ্-সম্পর্কিত যে বইটি গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি লিখে গেছেন — সেটিও আমাদের পুনঃপ্রকাশের বাসনা আছে, তার জন্যে এই অধ্যায়টি এখানে মুলতুবি করে রাখা হল।

বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে চরম ও মধ্যপন্থী উভয় দলের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক উদ্ধার করে যদি কেউ প্রমাণ করতে চান নিবেদিতা বিপ্লবী হিসেবেই প্রধানত বড়ো ছিলেন, তাহলে তাঁর মানবত্বের কাছে তাঁকে ছোটো করে তোলা হবে। তাঁর সেবা ও আত্মোৎসর্গের জীবনের মহত্ত্ব তাতে ক্ষুণ্ন হবে। আমাদের মনে আছে একটি গ্রন্থে লর্ড কার্জনের অনৃতভাষণ যে, 'কোরিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার সময় মিথ্যে করে নিজের বয়স তেত্রিশ থেকে বাড়িয়ে, চল্লিশ বছর করে প্রেসিডেন্টের আস্থা অর্জন করেছিলেন' — তার প্রতিবাদে মিথ্যাচারী কার্জনের স্বরূপ উদঘাটনের জন্যে নিবেদিতা অমৃতবাজার ইংরেজি পত্রিকায় এর প্রতিবাদ করে চিঠি লিখেছিলেন। এটা কোনও রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষ ছিল না — কিন্তু মানবতার অবমাননা বলে বিনিদ্র নিবেদিতা 'সত্যের উচ্চতম আদর্শ'কে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এটাই সত্যকারের বিপ্লব। এখানেই তিনি ভারতীয়দের প্রতিনিধি এবং পরমাত্মীয়। বঙ্গভঙ্গের আদেশে প্রতিবাদে টাউন হলে আহুত সভায় নিবেদিতা ছিলেন না বটে, কিন্তু এই দিনের ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন — 'Partition of Bengal meeting. The black shadow'. উদাহরণ হাজারও দিতে পারা যায় কিন্তু কী প্রয়োজন দীপালোকের উজ্জ্বলতা মাপবার?

গিরিজাশঙ্করের এই বইটি প্রকাশের পর একে ঘিরে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছিল। তার কিছু কিছুর উল্লেখ আমাদের করতেই হবে। তাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে গ্রন্থটির গুরুত্বের লাঘব ঘটানো হচ্ছে। আসলে দুটি সত্য আমরা উদ্‌ঘাটন করতে চাইছি। এর প্রথমটি হল গিরিজাশঙ্করবাবু একটু প্রতারিত হয়েছিলেন নিবেদিতার ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেমঁর গ্রন্থটির উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ায়। আমাদের একটা বদভ্যাস হল বিদেশী গ্রন্থকারদের উপর নির্বিচার নির্ভরতা দেখানো। যে মেগাস্থেনিস-এর বিবরণকে আমরা বেদবৎ ভরসা করি — সেখানে দেখি তিনি লিখছেন এমনতর কথা — 'ভারতবর্ষে একপ্রকারের জাতি দেখিলাম, যাহাদের পায়ের পাতা পিছনের দিকে' অথবা তিনি এ দেশে একপ্রকারের জাতি দেখেছিলেন যাদের চোখ-নাক-কান নেই, একটা গর্তের সাহায্যে

তাঁরা আহার গ্রহণ করেন। সাধে কী বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসের ওপর এত হাড়ে চটা ছিলেন! রেমঁ তার বইতে (নারায়ণী দেবীকে ধন্যবাদ — তিনি বাংলা অনুবাদে এটিকে আমাদের পাঠায়ত্ত করে দিয়েছেন) উপযুক্ত তথ্য ব্যতিরেকেই এমন সব মন্তব্য করে গেছেন যা বিভ্রান্তিকর এবং ভিত্তিহীন। এগুলিকে যাচাই না করে গ্রহণ করা যায় না। আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে রেমঁর বই আগাগোড়া প্রবাদ-আশ্রিত। কিন্তু নিবেদিতার মতো মহীয়সীর জীবনী রচনা করতে হলে যে তথ্যনির্ভরতার প্রয়োজন ছিল — তা তিনি অবলম্বন করেননি অনেক ক্ষেত্রেই। বিদেশির লেখা বলে যে শ্রদ্ধার্জন স্বাভাবিক ছিল — তা এখানে ঘটেনি। গিরিজাবাবু প্রধানত সরল বিশ্বাসে একে অবলম্বন করায় অকারণ বিতর্কের ভাজন হয়ে পড়েছেন; আজকের পাঠক সেগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে এ বই পড়লে খুবই উপকৃত হবেন। কারণ দেশকালনির্ভর নিবেদিতার জীবন-বিশ্লেষণ ও আস্বাদনের মহৎ উপকরণ এখানে উপস্থিত।

দ্বিতীয় কারণটি হল — লিজেল রেমঁ-এর পাঠকেরাও একটু সচেতনভাবে তাঁর বইটিকে গ্রহণ করবেন।

অতঃপর আমরা গিরিজাবাবুকে, বইটি থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ বেছে নিয়ে, পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি। সংস্করণ মানে যে পুনর্মুদ্রণ নয়, সুধী পাঠকেরা তা জানেন বলেই আমাদের এই উদ্যোগ। এই বিষয়গুলি ইতোপূর্বে হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখ বিদ্বজন আমাদের গোচরীভূত করেছেন। আমাদের অধমর্ণতা অবশ্যই তাঁদের কাছে। আমি এখানে অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়-রচিত 'জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থের (এপ্রিল, ১৯৬০) পরিশিষ্টে উল্লিখিত দু'টি মন্তব্য আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থিত করছি।

এক, গিরিজাবাবু ডন সোসাইটি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পরিবেশন করেছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পনারঞ্জিত, বিভ্রান্তিকর ও ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমের জন্য অবশ্য গিরিজাবাবুকেই সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। কারণ, ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা প্রসঙ্গে তিনি অনেক অনেক বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন ফরাসি লেখিকা লিজেল রেমঁ রচিত নিবেদিতা সম্বন্ধে "প্রামাণিক" (?) বইখানির ভিত্তিতে। ফরাসি লেখিকা রেমঁ যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, শুধু সেই অংশটুকু পাঠ করলেই পক্ষপাতশূন্য পাঠক বুঝতে পারবেন যে, ইতিহাস রচনার নামে লেখিকা কীভাবে বিনা প্রমাণে একের পর এক ভুল তথ্য ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন, আর

যেখানে তিনি অধ্যাপক বিনয় সরকারকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেটিও গোঁজামিল ছাড়া আর কিছু নয়। বিনয় সরকার ডন সোসাইটি সম্বন্ধে যে কথা কখনও বলেননি, বলতে পারেন না— এমন সব উদ্ভট কথা ডন সোসাইটি সম্বন্ধে ফরাসি লেখিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত বিষয়ে বিনয় সরকারের প্রামাণিক মতামত 'বৈঠকে' নামক গ্রন্থে ও অন্যান্য ইংরেজি-বাংলা পুস্তকে খোদাই করা আছে। এই সকল পুস্তকে বিনয়বাবুর প্রদত্ত বিবরণ আর রেমঁ লিখিত 'নিবেদিতা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে বর্ণিত কাহিনি (পৃ. ৪৩৫-৪৩৮) মূলত স্বতন্ত্র। রেমঁ রচিত গ্রন্থের ভুল-ত্রুটিগুলির পুনরাবৃত্তি গিরিজাবাবুর লেখায়ও বর্তমান। অবশ্য গিরিজাবাবু একমাত্র রেমঁকে ভর করে ডন সোসাইটি প্রসঙ্গ লেখেননি। কাজেই ওই বিষয়ে তাঁর ভুল-ত্রুটির জন্য রেমঁই সর্বাংশে দায়ী নন।

রেমঁ-র অভিমতে ও গিরিজাবাবুর মতে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে প্রেরণা পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) নিবেদিতা একটি নতুন মঠ স্থাপন করবার এক পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই নতুন মঠে ছাত্রেরা বছরে ছয় মাস পর্যন্ত ধ্যানধারণা করবে আর বাকি ছয় মাস তারা বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করে জ্ঞান আহরণ করবে ইত্যাদি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদিতা এই পরিকল্পনার কথা ২০ জানুয়ারি, ১৯০৩ সনে এক পত্রে ব্যক্ত করেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় নিবেদিতার পরিকল্পনা আর কার্যকারী হলো না। রেমঁ লিখেছেন : "এ-পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকারী না হলেও সতীশচন্দ্র মুখুজ্যের কাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল কিন্তু ঐ থেকেই।" (নারায়ণী দেবীর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ, ১৯৫৫, পৃ. ৪৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য) 'জয়শ্রী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সংখ্যায় (জুন, ১৯৫৩) গিরিজাবাবু নিবেদিতার ফরাসি চরিত থেকে অনুরূপ অংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করেছেন : "This project of Nivedita could not be realised, but at every point it served as the basis of the work which Satish Chandra Mukherjee laid down soon ... Mukherjee took it in hand, gave it a shape, a form, an aim— the possibility of offering to all its memers a complete political education." রেমঁ-র গ্রন্থ থেকে গিরিজাবাবু এই উক্তি উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত থাকেননি, আরও লিখেছেন : "প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভগিনী নিবেদিতা এই সোসাইটিতে যোগদান করেন" (জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, পৃ. ৯৯-১০০)। আবার 'শ্রীঅরবিন্দ' পুস্তকেও গিরিবাবু নিবেদিতা কর্তৃক ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা

দেওয়া, সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে নিবেদিতার এসে যোগ দেওয়া, উক্ত সোসাইটিতে নিবেদিতা কর্তৃক 'বিপ্লববাদ' (Terrorism অর্থে) প্রচার ইত্যাদি কথা কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ ও ৪৭৭ দ্রষ্টব্য)। এই সব ক্ষেত্রে ফরাসি লেখিকার মূল দুর্বলতা যেখানে, গিরিজাবাবুর বইয়ের দুর্বলতাও ঠিক সেখানে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থকারদ্বয় যথার্থ নির্ভরযোগ্য প্রমাণযোগে নিজ নিজ বক্তব্য দৃঢ়তর করতে অগ্রসর হননি। তাঁরা মন্তব্য করেই ক্ষান্ত থেকেছেন — মতামতের পেছনে প্রামাণ্য সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এবার এই সকল বিষয়ে আমাদের যা বক্তব্য তা উল্লেখ করছি।

দুই, 'জয়শ্রী' পত্রিকার (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০) "নিবেদিতা" শীর্ষক রচনায় গিরিজাবাবু লিখেছেন যে, 'ডন সোসাইটিতে রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও যদুনাথ সরকার মহাশয়গণ সদস্যদের নিকট বক্তৃতা প্রদান করতেন। এই তিনজনের কেহই একটিবারের জন্যও ডন সোসাইটির পথ মাড়াননি—বক্তৃতা দেওয়া তো দূরের কথা।' 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থে এই সকল নামের কোনও উল্লেখ নেই। শ্রদ্ধেয় হারাণচন্দ্র চাকলাদার এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ওইরূপ কথাই বলেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ডন সোসাইটিতে কখনও বক্তৃতা দেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন ও আমাদের ওই ভুল সংবাদের প্রতিবাদ করতে বলেন। 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত সোসাইটি সম্বন্ধীয় তথ্যগুলির এ বিষয়ের উপর আর এক প্রামাণিক সাক্ষ্য। গিরিজাবাবুর মতো ফরাসি লেখিকা রেমঁও তাঁর 'নিবেদিতা' চরিতে এই ধরনের ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছেন। রেমঁ লিখেছেন : "নামজাদা গুণীদের ভাষণ দেওয়ার জন্য ডাকা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন লোক সঙ্গীত নিয়ে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তারকনাথ দাস। কলকাতায় এসে রমেশচন্দ্র দত্তও "জাতীয় জীবনের লক্ষ্য" নিয়ে ধারাবাহিক কতকগুলো ভাষণ দিয়েছিলেন। গীতার উপরে ভাষণ দিতেন স্বামী সারদানন্দ। নিবেদিতা শুনতে যেতেন। ছেলেরা তাঁকে ঘিরে জানতে চাইত, 'কেমন লাগল' (নারায়ণী দেবীর 'নিবেদিতা' বিষয়ক বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ, পৃ. ৪৩৫)। এই সকল উক্তির মধ্যে এক সঙ্গে অনেকগুলি ভুল ও গোঁজামিলের সমষ্টি দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু-একবার সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "লোকসঙ্গীত নিয়ে" আর ব্রহ্মবান্ধব "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে" উক্ত সোসাইটিতে কখনও কোনও বক্তৃতা প্রদান করেননি। তারকনাথ

দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বামী সারদানন্দ ডন সোসাইটিতে কোনওদিনই বক্তৃতা দেননি—নিয়মিত বক্তৃতা প্রদান তো দূরের কথা। প্রামাণিক জীবনচরিত বা ইতিহাস রচনার নামে কী পরিমাণ ভুল ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশিত হতে পারে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাঠকগণ লিজেল রেমঁ-র 'নিবেদিতা' চরিতে দেখতে পাবেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে ওই গ্রন্থকে প্রামাণিক বলে মেনে নিয়ে এ দেশের অনেক সুচতুর লেখকও যে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন, গিরিজাবাবুর রচনা তার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য বহন করছে। বিনয় সরকারের বিদূষী কন্যা ডা. ইন্দিরা সরকারের মারফত ফরাসি লেখিকা রেমঁকেও এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।"

এর অতিরিক্ত বিবরণ দেওয়া এখানে বাহুল্যমাত্র হবে। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, গিরিজাবাবুর মাধ্যমে লিজেল রেমঁকে অনুসরণ করে 'যুগবাণী' সম্পাদক দেবজ্যোতি বর্মনও প্রতারিত হয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য, অমিয়কুমার মজুমদার সম্পাদিত 'Nivedita Commemoration Volume', পুণ ১৯৬৮)। অপিচ বক্তব্য — প্রাগুক্ত লেখকদ্বয় তাঁদের 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৭২) পরিশিষ্টে গিরিজাশঙ্করের 'ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় বিপ্লববাদ' গ্রন্থের একটি অনুপুঙ্খ সমালোচনা প্রকাশ করেছেন। কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি সেদিকেও আকর্ষণ করি।

এগুলি অবশ্যই ত্রুটি কিন্তু সমগ্র বইটি এমনতর ত্রুটির উপর দাঁড়িয়ে আছে ভাবলে ভুল করা হবে। এই গ্রন্থে এই বিপ্লববাদের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং পরিপ্রেক্ষিত যেভাবে সূত্রাকারে পরিবেশিত হয়েছে— তা একজন ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির সামর্থ্যকেই ইঙ্গিত করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিতার ভূমিকা উপলব্ধি করতে হলে এই গ্রন্থের প্রাতিপদিক গুরুত্বকে স্বীকার করতে হবে। সে যাই ভেবে আমাদের এই পুনর্মুদ্রণের কল্পনা এবং পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে গিরিজাশঙ্করের অন্যান্য প্রায় দুর্লভ বইগুলিকেও আমার পাঠকদের সামনে উপস্থিত করতে পারব। এ বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী প্রকাশকদের আনুকূল্য আমরা সাদরে স্মরণ করি।

শ্যামলবাবুকে অভিনন্দন জানাই তাঁর সাহসী উদ্যমের জন্য।

বারিদবরণ ঘোষ

উৎসর্গ

বাংলার বিপ্লবে বিশ্বাসী
তরুণ ও তরুণীদের উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থটি উৎসর্গ
করিলাম

কলিকাতা। ১৩৬৭ গ্রন্থকার

ভূমিকা

ভগিনী নিবেদিতা

(মিস্ মার্গারেট নোবল : Miss Margaret Noble)

জন্ম : ১৮৬৭, ২৮শে অক্টোবর (আল্স্টার, উত্তর আয়ার্ল্যান্ড)
মৃত্যু : ১৯১১, ১৩ই অক্টোবর (দার্জিলিং, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ)
জীবনকাল : ৪৩ বৎসর, ১১ মাস, ১৫ দিন।

মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল :
২৮ বৎসর মাত্র যখন তাঁর বয়স, তখন লন্ডনে (১৮৯৫, ১৫ই নভেম্বর) বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁর এই ২৮ বৎসর ১ মাসের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা : (ক) তিনি আয়ার্ল্যান্ডের মেয়ে, ইংল্যান্ডের নয়। তাঁর পিতা, স্যামুয়েল রিচ্মন্ড নোবল — বিশেষতঃ, তাঁহার পিতামহ রেভারেন্ড (পাদরী) — আয়ার্ল্যান্ডকে ইংল্যান্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিপ্লবী মন লইয়া সংগ্রাম করিয়া ছিলেন। জন্মস্বত্বে তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী এবং বিপ্লবী। তাঁর মাতার নাম ইসাবেল নোবল।

(খ) তিনি আয়ার্ল্যান্ডের পার্নেল ও রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপাটকিন, এই উভয় বিপ্লবী দ্বারাই অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

(গ) আয়ার্ল্যান্ডের কতকগুলি বিপ্লবের কেন্দ্র ইংল্যান্ডে, বিশেষতঃ লন্ডনে, ছিল। বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি এই বিপ্লবের কেন্দ্রগুলিকে পরিচালনা করিতেছিলেন। আইরিশ সিন্ ফিন্, রাশিয়ার নিহিলিজ্ম, এই উভয় মতের সংমিশ্রণে তাঁহার মানসিক বিকাশ পরিস্ফুট হইতেছিল।

(ঘ) তিনি ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হন নাই। দারিদ্র্যের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এই শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে তাঁহার মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল।

(ঙ) তাঁহার দুইবার বিবাহের প্রস্তাব হয়। প্রথমবার (১৮৯০) তাঁহার প্রণয়াস্পদ যুবকটির মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার, বিবাহে ইচ্ছুক যুবকটি সহসা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া (১৮৯৪) তাহার পর্ব প্রণয়িণীকে বিবাহ করে। এই ঘটনায় তিনি মনে খুব আঘাত পান এবং ঠিক এই সময়েই বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

জীবনেতিহাসের এই প্রথম অধ্যায় আমি সবিস্তারে লিখি নাই। কারণ তাঁহার ফরাসী চরিতকার Lizelle Reymond, ইহা অতি নিপুণভাবে সবিস্তারে লিখিয়াছেন। এবং তাহার বাংলা অনুবাদও হইয়াছে (নারায়ণী দেবী)। তাছাড়া, এই ২৮ বৎসর ১ মাস জীবনের সহিত আমাদের দেশের যোগাযোগ বিশেষ কিছু নাই বলিলেই হয়।

আমার বন্ধু অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ, ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিত হইতে অনুবাদ করিয়া না দিলে, আমি এই গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম না। তাঁহার নিকট সহস্রবার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মার্গারেটের পিতা পার্নেলের অধীনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা ও পিতামহ ধর্মযাজক ছিলেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আইরিশ বিপ্লবের মধ্যেই মার্গারেটের ছাত্রীজীবন শেষ। পার্নেলের প্রভাব অরবিন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে প্রায় একই সময় সংক্রামিত হয়। পার্নেলের মৃত্যুতে (১৮৯১) অরবিন্দ কবিতা লিখিয়াছিলেন।

পার্নেলের নিয়মতান্ত্রিকতা হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পরে একাদিক্রমে ৪ বৎসর প্রিন্স ক্রপাটকিনের প্রভাবে আসিয়া নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহের দীক্ষা ও শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

নিবেদিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে যাইয়াও প্রথমবারের মতহ ব্যর্থ মনোরথ লইয়া লন্ডনে সশস্ত্র আইরিশ বিপ্লবের কেন্দ্রগুলির ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সময় (১৮৯৫, নভেম্বর) বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রস্তাব ভগ্ন হওয়াতে নিবেদিতা মনে খুব আঘাত পান এবং কিছুদিনেব জন্য লন্ডন হইতে হানিফ্যাক্স্ গিয়া মিস্ কলিন্সের (Miss Collins) সহিত বাস করেন। প্রথম বয়সে আজীবন কুমারী থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী হইবার সংকল্প করেন নাই।

আমি বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতা (১৮৯৫-১৯০২)-র সাত-আট বৎসর কোথায়, কখন, কতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহা নিবেদিতার 'The Master as I saw Him' গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। নিবেদিতা যাহা লিখিয়াছেন তদপেক্ষা বেশী কিছু বিস্তৃতভাবে লিখিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। বিশেষতঃ 'জয়শ্রী' পত্রিকায়* আমার 'নিবেদিতা' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবার কিছু

---

* 'জয়শ্রী' প্রত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ হইতেই আমি কিছু দিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' নাম দিয়া দুইটি বক্তৃতা দিয়াছি। এই গ্রন্থের জন্য সমগ্র পাঠ্যাংশের সম্পর্ক পরিশীলন ও ভ্রম সংস্কার করিয়া দিয়াছেন আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ (মন্টি) ঘোষ। তাঁহারই উৎসাহে এবং 'জিজ্ঞাসা' প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী স্নেহাস্পদ শ্রীশকুমার কুণ্ডু মহাশয়ের সর্ব প্রযত্ন তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

পরেই 'The Master as I saw Him' গ্রন্থ ও ইহার বাংলা অনুবাদ 'উদ্বোধন' অফিস হইতে — ঐ সম্পর্কে আমার কটাক্ষের পর — প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার অন্য এক গ্রন্থে ('শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ') — 'বরোদায় চৌদ্দ বৎসর' অধ্যায়ে আমি বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার কতবার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও বিস্তৃত লিখিয়াছি। এই দুই কারণের জন্য আমি বর্তমান গ্রন্থে উহার পুনরাবৃত্তি করি নাই।

বিবেকানন্দের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষার সময় ('Schooling Under him') নিবেদিতা যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তার মধ্যে — (ক) ইংল্যান্ডে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব, ১৮৯৮, কলিকাতা স্টার থিয়েটার; (খ) Kali, the Mother, কলিকাতা; (গ) ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব, কলিকাতা—বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নিবেদিতার 'Second Period' এ দুইটি বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, 'Kali — The Mother,' কলিকাতা; দ্বিতীয়, 'Indian Art,' নিউ ইয়র্ক। এই দুইটি বক্তৃতাতেই নিবেদিতার উপর স্বামীজির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একজন খৃষ্টান মহিলার পক্ষে মা কালীর ভক্ত ও অনুরাগী হওয়া সহজ পরিবর্তন নয়। অদ্ভুত পরিবর্তন। ইহাতে স্বামীজির শিক্ষা ও প্রভাব বিদ্যামান। দ্বিতীয় — ভারতীয় আর্ট সম্পর্কে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে নিবেদিতার পরবর্তীকালের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিল।

এই দ্বিতীয় অধ্যায় বিস্তৃতভাবে আমি এই জন্য লিখি নাই যে 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা ইহা নিজেই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার সহপাঠী ও বন্ধু স্বামী মাধবানন্দ (বেলুড় মঠের বর্তমান সেক্রেটারী) ইহার বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত অবস্থায় বহু বৎসর ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি 'উদ্বোধন' অফিস হইতে সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাছাড়া, লিজেল্ রেমন্ড-কৃত ফরাসী জীবনচরিতে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের অতিরিক্ত আমার কিছু লিখিবার নাই। বিশেষতঃ জীবনচরিত হিসাবে এই অধ্যায়ে নিবেদিতা চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তখনও বিচার বা প্রকাশ হয় নাই। তিনি তখন স্বামীজির নিকট শিক্ষার্থী মাত্র।

১১/১৩ কালীচরণ ঘোষ রোড,
সিঁথি, কলিকাতা-২ গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

GLEANINGS

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পূর্বে

ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে লন্ডন হইতে রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত এক জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষে কলিকাতায় কংগ্রেস হয়। এই কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্বে রেভারেন্ড ওজ ও মিঃ ওকাকুরা, এই দুইজন জাপানী ভদ্রলোক বেলুড় মঠে স্বামিজীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেলুড় মঠেই কিছুদিন বসবাস করিলেন। চিকাগোর মত জাপানে একটি ধর্ম মহাসভা হইবে, এবং স্বামিজী যাহাতে ঐ সভায় উপস্থিত হন, তাহারই জন্য এই দুই জাপানী ভদ্রলোক স্বামিজীকে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী বলিলেন তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি অবশ্যই যাইবেন।

মিঃ ওকাকুরা প্রাচ্য দেশীয় আর্টের এক অতি উচ্চ শ্রেণীর সমজদার ব্যক্তি। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে তিনি একজন আদর্শবাদী। তিনি স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেলেন। ভগিনী নিবেদিতা তখন লন্ডন হইতে ভারতাভিমুখে সমুদ্রপথে মোম্বাসা নামক জাহাজে রমেশ দত্তের সহিত অবস্থান করিতেছেন। স্বামিজী বুদ্ধগয়া হইতে কাশীতীর্থে আসিলেন। কাশীতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া মিঃ ওকাকুরা স্বামিজীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের মেলার পূর্বেই কাশী হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

"Yet he made one more journey, lasting through January and February 1902, when he went, first to Bodh Gaya and next to Benaras. It was a fit end to all his wanderings."

— The Master As I saw Him, p. 499

স্বামিজী কলিকাতায় ফিরিবার পর পৃথিবীর দূর দেশ হইতে তাঁহার অনেক শিষ্য এই সময় তাঁহার নিকটে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

"Many of his disciples from distant parts of the world gathered round the Swami on his return to Calcutta.

— Ibid, pp. 499-500

এই বেলুড় মঠেই মিঃ ওকাকুরা ও মিঃ তাই কো-য়ানের সহিত স্বামিজীর জীবিতকালে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সাক্ষাতের গুরুত্ব খুব বেশী। কেন না, পরবর্ত্তীকালে ভগিনী নিবেদিতার সহিত ওকাকুরার — প্রাচ্য সম্পর্কে একমত হইয়া — ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা দেয়।

ঠাকুরবাড়ীর অনেকের সহিত ওকাকুরার পরিচয় হয়। সরলা দেবীর সহিতও ওকাকুরার পরিচয় হয়।

মিঃ ওকাকুরা বিপ্লববাদী ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও প্রিন্স ক্রপাটকিন-এর দ্বারা (১৮৯০-১৮৯৫) প্রভাবান্বিতা হইয়া আইরিশ হোম রুল আন্দোলনে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল, মে ও জুন স্বামিজী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। এই তিন মাস এক ফোঁটাও ঠান্ডা জল তাঁহাকে পান করিতে দেওয়া হয় না। প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই তিন মাস তিনি দারুণ গ্রীষ্মেও এক ফোঁটা ঠান্ডা জল পান করেন নাই। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন —

"... The Swmi made a great effort in the spring of 1902, to recover his health and even undertook a course of treatment under which, throughout April, May and June, he was not allowed to swallow a drop of cold water. How far this benefitted him physically one does not know; but he was overjoyed to find the unflawed strength of his own will in gaing through the ordeal ... When June closed, however, he knew well enough that the end was near."

— The Master As I saw Him, pp. 502-03.

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামিজী নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে আর দেরী নাই, মৃত্যু আসিয়াছে।

২৮শে জুন প্রাতঃকাল। নিবেদিতা বাগবাজারে তাঁহার নূতন ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ দুইজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীতেই আসিতেছেন। নিবেদিতা উল্লাসে 'জয়, জয়গুরু' বলিয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজী একা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে থাম, চৌকাঠ, দেওয়াল ও একটি ডুমুর গাছ ধরিতে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। তারপর তিনি দোতলায় উঠিয়া গিয়া একখন্ড মৃগজীনে উপবেশন করিলেন। এই মৃগচর্মটির উপর বসিয়া স্বামিজী বহু বৎসর ধ্যান করিয়াছেন, এবং মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইহা তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে দান করিয়াছেন। স্বামিজী বলিলেন, "আমি এই বাড়ীটি পছন্দ করি। এখানে তোমার কাজ করিবার সুবিধা হইবে। ছোট শিশুটিকেও স্নেহ ও যত্ন করিবে, কেন না একটি ছোট কীটের মধ্যেও মহত্ত্ব লুক্কায়িত থাকে।" এই কথোপকথনের মধ্যে স্বামিজী কতকগুলি মাটির পুতুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। এগুলি নিবেদিতা

তাঁহার ছাত্রাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বামিজী আরও দেখিলেন যে, কাঠের বাক্সে ম্যাজিক লণ্ঠন ও 'মাইক্রস্‌কোপ' রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া স্বামিজী উৎসাহিত হইলেন। স্বামিজী বলিলেন, "আগামীকাল প্রাতে তুমি বেলুড় যাইও। তুমি সন্ন্যাসীদের সম্মুখে স্কুল সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালী বুঝাইবে।" নিবেদিতা অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। এই রকম এতটা তিনি আশাও করেন নাই। বিদায়ের সময় নিবেদিতা স্বামিজীকে বলিলেন, "নতুন বাড়ীতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় আপনি কি আসিয়া আশর্বাদ করিবেন?" স্বামিজী উদাস ভাবে মৃদু হাস্য করিলেন। নিবেদিতার স্কন্ধে হস্ত আরোপ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে (যাহার সহিত নিবেদিতা বহুদিন হইতে পরিচিত) বলিলেন, — "আমার আর্শীর্বাদ সর্বদাই তোমার উপর রহিয়াছে।" (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ১২৯-২২৪)

পরের দিন — ২৯শে জুন — স্বামিজীর আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা প্রাতে বেলুড় মঠে আসিলেন। মঠে উপস্থিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা দেখিলেন যে, স্বামিজী যেন সুখ ও দুঃখের উর্দ্ধে তূরীয় অবস্থায় আত্মস্থ হইয়া আছেন। সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষেই স্বামিজী ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা সুরু করিলেন। অনেকক্ষণ কথা-বার্তা হইল, বেলা বেশ বাড়িয়া উঠিল। সন্ন্যাসীগণ গভীর মনোযোগের সহিত স্বামিজীর বাণী শুনিতেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে সন্ন্যাসীগণ যে ঠিক ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, স্বামিজী তাহা জানিতেন। তাই, তিনি নিতান্ত নির্ভীক ও নিপুণভাবে নিবেদিতার জটিল চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের বলিলেন যে, স্বামিজীর নিজের মতই নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব কখনও কখনও এতই জটিল ও বিচিত্র বোধ হয় যে, সময় সময় একই মানুষের মধ্যে এরূপ বিচিত্র ও বিভিন্ন কর্মতৎপরতা সম্ভব মনে হয় না; কিন্তু মূলতঃ নিবেদিতা নিতান্তই নিষ্ঠাবতী — একাগ্র ধীশক্তি এবং আন্তরিক আত্ম-নিবেদনের বলে নিবেদিতার মধ্যে বহু বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। নিবেদিতা চলিয়া আসিবার পূর্বে স্বামিজী পুনঃ পুনঃ দুই বার তাঁহার মস্তক সস্নেহে স্বীয় করতলে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশার্বাদ করিয়াছিলেন। (ফরাসী জীবন চরিত)।*

নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামিজী নিবেদিতার সম্মুখেই মঠের সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রাঞ্জল ভাষায় বলিলেন যে, বহু ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ নিবেদিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

* NIVEDITA, Lizelle Reymond, pp. 219-224; translated from the original in French.

নিবেদিতার চরিত্রগত সত্ত্বা সম্পর্কে স্বামিজী তাঁহার মৃত্যুর মাত্র চার দিন পূর্ব্বে — এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। শুধু নিবেদিতাই যে স্বামিজীকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, স্বামিজীও নিবেদিতাকে ঠিক মতই চিনিতে পারিয়াছিলেন, যাহা অপর কেহ পারেন নাই।

স্বামিজী ২৮শে জুন বাগবাজারে নিবেদিতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চার দিন পর (৩রা জুলাই) নিবেদিতা নিজের মনে একটি প্রেরণা পাইয়া সহসা বেলুড় মঠে স্বামিজীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন বুধবার, একাদশী ছিল। ঐ দিন হিন্দু প্রথা অনুসারে উপবাস করিতে হয়। যে মুহূর্ত্তে স্বামিজী নিবেদিতার আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি নিবেদিতাকে তাঁহার খুব নিকটে আসিতে বলিলেন। এই অকস্মাৎ সাক্ষাৎ একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু। স্বামিজী বুঝিলেন যে, নিবেদিতা তাঁহার নিকট শেষ বিদায় চাহিতে আসিয়াছেন। স্বামিজী নিজে একাদশীর উপবাস করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিবেদিতার জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিলেন। নিরামিষ তরকারী, ভাত, ফল, দই — পাথরের থালা ও বাটিতে সাজাইয়া নিবেদিতার সম্মুখে দিলেন। নিবেদিতার আপত্তি সত্ত্বেও স্বামিজী নিজেই তাহাকে খাদ্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইলে একজন হাত ধুইবার জল ও তোয়ালে আনিল। স্বামিজী উহা সেই লোকটির হাত হইতে লইয়া নিজেই উপুড় হইয়া নিবেদিতার হাতের উপর জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। নিবেদিতা হতভম্ব হইয়া বলিলেন— "স্বামিজী এ কাজ ত আপনাকে আমারই করা কর্ত্তব্য।" স্বামিজী একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদের পা ধুইয়া দিয়াছিলেন।" নিবেদিতার মুখে আসিল ইহা সত্য, কিন্তু ইহা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বের ঘটনা।

কিন্তু তিনি ইহা বলিতে পারিলেন না। নিবেদিতা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। স্বামিজী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার মাথায় আশীর্বাদ করিলেন। চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিজী তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।*

নিবেদিতা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, কৃপণ যেমন বহু ধনরত্ন লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেইরূপ বাগবাজারে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত্রিই তাঁহার মন ঐরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল।

পরদিন (৪ঠা জুলাই) প্রাতঃকালে একজন সন্ন্যাসীকে দিয়া স্বামিজী

* The Master As I Saw Him, pp. 506-07.

নিবেদিতাকে একখানি "প্রসাদী" কেক্ (Cake) পাঠাইলেন। এই কেক্‌খানি সোনালী রঙের পাতায় আবৃত ছিল। এবং ইহার কিয়দংশ তিনি নিজের জন্য রাখিয়া 'প্রসাদ' করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। নিবেদিতা এই কেক্ প্রসাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং ঐ কেক্‌টি দুই হাতে তুলিয়া বারবার মাথায় স্পর্শ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন এইরূপ আনন্দ বিহ্বলতার মধ্যে কাটিল। রাত্রিতে ছাতের উপর বেলুড়ের দিকে মুখ রাখিয়া নিবেদিতা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। (ফরাসী জীবন চরিত)।

স্বামী সারদানন্দের চিঠি লইয়া (৫ই জুলাই) প্রাতে এক ব্যক্তি আসিয়া ভগিনী নিবেদিতাকে চিঠি দিল। চিঠিতে লেখা ছিল, — "প্রিয় নিবেদিতা, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। গতরাত্রে নয়টার সময় স্বামিজী চির নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তিনি আর জাগিবেন না। — সারদানন্দ"

"My dear Nivedita, the end has come. Yesterday Swamiji fell asleep at nine o'clock in the night, no more to awake.
—Saradananda"

চিঠির অক্ষরগুলি যেন নিবেদিতার চোখের সম্মুখে নাচিতে লাগিল। গৃহের ভিতর একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ শোনা গেল। নিবেদিতা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ঝি সব বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল। নিবেদিতা পত্রবাহকের সহিত তৎক্ষণাৎ বেলুড় অভিমুখে রওনা হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এই সংবাদ সকলেই জানিতে পারিয়াছে এবং হতাশভাবে বেলুড়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর

১৯০২, ৫ই জুলাই। যে লোকটি স্বামী সারদানন্দের চিঠি আনিয়াছিল, ভগিনী নিবেদিতা তাহার সঙ্গেই ঝড়ের মত বেগে বেলুড় অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। তিনি মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সমস্ত চুপচাপ। নিবেদিতা একাকী উপরে স্বামিজীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরটি অতিশয় অন্ধকার। কেন না, দরজা জানালা সমস্তই বন্ধ ছিল, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছিল। মেঝেতে স্বামিজীর মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মৃতদেহটি হরিদ্রা বর্ণের পুষ্পে আবৃত ছিল। নিবেদিতা মৃতদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং স্বামিজীর মস্তক নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। নিকটেই একখানি পাখা পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া স্বামিজীর মুখে বাতাস করিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা কোনরূপ শোক প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার শোক যেন মরিয়া

গিয়াছে। নিবেদিতা মনে ভাবিলেন যে, অমরনাথে স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, শিব তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন। এখন তিনি নিজের ইচ্ছাতেই তাঁহার ক্লান্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নীচে শব্দ শোনা যাইতেছিল, নিবেদিতা নিজের ক্রোড় হইতে স্বামিজীর মস্তক নামাইয়া যেমনটি ছিল সেইরূপ ফুলের বালিশের উপর পুনরায় স্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং গতকল্য ভোর হইতে মৃত্যুর প র্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামিজী কি কি করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতে লাগিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "আমি কিছুদিন হইতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিলাম না। উহা যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের মত দেখাইতেছিল।"

তারপর একটি জনতা ঘূর্ণাবর্ত্তের মত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। নিবেদিতা বুঝিলেন যে এইবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন চলিতেছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিবেদিতা এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, হে ঈশ্বর, কেন একজন অপরকে দিবার জন্য নিজেকে এইরূপভাবে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিবে?*

নীচে মঠের সম্মুখে উঠানে স্বামিজীর মৃতদেহকে স্থাপন করা হইল। একটি বিরাট জনতা চারিদিকে জড় হইয়াছে। স্বামিজীর বদনমন্ডল যুবকের মত দেখাইতেছিল। তাঁহার মুখ অনাবৃত ছিল, যেন তিনি ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম। সন্ন্যাসীরা স্তব্ধভাবে সারি সারি দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের সকলেই মস্তক মুন্ডিত।

বিদায় প্রার্থনা খুব সংক্ষিপ্ত। একজন সন্ন্যাসী একটি মসলিন কাপড়ের উপর পায়ে আলতা দিয়া স্বামিজীর পদচিহ্ন তুলিয়া লইলেন। প্রদীপ লইয়া মৃতদেহকে আরতি করা হইল। মন্ত্র উচ্চারিত হইল; ধূপ জ্বালান হইল। ঘন ঘন হৃদয়-বিদারক শঙ্খধ্বনি করা হইল। শেষ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সন্ন্যাসীরা জোড় হস্তে নতজানু হইলেন। কেহ কেহ তিনবার ভূমিতে উপুড় হইয়া প্রণাম করিলেন; কেহ কেহ বা তাঁহাদের মস্তক স্বামিজীর পায়ের উপর স্থাপন করিলেন।

তারপরে একটি ছোট শোভাযাত্রা করিয়া স্বামিজীর মৃতদেহ সন্ন্যাসীরা ধীরে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। "জয়, গুরু মহারাজ কি জয়" ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

* "Why must one renounce oneself in order that one may give oneself to others?"

মঠের দক্ষিণদিকের কোণে একটি প্রকাণ্ড বিল্ব বৃক্ষের তলদেশে শবাধারটিকে নামান হইল। আর একটু নীচের দিকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে একটি সুসজ্জিত চিতাশয্যা নির্মাণ করা হইল। এই স্থানটি স্বামিজী নিজেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

নিবেদিতা একটি বৃক্ষের তলে একা বসিয়াছিলেন। ভিড়ের মধ্যে পুষ্প আচ্ছাদিত স্বামিজীর শবটি সন্ন্যাসীরা যখন স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন উহা তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলেন না। দুইবার শবাচ্ছাদিত হরিদ্রা পুষ্পগুলি জনতার মাথার উপর দিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। উহা তরঙ্গের উপর ফেনা রাশির মত বোধ হইতেছিল। স্বামিজীর রেশমী গেরুয়ার কিয়দংশ বাতাসে উড়িতে দেখা গেল। দুই দুইবার নিবেদিতা "জয়, জয়" বলিয়া চিৎকার করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি অনুভব করিতেছিলেন যেন তিনিও ঐ সঙ্গে মরিয়া যাইতেছেন। এবং তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে তাঁহার মুখ গুঁজিয়া রাখিলেন। নিবেদিতা প্রার্থনা করিলেন, "হে স্বামী, এমন করুন যাহাতে আমার ইচ্ছামত নয়, আপনার ইচ্ছামত আমি কাজ করিয়া যাইতে পারি। হর, শিব, শিব।"*

নিবেদিতা রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন। বাতাস উঠিল, চিতার ভস্ম বাতাসে উড়িতে দেখা গেল। এক টুকরা হরিদ্রা বর্ণের গেরুয়া নিবেদিতার ক্রোড়ে বাতাসে উড়িয়া আসিয়া পতিত হইল। উহা স্বামিজীরই পরিধেয় গেরুয়ার কিয়দংশ যাহা চিতার আগুনে কিছুটা দগ্ধ হইয়াছে। ধীরে ধীরে চিতার আগুন নিভিয়া গেল। হঠাৎ অনুপস্থিত বন্ধুদিগের কথা তাঁহার মনে পড়িল। ধীরামাতা, বোস ইত্যাদি। তাঁহার মায়ের মুখখানি তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার মাকে তিনি ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার মায়ের কোমল হস্তের স্পর্শ, এই শোক দূর করিবার জন্য তিনি গাত্রে অনুভব করিলেন। নিবেদিতা যখন তাঁহার মার উদ্দেশ্যে ডাকিতেছিলেন, তখন বিশ্বস্ত বন্ধু স্বামী সদানন্দ উত্তর দিলেন। স্বামী সদানন্দ তাঁহার কাছে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নিবেদিতা এতক্ষণ জানিতে পারেন নাই। এখন জানিতে পারিয়া তাঁহার কিছুটা সান্ত্বনা বোধ হইতেছিল, এবং তিনি তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন।

রাত্রিতে প্রার্থনা আরম্ভ হইল। নিবেদিতা উঠিলেন, বলিলেন, "সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু আমার সময় নাই। স্বামিজী আমাকে একটি কাজের ভার দিয়া গিয়াছেন, আমাকে উহাই করিতে হইবে।" যখন তিনি উঠিয়া চলিতে

* "Do that I may act in life according to your will, not according to mine, Hara, Siva, Siva".

লাগিলেন, তখন শুধু অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন; "হে প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" স্বামী সদানন্দ একটু দূরে দূরে নিবেদিতাকে অনুসরণ করিতেছিলেন। স্বামী সদানন্দ কাঁদিতেছিলেন। (ফরাসী জীবন চরিত)।

ভগিনী নিবেদিতার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৭ই পৌষ বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সেই বিদ্যালয়ে গাছতলায় বসিয়া ছাত্রদের উপনিষদ পাঠ করান। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই তিনি বোলপুর হইতে কলিকাতা ফিরিতেছিলেন; হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলেন, কাল রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। শুনিবামাত্রই তিনি দৌড়াইয়া বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গগনস্পর্শী চিতার আগুন চারিদিকে লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া প্রচন্ডবেগে জ্বলিতেছিল। উপাধ্যায় চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কে যেন তাঁহার মনে একটা প্রেরণা জাগাইয়া বলিল, "তুমি, তোমার যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়া, বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয় ব্রত গ্রহণ কর।" সেই মুহূর্তেই স্থির করিলেন যে, তিনি বিলাত যাইবেন; হিন্দুর দর্শনাদি শাস্ত্র প্রচার করিবেন।

উপাধ্যায়ের যে কথা সেই কাজ। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর, সঙ্কল্প করিবার তিন মাস মধ্যে, মাত্র সাতাশ টাকা পকেটে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। ৫ই নভেম্বর অক্সফোর্ড পৌঁছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অক্সফোর্ডের কলেজগুলি খোলা ছিল। তিনি একমাসের অল্পকাল মধ্যে অক্সফোর্ডে তিনটি বক্তৃতা দিলেন : (১) হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ, (২) হিন্দুর নীতিশাস্ত্র, (৩) হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান। ডাঃ কেয়ার্ড এই তিনটি বক্তৃতাতেই সভাপতি হইয়াছিলেন। তারপর 'Hindu Thought and the Western Culture' সম্বন্ধেও একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

চিতার আগুন নিভিলে পর ভগিনী নিবেদিতাও এই কথা বলিতে বলিতে ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন, "স্বামিজী আমাকে একটি কাজের ভার দিয়াছেন। আমাকে উহা করিতে হইবে।" নিবেদিতা ও উপাধ্যায় এই দুই ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির নিকট হইতে একই সঙ্গে প্রেরণা পাইয়া বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উভয়েই ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" ৬ই জুলাই নিম্নলিখিতরূপে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিল :

"We deeply regret to announce that Swami Vivekananda is dead. The report is that he came from a walk, lay down on a charpoy to rest, and died no doubt from heart disease.

He had also been suffering from diabetes. He did eminent service to the Hindus by his lectures in America. At the Chicago Exhibition he proved a prominent figure. Indeed, so great was his power that he succeeded in converting a few westerners to his own faith as Swami Abhayananada is doing now. He was a disciple of Paramhangsa Ramkrishna who, while living, surrounded himself by a large number of devoted followers. On the death of the Paramhangsa his mantle fell upon the shoulders of Swami Vivekananda. In India Vivekananda and his colleagues did much good work in alleviating distress. Though a disciple of the Paramhangsa, Vivekananda chalked out a path for himself. The Paramhangsa was a bhakta but Vivekananda preached Yoga and there is a wide divergence between the two cults. Vivekananda also preached the Avatarship of his guru, the Paramhangsa, and this led Swami Abhayananda whom he had initiated and who is now in our midst delighting the Calcutta public by sweet discourses of the Lord Gauranga, to secede from him. Vivekananda also quarelled with the Theosophists and this led at one time to a hot controversy between him and the illustrious Cal. Olcott, President of the society. Vivekananda has been cut off in the prime of his life. Possibly his mantle will fall upon his adopted daughter Nivedita." — Amrita Bazar Patrika : 7th July 1902 (Emphasis, author's)

আজ হইতে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে স্বামিজীর মৃত্যুর মাত্র দুই দিন পরে অমৃতবাজার পত্রিকার এই বিবরণটি ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম, পরমহংসদেবের ছায়া পতিত হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের উপর। এখন স্বামী বিবেকানন্দের ছায়া পতিত হইল ভগিনী নিবেদিতার উপর। ভগিনী নিবেদিতার জীবন চরিত আলোচনায় অমৃতবাজার পত্রিকার এই মন্তব্যটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, পরমহংসদেবেরও অপর কোন শিষ্য অথবা বিবেকানন্দের অপর কোন গুরু ভ্রাতার উপর তাহার ছায়া পতিত হইবে, এমন কথা বলা হইল না। ভগিনী নিবেদিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়, পরমহংসদেব ভক্ত ছিলেন, আর বিবেকানন্দ যোগ প্রচার করিয়াছেন, এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ—এই কথা বলিয়া পরমহংসদেবের ছায়া স্বামী বিবেকানন্দে পতিত হইয়াছিল বলা স্ববিরোধী হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পরমহংসদেব প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, পরে তোতা পুরীর নিকট দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগ অভ্যাস

করিয়াছিলেন। এবং স্বামী বিবেকানন্দও ভক্তি প্রচার করিতে গিয়া গীতা প্রচারক কৃষ্ণ অপেক্ষা গোপী প্রেমের কৃষ্ণকে উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। 'লর্ড গৌরাঙ্গ', প্রচারক ভক্তিবাদী অমৃতবাজার সম্ভবত বিবেকানন্দের এই গোপী প্রেমের কথাটি তখন জানিতে পারেন নাই।

তৃতীয়, পরমহংসদেবকে শুধু ভক্ত বলিলে তাঁহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজের একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ঃ

"বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপরদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন।"

সুতরাং পরমহংসদেবকে শুধু ভক্ত বলা চলে না। ইহা ছাড়া, 'যত মত তত পথ', এই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত ধর্মমতের প্রত্যেকটিকেই একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়া জগতের বিভিন্ন ধর্মের যে সমন্বয় নির্দেশ করিয়াছেন পন্ডিত মোক্ষমুলার এজন্য তাঁহাকে ইতিহাসের 'একজন বড় সমন্বয়াচার্য্য বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তা ছাড়া শ্রী অরবিন্দ কর্মযোগীন পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ইহারা উভয়ে শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমন্বয় দিয়া গিয়েছেন।*

চতুর্থ, একথা সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে শুধু অবতার নয়, পূর্বের অবতারদের অপেক্ষা বড় অবতার বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মাদ্রাজের একটি বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ

যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণ তলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশ স্বরূপ যুগাচার্য্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই অদ্য ক্ষান্ত হইতে হইবে।"

পঞ্চম, ভগিনী নিবেদিতা এই বৎসরই অক্টোবর মাসে বরোদা গিয়া শ্রী অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ তাঁহাকে উপহার দেন। এবং এই রাজযোগ পড়িয়াই অরবিন্দ সর্বপ্রথম যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিবেকানন্দের যোগ নিবেদিতাব হাত দিয়া অরবিন্দে সংক্রামিত হয়।

ষষ্ঠ, স্বামী বিবেকানন্দের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ও তাহার সভাপতি

---

* Ramkrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Sankaracharya- — (Karmayogin, 19th june, 1909).

অলকট্-এর সহিত বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। আটলান্টিকের উভয় তীরেই স্বদেশী বিদেশী অনেক ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিতই স্বামিজীকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শুধু ব্রাহ্ম সংস্কারকগণ নহেন, গৌরাঙ্গভক্ত অমৃতবাজারও বাদ যান নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার কিছু পূর্বে বা পরে আমরা ভগিনী নিবেদিতাকে বর্ষা ঋতুতে একটি বক্তৃতা দিতে দেখিতে পাই। তাঁহার সঙ্গে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।* র‍্যাটক্লিফ সাহেব লিখিয়াছেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বর্ষা ঋতুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ায় এক রবিবারে ভগিনী নিবেদিতা বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন এবং তিনিও সঙ্গে গিয়াছিলেন। বক্তৃতা সভায় কথক ঠাকুর তুলসী গাছ সম্মুখে লইয়া রামায়ণ পাঠ ও গান করিতেছিলেন। নিবেদিতা বক্তৃতা শেষে বলিলেন, "হে নব্যভারত, শুধু অতীতের রামায়ণের গল্পে ডুবিয়া থাকিও না। মাতৃভূমির সেবা দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া নূতন রামায়ণ সৃষ্টি কর।"

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর মাত্র দুই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১৯শে জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকা আর একটি সংবাদ প্রকাশ করিলেন, যথা ঃ

Sister Nivedita — we have been requested to inform the public that at the conclusion of the days of mourning for the Swami Vivekananda, it has been decided between the members of the Order at Belur Math and Sister Nivedita that her work shall henceforth be regarded as free and entirely independent of their sanction or outharity. — [Amrita Bazar Patrika, 19th July, 1902 —(Emphasis author's)] অর্থাৎ, — স্বামিজীর অশৌচান্তের পর মুহূর্ত্তেই ভগিনী নিবেদিতা ও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির হইল যে, এখন হইতে ভগিনী নিবেদিতার কার্য্যাবলীর সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার নিজের। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহার কার্য্যাবলীর সহিত বেলুড় মঠের কোনই সংশ্রব নাই।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটি অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই মনে হইবে। কেন না, মাত্র ১২ দিন পূর্বে (৭ই জুলাই) অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন

* এস. কে. র‍্যাটক্লিফ। মে, ১৯০২ সালে Paul Knight-এর Editorship এর সময় Leader-writer হিসাবে ষ্টেটসম্যান-এ যোগ দেন। পরে ১৯০৩ হইতে ১৯০৬ পর্য্যন্ত সম্পাদক (Editor) ছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিলাত চলিয়া যান; Indian Nationalism-এর পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনি কাগজের সত্ত্বাধিকারীদের বিরাগভাজন হন। বিলাতে তিনি বহু সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে এবং বিশিষ্ট পত্র পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। র‍্যাটক্লিফ সাহেব এখনও বাঁচিয়া আছেন। আমার সোদর প্রতিম শ্রীঅমল হোমের নিকট হইতে এই তথ্যটি পাইয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার ছায়া (mantle) তাঁহার মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার উপর পতিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে কি ইহা সম্ভব হইত? বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ কি এতটা সাহসী হইতেন? একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।

মিঃ ওকাকুরা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বামী বিবেকানন্দ জীবিতকালে ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্বামিজীর সহিতই নিবেদিতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করেন ও পরিচিত হন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,

"বিবেকানন্দকেও দেখেছি। কর্তা দাদামশায়ের কাছে আসতেন। দীপুদার সহপাঠী ছিলেন; কি হে নরেন' বলে তিনি কথা বলতেন। বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার ভাগ্য হয়নি আমার, তাঁর চেহারা দেখেছি; কিন্তু আমার মনে হয় নিবেদিতার কাছে লাগে না। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।" (জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১১৩)।

নিবেদিতার প্রতি অবনীন্দ্রনাথের কিছুটা পক্ষপাতিত্ব আছে। অবনীন্দ্রনাথের এই তুলনাটি বিবেকানন্দ-ভক্তদের নিকট মনঃপুত না হইবারই কথা। স্বামিজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা ঠাকুরবাড়ীর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ক্রমে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পান। অবনীন্দ্রনাথের সহিতই নিবেদিতার পরিচয় অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৯০০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট হইতে অক্টোবর) প্যারিস প্রদর্শনীতে গিয়াছিলেন। প্যারিসে তিন মাস ছিলেন। নিবেদিতাও সঙ্গে ছিলেন। এই প্যারিস প্রদর্শনী দেখিয়া স্বামিজীর মধ্যে দেশাত্মবোধ ও বাঙালীপ্রীতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী দেখিয়া স্বামিজী লিখিয়াছেন ঃ

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হইতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি, এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমন্ডলী মন্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার

নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামন্ডলীর মধ্য হইতে এক যুবা, যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মন্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলেন! সমগ্র বৈদ্যুতিকমন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য, ধন্য বীর! বসু ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গৃহিণী যে দেশে যান সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন।"(পরিব্রাজক, পৃঃ ১২২-১২৩)

সম্ভবতঃ এই প্যারিসে প্রদর্শনীর সময় স্বামিজী নিবেদিতাকে স্যার জগদীশ বসু ও তদীয় পত্নী লেডী অবলা বসুর সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন। স্বামিজীর জীবিত অবস্থাতেই সে পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ হয়। কেন না, স্বামিজীর জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে বসিয়া যে সকল বন্ধুদের নাম নিবেদিতার মনে হইয়াছিল,'বোস' অর্থাৎ জগদীশ বসু তাহাদের মধ্যে একজন। বসু দম্পতির সহিত নিবেদিতার বন্ধুত্ব তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত (১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ১৩ই অক্টোবর) অটুট ছিল।

বাঙ্গালী প্রীতি—ভারত প্রীতি বিবেকানন্দের মনে যেন ছাই-চাপা আগুন। প্যারিস প্রদর্শনীতে উহা দেখা গেল। বিবেকানন্দের সহিত লন্ডনে প্রথম সাক্ষাতের সময় (১৮৯৫, নভেম্বর) নিবেদিতার মধ্যেও এইরূপ গন্‌গনে আগুনের মত আইরিশ প্রীতি আমরা দেখিয়াছি। আয়র্ল্যান্ডকে ইংলন্ডের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিবেদিতা তখন বিপ্লবপন্থী হইয়া ইংলন্ডে বিপ্লবের কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিবেকানন্দের বাঙ্গালী প্রীতি ও ভারত প্রীতি অতি সহজেই নিবেদিতার মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ "ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়।"(জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১১১)।

ওকাকুরাকে আমরা (১৯০২, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারীতে) বিবেকানন্দের সহিত প্রথম বোধগয়া পরে কাশীতে দেখিতে পাই। পরে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের সম্মুখেই নিবেদিতার সহিত পরিচিত হইতে দেখিতে পাই। এই পরিচয়ের গুরুত্ব খুব বেশি। ওকাকুরা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

"ওকাকুরা যখন প্রথমবার আসেন এদেশে, যতদূর মনে পড়ে কলকাতায় সুরেনের বাড়ীতেই ছিলেন। সেবার খুব বেশি আলাপ হয়নি তাঁর সঙ্গে। মাঝে

মাঝে যেতুম, দেখতুম বসে আছেন তিনি একটা কৌচে। সামনে ব্রোঞ্জের একটি পদ্মফুল, তার ভিতরে সিগারেট গোঁজা; একটি করে তুলছেন আর ধরাচ্ছেন। বেশি কথা তিনি কখনোই বলতেন না। বেঁটে-খাটো মানুষটি, সুন্দর চেহারা, টানা চোখ, ধ্যাননিবিষ্ট গম্ভীর মূর্তি। বসে থাকতেন ঠিক যেন এক মহাপুরুষ। রাজভাব প্রকাশ পেত তাঁর চেহারায়। সুরেনকে খুব পছন্দ করতেন ওকাকুরা।" (জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১০৯)।

বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে ওকাকুরা আরও পাঁচমাস এই দেশে ছিলেন। তিনি ১৯০২ নভেম্বরে এদেশ ছাড়িয়া যান কিন্তু দশ বৎসর পর দ্বিতীয়বার আসেন।

ওকাকুরার নিকট ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমরা তিনটি জিনিষ পাই।

প্রথম, প্রাচ্য প্রীতি; অর্থাৎ সমস্ত এশিয়াবাসীদের মধ্যে একটা সাধারণ সভ্যতা বিদ্যমান। এশিয়া ইউরোপ হইতে পৃথক এবং 'সমস্ত এশিয়া এক'। ওকাকুরা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লন্ডন হইতে তাঁহার প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তক "দি আইডিয়ালস্ অফ্ দি ইষ্ট" প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে নিবেদিতার হাত স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকের মতে নিবেদিতাই এই পুস্তকখানি ইংরাজীতে লিখিয়া দিয়াছিলেন। কেন না, বিস্ময়ের বিষয় এই যে ওকাকুরা ইংরাজী জানিতেন না; তিনি এমন বই এত ভালো ইংরাজীতে কেমন করিয়া লিখিলেন! ইহা ছাড়া এই পুস্তকে আভ্যন্তরিক প্রমাণেও নিবেদিতার মন ও হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ওকাকুরার "দি আইডিয়ালস্ অফ্ দি ইষ্ট" গ্রন্থ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে কলিকাতা অবস্থানকালেই ওকাকুরার সহিত একত্রে বসিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ।

দ্বিতীয়, ওকাকুরা ভারতীয় শিল্পে ও চিত্রবিদ্যায় জাপানী চিত্রের আদর্শ অনুপ্রবেশ করাইয়াছিলেন। নিবেদিতা তাহাতেও ওকাকুরার সহিত একমত হইয়া সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ওকাকুরা পর পর অনেকগুলি জাপানী চিত্রকরকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা সুরেন ঠাকুরের বাড়ীতে থাকিত এবং অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে জাপানী শিল্পের কায়দায় ভারতীয় ছবি আঁকিত। এই ছবি আঁকার ব্যাপারে নিবেদিতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ওকাকুরা যে সকল জাপানী শিল্পীদের পর পর ঠাকুরবাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের নাম হিশিদা, টাইকান, খারসুতা, ও কিরিটান। ওকাকুরা প্রথমবারে যখন আসেন, তখন নন্দলাল বসু স্কুলে বা কলেজে।

তৃতীয়, ওকাকুরা রাজনীতিতে বিপ্লবপন্থী ছিলেন। এক্ষেত্রেও ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল। ঠাকুরবাড়ীর সুরেন ঠাকুরও

বিপ্লবের কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, এবং অরবিন্দ প্রবর্ত্তিত বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে (১৯০২ খৃঃ) বারীন ঘোষকে এক হাজার টাকাও দিয়াছিলেন। বাংলা দেশের গুপ্ত সমিতি যখন প্রথম জন্মলাভ করে, ভারতীয় চিত্র শিল্পে জাপানী প্রভাবান্বিত নূতন ধারা তখনই প্রবর্তিত হয়।

অরবিন্দ যে সময় বাংলা দেশে দুইবার আসিয়া গুপ্ত সমিতির প্রবর্তন করেন, অবনীন্দ্রনাথও সেই সময় আমাদের চিত্রশিল্পে নূতন ধরনের জাপানী প্রভাব প্রবর্তন করেন। ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিতে এবং অবনীন্দ্রনাথের চিত্র শিল্পে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে দেখিতে পাই। নিবেদিতার চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে ইহা একটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ওকাকুরা যদি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের দশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার আসিয়া থাকেন, তবে ভগিনী নিবেদিতা তখন ইহলোকে কিংবা পরলোকে তা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কেন না, অবনীন্দ্রনাথ শুধু লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয় বার যখন এলেন দশ বছর পরে, তখন আমি আর্টের লাইনে ঢুকেছি।" নিবেদিতার মৃত্যু হয় ১৯১১, ১৩ই অক্টোবর। সুতরাং ওকাকুরার দ্বিতীয়বার আগমনের সময় নিবেদিতার জীবিত না থাকাই সম্ভব।

নিবেদিতার প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নিম্নে উদ্ধৃত লেখাটি সুতরাং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়াই মনে হয়।

"কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপ্‌শন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।" (জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১১২)।

এক অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই এরূপ বর্ণনা সম্ভব। তার পর নীচের বর্ণনাটি ওকাকুরার ভারত হইতে চলিয়া যাওয়ার পর।

"আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়ীতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজারাজড়া, সাহেব মেম গিসগিস করছে। অভিজাত-বংশের বড় ঘরের মেম সব। কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে, ফ্যাশানে চারদিক

ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমন্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল! সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উড্‌রফ, ব্লাণ্ট এসে বললেন, 'কে এ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম। 'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।

নিবেদিতা মারা যাবার পর একটি ফটো গণেন মহারাজকে দিয়ে যোগাড় করেছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। লর্ড কারমাইকেল, তাঁর মত আর্টিস্টিক নজর বড় কারো ছিল না। আমাদের নজরে নজরে মিল ছিল।** সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, 'এ কার ছবি?' বললুম, 'সিস্টার নিবেদিতার।' তিনি বললেন, 'এই সিস্টার নিবেদিতা? আমার একখানি এই রকম ছবি চাই।' বলেই আর বলা-কওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাবা করে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।"

(জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১১২-৩)।

অবনীন্দ্রনাথ একজন জগৎবিখ্যাত শিল্পী। সেই শিল্পীর চক্ষু দিয়া তিনি নিবেদিতার রূপ দেখিয়াছিলেন; এবং নিবেদিতার রূপ ও সৌন্দর্য্যের এত উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, যাহা যে কোন নারীর পক্ষে গর্বের বস্তু। কিন্তু ইহাই সব কথা নয়। অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।' ইহাই নিবেদিতা চরিত্রের বড় কথা। রূপ দিতে পারে অনেক, কিন্তু মনে বল দিতে পারে কম নারী। কবি (জ্ঞানদাস) বলিয়াছেন, "রূপ লাগি আঁখি ঝরে, গুণে মন ভোর।"

অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতার রূপ ও গুণের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, অন্য কোন নারী সম্বন্ধে তাহা তিনি করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।' এই জগৎবিখ্যাত শিল্পীর চক্ষু দিয়া যদি আমরা ভগিনী নিবেদিতাকে দেখি, তবেই আমাদের দেখা কিছুটা সার্থক হইবে।

অবনীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'ধ্যানধারণা, পূজা আর্চা, সে

আমি কোনদিন করিনে।" (পৃঃ ১০৯)। 'ধম্মকম্ম আমার সয় না। কোনকালে করিওনি। ও সব দিকই মাড়াইনে।' (পৃঃ ১১৮)। 'নাচ, গান বাজনা এতেই কেটেছে।'

ভগিনী নিবেদিতা একবার ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্রজীবনের কথা কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজে বিবেকানন্দের এক শ্রেণী নীচে পড়িতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে কলেজে পাঠ্যাবস্থায় দেখিয়াছেন, Artist nature ও Bohemian temperament— নিবেদিতা এই মন্তব্যটি তুলিয়া দিবার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। যুবক নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন যুবক অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও কি আমরা তাহাই বলিতে পারি না — Artist nature ও Bohemian temperament? নিবেদিতার জন্যই অবনীন্দ্রনাথ ও ওকাকুরার প্রসঙ্গ কিছুটা দীর্ঘ করিতে হইল।

"ওকাকুরা দ্বিতীয়বার স্বয়ং ভারত ভ্রমণে এসে, আর্ট স্কুলের তরুণ চিত্রকর গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। কিছু উপদেশ চাওয়ায় জিজ্ঞাসা করেন, কার কত বয়স। জন্ম কাল খাতাতে দেখে বলেন, তা নয়, কে কতদিন ছবি আঁকছে। কেউ দু'বছর, কেউ তিন বছর। ওকাকুরা বললেন, 'এখনো সময় হয়নি! আবার আসা হয় তো তখন বলব।' তখনকার মত সুরেন গাঙ্গুলী, নন্দলাল প্রভৃতি ছাত্রের ছবি দেখে দেখে মন্তব্য করলেন, বাতিল ছবি এক একখানা ধরে সংক্ষেপে বোঝালেন কেন নষ্ট হল। 'কালী দীঘির পারে ইন্দিরা' দেখে বললেন, ছবি ভালো বর্ণ আবিল হয়েছে। ওকাকুরার সঙ্গে নন্দলালের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। এর পরে পুনরায় যখন এ দেশে আসেন, বক্তৃতা দেননি, বিস্তৃত আলোচনা করেননি, তবু যেটুকু বলেছেন, বুঝিয়েছেন, ইঙ্গিত করেছেন, বাংলার নূতন শিল্প গোষ্ঠীতে অন্ততঃ নন্দলালের শিল্পী জীবনে, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুভ ও সুদূরপ্রসারী। ওকাকুরার সঙ্গে এই শেষ দেখা শুনা। এ সময় তিব্বতে চলছিল লড়াই। ওকাকুরাকে কথা প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করেন, জাপানীরা ভারত অধিকার করলে কি হবে? ওকাকুরা বলেন, 'কোনো কল্যাণ হবে না। চীনা হলে অন্য কথা ছিল, অতি প্রাচীন ও অভিজাত তাদের সংস্কৃতি। কিন্তু জাপানীরা বর্ব্বর, ভুঁইফোড় (upstart); হয় তো গায়ের জোরে এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলবার দুশ্চেষ্টায় লেগে যাবে। পাশ্চাত্য অভিমুখিতা, পাশ্চাত্য শক্তি উপাসনার অনুকৃতি, জটিল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থূল লক্ষণগুলির আহরণ, বিজীগিষা, প্রাচ্য ভাবের ক্রমিক পরিহার—যা দেখতে দেখতে জেগে উঠছিল নবীন জাপান, তাতে যে ওকাকুরার হৃদয় বুদ্ধির সায় ছিল না, বিশেষ বেদনাই ছিল, দৃষ্টিও ছিল মোহমুক্ত, তারই প্রমাণরূপে এ কথার উল্লেখ হল।" (দেশ, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃঃ ৩৪০)।

ভারতীয় চিত্র শিল্পের নূতন যুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার উপর প্রভাব যেখান হইতেই আসুক ভগিনী নিবেদিতা আগামী নয় দশ বৎসর চিত্র শিল্পের এই নূতন যুগকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য অবনীন্দ্রনাথের সহযোগী। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই নূতন যুগের পূর্বে আমরা আরও দুইজন চিত্র শিল্পীর নাম উল্লেখ করিব। একজন রবি বর্মা, আর একজন শশিকুমাব হেস।

রবি বর্মা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতেও আসিয়াছিলেন, এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের ছবি দেখিয়া প্রশংসাও করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

"সেই সময় রবিবর্ম্মা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন আমি নতুন আর্টিস্ট— তিনি আমার স্টুডিয়োতে আমার কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছবির দিকে এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলুম, বাড়িতে ছিলুম না, ফিরে এসে শুনলুম বাড়ির লোকের মুখে।" (জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১২৫)।

স্বামী বিবেকানন্দ রবি বর্মার ছবি দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "ওদের নকল করে একটা আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চাল-চিত্রি করা পোটো ভাল। তাদের কাছে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ও সব রবি বর্ম্মা, ফর্ম্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরের সোনালী চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চাল-চিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।"

শশিকুমার হেসও ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। শুধু আসিয়াছিলেন না, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একখানি ছবিও আঁকিয়াছিলেন। পরে তিনি বরোদায় গিয়া অরবিন্দের একখানি ছবিও আঁকিয়াছিলেন। শশিকুমার বাবু চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য অনেকদিন ইটালির ফ্লোরেন্স ও মিউনিক নগরে ছিলেন। প্যারিসেও দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি একটি ফরাসী মহিলার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার প্রণয়িণী মিস ফ্লামায়ের সহিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহায়তায় তাঁহার বিবাহ হয়। শশিকুমার বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লোক ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা এই অজ্ঞাতকুলশীলা ফরাসী মহিলার সহিত ব্রাহ্মমতে বিবাহ আদৌ পছন্দ করেন নাই। অরবিন্দও এ ক্ষেত্রে, এই অজ্ঞাতকুলশীলা ফরাসী রমণীর সহিত বিবাহ সমর্থন করেন নাই। নিয়তি তখন হাসিয়াছিল।

ইটালি, প্যারিস-এর প্রভাব শশিকুমারের চিত্রে ছিল। কিন্তু কি রবি বর্মা কি শশিকুমার, ইহারা কেহই চিত্র শিল্পে অবনীন্দ্রনাথের ন্যায় নবযুগ প্রবর্তন করিতে পারেন নাই।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে জাপানের প্রভাব ছিল, একটু বেশীই ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু দেশী পটুয়াদের ছবিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। যখন আমাদের চিত্রশিল্পীরা অজন্তায় ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তখন কালীঘাটের পট ও পটুয়াদের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যদি হইত, তবে কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত ছবির ইতিহাস এতটা লুপ্ত একেবারে হইয়া যাইত না। কেন না, কালীঘাটের পটুয়াদের ছবিরও একটা ইতিহাস ছিল। এই সম্পর্কে আর একটি উক্তি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মাসিমা বললেন ঃ "এই পটের একটুখানি আদরও যদি কয়েকটা দিন আগে হত! কালীঘাটের পট কিন্তু মেয়েরাও আঁকত। আমরা তো মেয়েদেরই আঁকতে দেখেছি বেশী। অদ্ভুত তাদের আঁকার ক্ষমতা। জলচৌকির সামনে বসে পটুয়াদের ঘরের মেয়েরা পট আঁকত — কয়েকটা বলিষ্ঠ তুলির টানে এক একখানা পট শেষ করে ফেলত। ভুষো কালিই বেশী, রঙও তারা নিজেরা তৈরী করে নিত। সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা তন্ময় হয়ে দেখতাম। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। সামনে দাঁড়িয়ে পুরুষ পটুয়াদের আঁকা দেখিনি। তারা অবশ্য ওস্তাদ আঁকিয়ে। কিন্তু মেয়ে পটুয়ারা তাদের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। আজও মেয়েরা পুরুষ পটুয়াদের সঙ্গে প্রতিমা গড়ে; দৃশ্যপট আঁকে — কিন্তু আগেকার সেই সব পট আর কেউ আঁকে না। ***

"কালীঘাটের পটুয়াদের মধ্যে মেয়ে পটুয়াদের এই প্রাধান্য থেকে তাদের বহুযুগ বিস্তৃত অতীত ইতিহাসের অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বাংলার শিল্পকলায় সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর ঘরের মেয়েদের যে মূল্যবান দান, আলপনা চিত্র, কাঁথা শিল্প, হাঁড়ি কলসী-সরা চিত্র, প্রভৃতিতে দেখা যায়, তারও একটা ঐতিহাসিক উৎসমূলের হদিশ মেলে। প্রথম মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম শিল্পীদের কথা, মেয়ে পুরুষ উভয়েই শিল্পী বরং ঘরের মেয়েদেরই প্রাধান্য বেশী। সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল-হো-মুন্ডাদের মধ্যে আজও দেখা যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হল এই আদিবাসী প্রধান অঞ্চলের সীমান্ত জেলা এবং ঝাড়খন্ড জঙ্গলখন্ড, মল্লভূমি (বিষ্ণুপুর), বীরভূম — সবই একদিন জঙ্গলাকীর্ণ আদিবাসী প্রধান অঞ্চল ছিল। জেলে বাগদী গোয়ালা কৈবর্তদের মধ্যে অনেক স্বাধীন রাজা ও রাজ্যের যে সব কাহিনী শোনা যায়, তার মধ্যে বাস্তব ইতিহাসের বিরাট একটা কঙ্কাল সমাধিস্থ হয়ে আছে। তখনই ছিল বাংলার পটুয়াদের আসল স্বর্ণযুগ। কে সেই কঙ্কাল খুঁড়ে বার করে তাদের বিস্তৃত ইতিহাস

রচনা করবে? তারপর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা নতুন করে রাজ্য দখল করেছেন এবং তাদের অভিশাপে শুধু বাংলাব পটুয়ারা নয়, সকল শ্রেণীর লোকশিল্পীরা সমাজে পতিত হয়েছেন। বীরভূমের ছবিলাল চিত্রকরের কথাই ঠিক। তারা হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তিও আঁকে লোকাচার মানে, আবার মুসলমানদের মতন নমাজও পড়ে। কালীঘাটের পটুয়ারাও তাই করত। কালীঘাটের পটুয়ারা বাংলার এই পটুয়াদেরই আত্মীয় ও বংশধর। তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। যতদিন না লেখা হবে ততদিন বাংলার শিল্প কলার ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। কলকাতায় বসে আজ আর সেই ইতিহাস লেখা যাবে না। কলকাতার বাবুদের রুচি, ইংরেজ শিল্প ও লিথোগ্রাফিক প্রেস পটুয়াদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।" (যুগান্তর, শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫২)।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর মুহূর্তেই ভারতীয় চিত্র শিল্পের নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। এবং ভগিনী নিবেদিতাকেও ইহার পুরভাগে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া দন্ডায়মান দেখিতে পাইতেছি।

বরোদায় অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকার

১৯০২, ২৯শে জুলাই হইতে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা ভগিনী নিবেদিতার কার্য্যাবলীর সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে যে কার্য্যভার দিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি এখন স্বাধীনভাবে পালন করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। ১৯০২, সেপ্টেম্বরের পূর্বেই তিনি দুইটি কার্য্য করিলেন।

প্রথম, স্বামিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন। স্বামিজীকে তিনি বলিলেন, "Swamiji is verily our great national hero."—"আমাদের মহান জাতীয় নেতা।" ভারতবাসীর সহিত তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া গিয়াছেন; এই জন্য বলিলেন "our" এবং ভারতবাসী একটা 'জাতি', — এবং সেই জাতির মহান নেতা বলিয়া স্বামিজীকে তিনি ঘোষণা করিলেন। "What was the idea that caught Vivekananda? He saw befor him a great India nationality, young, vigorous, fully the equal of any nationality on the face of the earth."— (Hints on National Education in India, p. 89). নিবেদিতা বলিলেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একথা বলিলেন না যে, তিনি বেদান্তকেশরী ও জগৎ বিখ্যাত হিন্দুধর্মের প্রচারক। একথাও বলিলেন না যে, তিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী।

এই সব কথাই তিনি বলিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি বলিলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সকলের মধ্যে ভারতবাসীও তাহাদের সমকক্ষ, পূর্ণ জীবনীশক্তি সম্পন্ন একটি জাতি, এবং বিবেকানন্দ তাহার মহান নেতা।

আজ বিবেকানন্দকে আমাদের মহান জাতীয় নেতা বলা সহজ। তাঁহার জন্মদিনে সবগুলি সংবাদপত্রেই এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইতেছে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে বিবেকানন্দকে জাতীয় নেতা বলা সহজ ছিল না। ইহা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সাপেক্ষ ছিল। নিবেদিতা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে বিবেকানন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন।

মহাপুরুষদের সম্পর্কে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী সমান হয় না। পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্‌নহার্ড ও সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা মাদাম কালভে— ইহারা স্বামিজীকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্বও কম নয়। তাঁহারা স্বামিজীকে দেখিয়াছিলেন আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী দেবমানব। সারা বার্‌নহার্ড ইচ্ছা থাকিলেও ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। কালভে আসিয়া বেলুড় মঠে স্বামিজীর সমাধি-মন্দির দেখিয়াছিলেন।*

---

* স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—"আর ফরাসিনী বন্ধু, জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদমোয়াজেল কালভে। মাদমোয়াজেল কালভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা — অপেরা গায়িকা। এর গীতের এত সমাদর যে, এর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হতে। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বারনহার্ড আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কালভে — দুজনেই ফরাসিনী। *** বারন্‌হার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর, আমায় বারম্বার বলেন, তোমাদের দেশ "এজাসিএন, এসিভিলিজে" অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। *** বারনহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল — "সে মঁ রাভে'— সে আমার জীবন স্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাঁকে বাঘ, হাতী শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বারনহার্ড বললেন— সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ দু'লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই। — "লা দিভিন সারা!" "(La Divine Sara) — "দৈবী সারা' — তাঁর আবার টাকার অভাব কি? যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই। সে ধুম বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজারাজড়া পারে না; যার থিয়েটারে মাসাবধি আগে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়; তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে সারা বারনহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারত ভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

মাদমোয়াজেল কালভে এ শীতে গাইবেন না; বিশ্রাম করবেন, — ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি — এঁর অতিথি হয়ে। কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভা বলে, বহু পরিশ্রমে বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভুত ধন, রাজা বাদশাহের সম্মানের ঈশ্বরী। কালভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা। অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবী কণ্ঠ — এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় করেচে।" (পরিব্রাজক, পৃঃ ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬)।

ভগিনী নিবেদিতা সারা বার্‌নহার্ডও নহেন; অথবা মাদাম কালভেও নহেন। নিবেদিতা, — নিবেদিতা! তাঁহার জীবনস্রোত এখন হইতে অন্য খাতে প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে।

দ্বিতীয়. নিবে   ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে বহু শহরে ও গ্রামে বিবেকানন্দ সোসাইটি বিস্তার লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতেই ইহার প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। নিবেদিতা প্রশ্ন করিয়াছেন, বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রধান কর্তব্য কি? (What shall be the main duty of Vivekananda Society?) এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন। অত কথা লেখা যাইবে না, সংক্ষেপে কিছুটা লিখিতেছি। প্রথম, এই সোসাইটিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে মানুষ বিবেকানন্দকে জানা। (It is this man himself that they really need to understand and appreciate.)

ভারতবাসী যে একটা জাতি, এই জাতীয়তাবোধ বিবেকানন্দে কোথা হইতে আসিল? নিবেদিতা বলিতেছেন, স্বামিজী ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে ঘুরিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আবার অন্যদিকে পৃথিবীর বহুদেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। (And nothing teaches like contrast) এবং এইরূপে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই স্বামিজীর মধ্যে এক অতি বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হইয়াছে। নিবেদিতা আরও বলেন যে, এই সোসাইটির সদস্যদের বড় কর্তব্য, ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা। (One of the great duties of Vivekananda Societies should be the revival of enthusiasm for pilgrimages.) দ্বিতীয়, বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ করা (Reading of the books of the Swami Vivekananda)। কিন্তু শুধু স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ পড়িলেই যথেষ্ট হইবে না। পৃথিবীর প্রাচীন যুগের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়িয়া মনের মধ্যে একটা ইতিহাসবোধ (The historical sense) জাগ্রত করিতে হইবে, এবং সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে সমাজ-বিজ্ঞানের বইগুলি ভাল করিয়া পড়িতে হইবে— (Spencer, Lubbock, Tylar, Fiske and Clodd)। এইরূপ পাঠ শেষ করিয়া যদি আমরা স্বামিজীর গ্রন্থ পুনরায় পাঠ করি, তবেই আমরা মানুষ বিবেকানন্দকে পরিপূর্ণরূপে দেখিতে পাইব। (We shall find his whole personality stand revealed to us.)। স্বামিজীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা যখন আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা

ও উদ্দীপনায় পরিণত হইবে, কেবল তখনই আমরা মানুষ বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারিব।

অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ভগিনী নিবেদিতার নির্দেশমত মানুষ বিবেকানন্দকে বুঝিবার প্রয়োজন আজই কি শেষ হইয়াছে? প্রিন্স ক্রুপাটকিনের (Kropatkin) শিক্ষাপ্রাপ্তা বিপ্লবপন্থী নিবেদিতা, সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist) নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, এই মার্কস, লেনিন ও ষ্ট্যালিনের যুগেও কি তাহা আমাদের মনের খোরাক জোগাইতে পারিতেছে না? বিবেকানন্দ সোসাইটির সদস্যগণ এই কথা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

১৯০২ খৃঃ সেপ্টেম্বরে নিবেদিতা প্রথমে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া ১৯০৩ খৃঃ জানুয়ারীতে কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামিজীর মৃত্যুর পর তিনি যথেষ্ট অশ্রু ত্যাগ করেন নাই, এই বলিয়া বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর কটাক্ষ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। (ফরাসী জীবন চরিতে উল্লেখ আছে।) নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া শোকের বিলাস করা তাঁহার স্বভাবে ছিল না। তিনি শুধু বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ভারত ভ্রমণে বাহির হন নাই। এক দিব্য প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঝড়ের মত বেগে তিনি এই বিস্তীর্ণ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া গেলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অনেক দেশ-বিখ্যাত নেতাদের সহিত পরিচিত হইলেন। অনেক সভা সমিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। পরাধীনতার জ্বালা বুঝাইয়া দিলেন; স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বেদান্তের মোক্ষ প্রচার করিলেন না, সংসার মায়া ও মিথ্যা একথাও বলিলেন না। তুরীয়ানন্দ লাভ তাঁহার বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, আচার রীতি নীতি ভিন্ন, খাদ্য ভিন্ন। প্রত্যেক প্রদেশের অতীত ইতিহাস ভিন্ন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই বৈচিত্রের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে। সমাজবিজ্ঞানে পারদর্শিনী নিবেদিতা এই ঐক্যকে ভাষা রূপ দিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এই ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতের জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি ইহাই লিখিয়া গিয়াছেন। ('ডন' ১৯১১ প্রত্রিকায় "Unity of life and Type in India" প্রবন্ধে)।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ভারতের একটি প্রদেশ আর একটি প্রদেশেব মত নয়। ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষে ঐক্যের একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়। কেন না এই ঐক্য যান্ত্রিক — mechanical — নয়, পবন্তু জৈবিক — organic।*

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ অবিকল অনুরূপ কথাই লিখিয়া গিয়াছেন— 'India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental Unity ...That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, dress, manners and sect." ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণায় নিবেদিতার স্থান ভিনসেন্ট স্মিথের নীচে নয়।

ওকাকুরা এ সময়ে নিবেদিতার সঙ্গেই আছেন। খালি পায়ে, পিঠে ব্যাগ ঝুলাইয়া, কপিলাবস্তু, বোধগয়া তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি সকলকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া বেড়াইতেছেন—"যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি তিনি তাঁহার আত্মিক কন্যা তোমাদিগকে পরিচালনার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা শোন। তাঁহার চারিদিকে আসিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হও।" (Vivekananda is dead — but he has left his spiritual daughter to lead you. Listen to her, rally round her.") তিনি আরও বলিলেন —"হে ভারতবাসী, ওঠো জাগো, দেখ ত্রিশ বৎসরেরও অল্প সময়ের মধ্যে আমরা (জাপানীরা) কি করিয়াছি! তোমরাও কেন পারিবে না! ("People of India, wake up! See what we have done in less than 30 years.")

নিবেদিতাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করিলেন, "আমার কাজ এই জাতিকে জাগ্রত করা।" — ("My role is to awaken the nation.") (ফরাসী জীবন চরিত পৃঃ ২২৫)।

সেপ্টেম্বর মাসেই নিবেদিতা বোম্বাই মেলে চড়িয়া রওনা হইলেন। বোম্বাই, পুণা, নাগপুর, কপিলাবস্তু, বোধগয়া দর্শনও করিলেন, বক্তৃতাও দিলেন। নাগপুরেই প্রথম তিনি দেখিলেন নির্বাসন দন্ড দ্বারা ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কত পরিবারকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। একে তিনি বিপ্লবী; সুতরাং তাঁহার মনে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল। উত্তর দিকে তিনি লাহোর পর্য্যন্ত গেলেন; পশ্চিমে হায়দারাবাদ গেলেন।

এইবার তিনি বরোদায় যাইবেন। বরোদায় রমেশচন্দ্র দত্ত ভগিনী নিবেদিতাকে

* ("Organic as distinguished from a merely mechanical Unity, and for myself I find an overwhelming aspect of Indian Unity in the fact that no single member or Province repeats the function of any ather." (Civic and National Ideals, pp. 47).

বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বড় বড় রাজকর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের ষ্টেশনেই প্রথম সাক্ষাৎ। ষ্টেশন হইতে গাড়ী নিবেদিতাকে লইয়া শহরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে রাজঅমাত্যেরা আছেন, অরবিন্দও আছেন। পথে নিবেদিতা কলেজের মিনার গম্বুজওয়ালা বাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "What an ugle pile!" ভারতীয় ষ্টাইলে গৃহস্থের ছোট্ট বাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "Oh! how beautiful!" একজন রাজঅমাত্য অরবিন্দের কানে কানে বলিলেন, "I say, she is mad!" (পাগল না কি?) — বারীন ঘোষ লিখিয়াছেন রাজঅমাত্যেরা আর্ট সম্বন্ধে ক অক্ষর গোমাংস। সুতরাং নিবেদিতার দৃষ্টি তাঁহারা পাইবেন কোথা হইতে! কিন্তু নিবেদিতার এই উক্তির মধ্য দিয়া অরবিন্দ নিশ্চয়ই তাঁহার (নিবেদিতার) মনের পরিচয় প্রথম পাইয়াছিলেন।

অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের পূর্বে তাঁহার (অরবিন্দের) তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের (terrorists) একটি গুপ্তচক্র আছে। ঠাকুর সাহেব তাহার প্রেসিডেন্ট। তিনি তখন দেশে নাই; বৈপ্লবিক কাজের সলা পরামর্শের জন্য জাপানে গিয়াছেন। তাঁহার পদে অরবিন্দ গুপ্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট হইয়া কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গাইকোয়াড়ের বাঙ্গালী দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়া বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতা পাঠাইয়াছেন। অরবিন্দের নির্দেশে যতীন ব্যানার্জী সার্কুলার রোডে প্রথমে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তারপর অরবিন্দ নিজেও এই গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলিকাতা আসিয়াছেন, এবং মেদিনীপুর গিয়া হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক হাতে গীতা ও এক হাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্ত সমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। মেদিনীপুরের কাঁকরপূর্ণ মাঠের গর্তে ঢুকিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া চাঁদমারী শিক্ষা দিয়াছেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ

"আমার মেদিনীপুরের বাড়ীতে তাঁর (অরবিন্দের) অযাচিত শুভাগমনটাই আমার কাছে একটা মস্ত জিনিষ। *** সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার দীক্ষা আরম্ভ হলো। আমি তলোয়ার ও গীতা হাতে নিলাম। *** ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব করব। অরবিন্দ কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন।

" মাঠের মাঝে একস্থানে কাঁকর খুঁড়ে নেয়াতে একটা প্রশস্ত গর্ত্ত হয়েছিল।

তার মধ্যে বন্দুক আওয়াজ করলে বাইরে থেকে বড় একটা শোনা যেত না। *** অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের বন্দুক ধরবার কায়দা ও তাক দেখে তখন মনে হয়েছিল — তাঁদের এ প্রথম হাতে খড়ি।" (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ১৮, ১৯-২২)

এই পটভূমিকার উপর যখন অরবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক তখনই নিবেদিতার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এবং নিরালায় কথাবার্ত্তা হয়।

১৮৯৫, লন্ডনে নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই নিবেদিতা (মার্গারেট নোবল) ক্রোপাটকিনের (Kropatkin) সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিপ্লবপন্থী হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদার তখন নিবেদিতার সহিত খুব পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "She was a nihilist of the worst type."। এই সময় নিবেদিতা আইরিশ হোম রুল আন্দোলনে যোগ দিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের সময় লন্ডনে যে কয়টি বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল, নিবেদিতা ঐ বিপ্লবের কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ ও নিবেদিতা, এই দুই মহাবিপ্লবী যেদিন বরোদায় পরস্পর মিলিত হইলেন, বাংলার ইতিহাসে সেদিন এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দুইটি তারিখ স্মরণীয়। ১৮৯৫, নভেম্বর — যেদিন লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আর ১৯০২, অক্টোবর — যেদিন বরোদাতে অরবিন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে অধিক। আর অরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনে সমধিক। অরবিন্দ আদর্শে বিপ্লবী (থিওরিটিক্যাল), আর নিবেদিতা হাতে কলমে কাজে বিপ্লবী (প্র্যাক্‌টিক্যাল)। অরবিন্দের বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। নিবেদিতা অরবিন্দ অপেক্ষা বয়সে পাঁচ বৎসর বড়।

উভয়ের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। প্রথমে উভয়ের দার্শনিক মতবাদের প্রসঙ্গ উঠিল। বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা শঙ্করানুগামী, অদ্বৈতবাদী ও মায়াবাদী; পরন্তু অরবিন্দ লীলাবাদী। নিবেদিতা এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে দেখিতেন মায়ার মধ্যে, আর অরবিন্দ দেখিতেছেন ব্রহ্মের স্বরূপের প্রকাশ ও লীলার মধ্যে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিবেদিতার নিকট এই জগৎ মিথ্যা। আর অরবিন্দের নিকট এই জগৎ সত্য। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৩৩)

প্রথমে নিবেদিতাই বলিলেন, "কলিকাতা আপনাকে চায়। আপনার উপযুক্ত স্থান বাংলা দেশ।" অরবিন্দ বলিলেন. "না, আমি অন্তরালে, অর্থাৎ পশ্চাতে থাকিব। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা।" নিবেদিতা অরবিন্দের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনি আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া জানিবেন।"— (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৩৩ দ্রষ্টব্য)। প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ে একত্রে কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সে কাজটি হইল ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত করা।

অরবিন্দ যে ইতিপূর্বে বাংলা দেশে আসিয়া গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের উদ্বোধন করিয়াছেন, সে কথা নিশ্চয়ই তিনি নিবেদিতাকে বলিয়াছেন। কেন না, কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিতা অরবিন্দ প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বারীন্দ্র কুমার লিখিয়াছেন, "বরোদায় অরবিন্দর সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই নিবেদিতা আমাদের কলিকাতার গুপ্ত সমিতির দলে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।" (Nivedita was connected with us since her first Baroda visit.)

অরবিন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে গুপ্ত সমিতির যে কথা হইয়াছিল, তাহা ফরাসী জীবন চরিতে উল্লেখ নাই। কেন না, নানাদিকে নানা ভয়ের মধ্যে ঐ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

বরোদা হইতে নিবেদিতা কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা আসিয়াই তিনি মাদ্রাজে যাইবার জন্য সাগ্রহে নিমন্ত্রিত হইলেন। মাদ্রাজে বিবেকানন্দের অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ একত্রে মিলিয়া নিবেদিতাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন, শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের কারণ, অতি অল্পকালের মধ্যেই নিবেদিতার খ্যাতি ও প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসের জন্য অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং সকলে মিলিয়া ব্যগ্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কেন না, তিনি স্বামিজীর শেষ কয় মাস তাঁহার (স্বামিজীর) নিকটেই ছিলেন। — (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৩৩)

নিবেদিতা বহু শহরে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। The Pacheye Hall, ময়লাপুর (এখানে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বাড়ী), সালেম (এখানে রাজা গোপালা-

চারিয়ার বাড়ী), ত্রিচিনপল্লী, চিদাম্বরম। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু সর্বত্রই এক — অর্থাৎ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। এক অখন্ড জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়া ভারতবাসীকে জাগ্রত করাই তাঁহার গুরুনির্দিষ্ট মিশন্ বা কাজ। দাক্ষিণাত্যের সৌন্দর্য্য ও মন্দিরাদির কারুকার্য্য নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মাদ্রাজে কাটাইলেন। নিবেদিতার বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় ছাপা হইতে লাগিল এবং ইহা বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা আতঙ্কের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কেন না, তাঁহাদের মতে বিবেকানন্দের এহ অতি উগ্র স্বদেশ প্রেম নিতান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উহা মঠের উপর চাপাইলে মঠ সেই ভার সহ্য করিতে পারিবে না, ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সুতরাং নিবেদিতাব এহ উগ্র মারমুখী চরমপন্থী বক্তৃতা থামাইতে হইবে। নতুবা মঠ বাঁচিবে না। মাদ্রাজেব বক্তৃতাতেই এই। বরোদায় অরবিন্দের সাক্ষাৎকার তখনও সন্ন্যাসীরা জানিতে পারেন নাই।

মাদ্রাজ হইতে নিবেদিতা খৃষ্টমাসের সময় উড়িষ্যায় খন্ডগিরিতে আসিয়া স্বামিজীর কয়েকটি সন্ন্যাসী শিষ্যের সহিত রাত্রি যাপন করিলেন। St. Luke বাইবেল হইতে প্রভু যীশুখৃষ্টের কবর হইতে উত্থানের গল্প পাঠ করিলেন। খন্ডগিরির পর্বত গুহা ও চতুর্দিকের অরণ্যের মধ্যে তাঁহারাও যেন কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ইহা কি স্বামী বিবেকানন্দেরই পদধ্বনি? নিবেদিতা অতিশয় বিহ্বলচিত্তে ইহা বর্ণনা করিয়াছেনঃ "Towards Christmas of the year 1902, a few of the Swami Vivekananda's disciples gathered at Khandagiri neár Cuttack to keep the festival. It was evening, and we sat on the grass, round a lihgted log. *** We had wilth us a copy of the Gospel of St Luke. *** We lost ourselves in the story *** then the Death; and finally the Resurrection. *** We passed over that night at Khandagiri, *** May God grant that this living presence of our Master of which death itself had not had power to rob us become never, to us his disciples, as a thing to be remembered, but remain with us always in its actuality, even unto the end." (The Master As I saw Him, pp. 509-514)

স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর নিবেদিতার মাত্র ছয় মাসের জীবন ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হইল।

বেলুড় মঠের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ; অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিতে যোগদান;
১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর খন্ডগিরিতে খৃষ্টমাস উদ্‌যাপন করিয়া নিবেদিতা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীর প্রথম ভাগে কলিকাতা ফিরিলেন। নিবেদিতা যখন

খণ্ডগিরিতে ছিলেন, সেই আহ্‌মেদাবাদে কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সভাপতি হইয়াছিলেন।

নিবেদিতা যখন মাদ্রাজে বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা তাঁহার বক্তৃতাগুলি খুব জমকালো ভাবে প্রতিদিন ছাপাইতেছিল। নিবেদিতা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাজ জাতিকে জাগ্রত করা। এই বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়া তিনি সেই কাজই করিতেছিলেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রদেশে তাঁহার নামও ছড়াইয়া * পড়িতেছিল। ইহাতে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কথাবার্ত্তার সময় মঠের আরও কয়েকটি সন্ন্যাসীও উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতাকে বলা হইল, "হয় তুমি রাজনীতি ছাড়, না হয় আমাদিগকে ছাড়। এই দুইয়ের একটি পথ তোমাকে বাছিয়া লইতে হইবে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দই এই কথাগুলি বলিলেন। অপর একটি উদ্‌যোগী সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একাধারে একজন কঠোর তপোনিষ্ঠ যোগী ছিলেন সেই সঙ্গে উগ্র স্বদেশপ্রেমিকও ছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সংসার ত্যাগের উপর এই মঠের সবে প্রতিষ্ঠা। এই শিশু মঠের উপর স্বামিজীর উগ্র স্বদেশপ্রেম চাপাইয়া দিলে মঠটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট নিবেদিতার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলি উপলক্ষ্য করিয়া যদি তাঁহাকে আক্রমণ করে তবেত এই মঠের ধ্বংস অনিবার্য্য।

নিবেদিতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমস্ত কথাই স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। তারপর মুখে মৃদুতা ও দৃঢ়তা লইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, "আমি রাজনীতি ছাড়িতে পারিব না। আমি উহার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছি। আমি বরং প্রাণত্যাগ করিব, তবু উহা ছাড়িব না।" — (ফরাসী জীবন চরিতের অনুবাদ, পৃঃ ২৩৭)।

এই অল্প কয়টি কথার মধ্য দিয়া নিবেদিতা চরিত্রের যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, কোন চিত্রকর বা কোন ভাস্কর ইহা অপেক্ষা অধিক দক্ষতার সহিত নিবেদিতা চরিত্রকে অঙ্কিত করিতে পারিত না। নিবেদিতাকে দেখিলাম একখানি কোষমুক্ত তরবারি।

কোন সম্প্রদায় বিশেষের নির্দেশ অনুসারে জীবনের পথে চলিতে হইবে, ইহা চিন্তা করাও নিবেদিতার পক্ষে অসহ্য।

* ফরাসী জীবন চরিতের অনুবাদ, পৃঃ ২৩৬-৭।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং মঠের সন্ন্যাসীগণ নিবেদিতাকে চিনিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ পারিয়াছিলেন।

নিবেদিতার কথা শুনিয়া স্বামী বহ্মানন্দ বলিলেন, "তবে তুমি এক কাজ কর। এক খোলা চিঠি লিখিয়া কলিকাতার প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া দাও; এবং ঐ পত্রে স্পষ্ট করিয়া লেখ যে, তুমি স্বেচ্ছায় মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতেছ।"
(ফরাসী জীবন চরিতের অনুবাদ, পৃঃ ২৩৮)।

নিবেদিতাকে মঠ ছাড়িতে বাধ্য করা হইল। ইহাতে দোষের কিছুই নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে বলা হইল—"লেখ যে, তুমি স্বেচ্ছায় মঠ ছাড়িয়া যাইতেছ। অর্থাৎ আমরা তোমাকে তাড়াইয়া দিতেছি না।" ইহাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের তৎকালীন সন্ন্যাসীদের চরিত্রে যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইল তা সত্যই দুঃখের বিষয়। কেন না, এই দুর্বলতাটুকু নিশ্চই নিবেদিতার চক্ষু ও মনকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

নিবেদিতাকে যেরূপ বলা হইল, তিনি তাহাই করিলেন। নিবেদিতার বন্ধু মিঃ র‍্যাট্‌ক্লিফ্ তখন 'দি ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নিবেদিতার খোলা চিঠি অনায়াসেই ছাপা হইয়া বাহির হইল।

এখন বাকী রইল শুধু টাকাপয়সার হিসাব। নিবেদিতা মঠের জন্যই হউক অথবা তাঁহার স্কুলের জন্যই হউক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা নিবেদিতার নিকট ঐ চাঁদার টাকা অতি সত্বর চাহিয়া বসিলেন। নিবেদিতা সাময়িক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অতি সামান্য কিছু রাখিয়া বাকী সমস্ত টাকাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিলেন। যে টাকা ফিরাইয়া দিলেন, তাহার পরিমাণ চারিশত ষ্টার্লিং পাউন্ড। নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী। তিনি ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং বিনা দ্বিধায় তিনি টাকা ফিরাইয়া দিলেন। যদিও এই টাকা ফিরাইয়া দিতে তিনি আইনতঃ কতটা বাধ্য ছিলেন তাহা এখন বলা কঠিন। কেন না, মঠের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আশ্রিতা, এ কথা তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘোষণা করিতে পরঙ্মুখ হন নাই। টাকা-পয়সা ফিরাইয়া মঠের সংশ্রব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি স্বাধীনভাবে নিষ্ঠার সহিত তাঁহার ইপ্সিত রাজনৈতিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।
(ফরাসী জীবন চরিতের অনুবাদ, পৃঃ ২৩৮)।

নিবেদিতার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে না হইয়া পারে না। নিবেদিতা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী প্রথমে ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে ভারতের সেবার জন্য এদেশে আসিতে আহ্বান করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন, "তুমি ভারতের জন্য কাজ কর বা না কর, তুমি বেদান্ত গ্রহণ কর বা না কর, আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার পেছনে থাকিব। হাতীর দাঁত যেমন একবার বাহির হইলে আর তাহা ভিতরে প্রবেশ করে না, মরদের কথাও ঠিক তেমনই।" নিবেদিতা স্বামিজীর এই কথা কয়টি চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে ইহা তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।*

কাজেই মঠের সংশ্রব ত্যাগ করিলেও নিবেদিতা কোন দিন নিজেকে স্বামিজী হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারেন নাই। তা নাহলে বহু বৎসর পরে গ্রন্থ লিখিবার সময় "I will stand by you unto death." এই কথাটি এত জোর দিয়া প্রকাশ করিতেন না।

এদিকে নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দের সহিত একত্রে কাজ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া আসার পর অরবিন্দ বারীন্দ্রকে গুপ্ত সমিতির কাজে যতীন্দ্র ব্যানার্জীকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা পাঠাইলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন,

"যতীনদা কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। আমাকে বাংলা দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে হাতী ধরে, গন্‌গনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্য গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হল।" — আত্মকথা, পৃঃ ১৮৪-১৮৫।

বারীন্দ্র আরও লিখিয়াছেন "বরোদা থেকে বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে আমি এসেছিলুম কলকাতায়, সে হচ্ছে ১৯০২ সালের বোধ হয় মাঝামাঝি বা শেষাশেষী। তাঁর ছয়মাস আগে ঠিক ঐ গায়কবাড়ের বরোদা থেকেই সেই একই গুপ্ত সমিতির কাজে দীক্ষা নিয়ে যতীনদা জাঁকিয়ে বসেছেন।" — বোমার কাহিনী, স্বদেশ, কার্ত্তিক, ১৩৩৮।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিতেছি। এই বছর অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্ব কলিকাতায় পুরাদমে চলিতেছে। যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ও শেষে পরপর গুপ্ত সমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া অরবিন্দই কলিকাতায়

---

* "... he afterwards wrote to me on the eve of my departure. I will stand by you unto death, whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it. The tusk of the elephant côme out, but they never go back. Even so are the words of a man." (THe Master As I saw Him, p. 47)

পাঠাইয়াছেন এবং অরবিন্দ নিজেও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সমিতির কাজে দুইবার কলিকাতা আসিয়াছেন, মেদিনীপুরেও গিয়াছেন। এখন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা এই গুপ্ত সমিতিকে তাঁহার লাইব্রেরীর সমস্ত বই দিলেন এবং এই সমিতির যুবকদের পরামর্শদাতারূপে ইহাতে যোগদান করিলেন। বারীন্দ্র কুমার লিখিয়াছেন ঃ

"সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক দেড়শ' বই দিয়েছিলেন। কথা ছিল রাজনীতির স্কুল করে, ইতিহাস, জীবনী, ও ডিগবী, রমেশ দত্ত, নৌরজী আদির অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে, এখানে প্রথমে কতকগুলি পলিটিকাল মিশনারী গড়া হবে। এবং তারপর নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতিক ক্লাসের। তারপর জুটল এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্র নন্দী, এই ধরনের অনেক মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লব কেন্দ্রটির সহিত পরিচয় করিয়ে দিলুম। দেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে এই শিবাজীভক্ত মহারাষ্ট্র সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীনদার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।"— বোমার কাহিনী, স্বদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠের সহিত নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল; এবং তিনি কলিকাতায় অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের সহিত, তাহার লাইব্রেরীর বইগুলি দিয়া, পলিটিক্যাল মিশনারী গড়িবার মতলব আঁটিয়া, অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিবেদিতার জীবন ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে গিয়া আমরা এই চরিত্র-চিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বারীন্দ্র কুমার অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়া কলিকাতায় নিবেদিতার কাছে আসিলেন। বারীন্দ্রের বয়স তখন ২৩ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। নিবেদিতা বারীন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু তুমি কি তোমার দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?" বারীন্দ্র বলিলেন, "আপনি যদি 'জোয়ন অফ্ আর্ক' হন, তবে আমরা আপনাকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করিব। আপনার পশ্চাতে আমাদিগকে চলিতে আদেশ দিন।" — ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৪৩।

নিবেদিতা বাধা-বিঘ্নের কথা উল্লেখ করেন, বলিলেন— ইতালিতে যেমন

Cavour এবং Mazzini ছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ নেতা আছেন। ইহারা শুধু কোন এক বিশেষ দেশের নেতা নহেন। পরন্তু সমস্ত মানবজাতির নেতা। কিন্তু ইটালি যে উপায় অবলম্বনে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, ভারত তাহা পারিবে না। কেন না, ভারতের অবস্থা ইটালি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। — ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৫৪।

নিবেদিতা ও সরলা দেবী

সরলা দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী, রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। তিলক প্রবর্ত্তিত শিবাজী উৎসবের (১৮৯৫) অনুকরণে সরলা দেবী (১৯০৩, এপ্রিল) বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতাপাদিত্য উৎসব আরম্ভ করিলেন। এই বৎসরেই (১৯০৩) শ্রাবণমাসে তিনি প্রতাপাদিত্যের পর উদয়াদিত্য উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। মারাঠীদের অনুসরণে বীরাষ্টমীতে সরলা দেবীর লাঠি খেলার ছেলের দল রীতিমত অস্ত্রপূজা আরম্ভ করিলেন।

মারাঠা হইতে যেমন অরবিন্দ বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতির বীজ আনিয়া রোপণ করিলেন, সরলা দেবীও তেমনই মারাঠা হইতেই প্রেরণা পাইয়া প্রতাপাদিত্য উৎসব ও ছেলেদের মধ্যে অস্ত্রপূজা প্রবর্তন করিলেন। কিন্তু সরলা দেবী রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির আদৌ পক্ষপাতী হহেন, বরং অত্যন্ত বিরোধী। লাঠি খেলার দলের ছেলেরা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দলে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে তিনি অতিশয় প্রমাদ গণিলেন। নিবেদিতা যে সময় (১৯০২, অক্টোবর) বরোদায় গিয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং গুপ্ত সমিতিতে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন ঠিক সেই সময় সরলা দেবী পুণা শহরে গিয়া লোকমান্য তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিলক বলিলেন যে, এরকম ডাকাতিতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত বা সফল হইবে না। সুতরাং ইহা নিরর্থক। তবে প্রকাশ্যে তিনি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না বা লিখিবেন না। প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন পথে মানুষ চলিবে ও সার্থকতা খুঁজিবে।*

সরলা দেবী তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন — যতীন্দ্র অরবিন্দের নিকট হইতে চিঠি লইয়া প্রথমে তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। তিনি ও যতীন্দ্র একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ যতীন্দ্রের রাজনীতি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব মুহূর্ত

---

* "Tilak told me distinctly he did not approve of the dacoities, much less authorise them, if for nothing else simply on the score of their being practically useless for political purposes. But looking to differences in human nature and the varying processes of evolution suited to different temperaments he did not condemn them openly." [Sarala Devi Chowdhurani]

পর্য্যন্ত বজায় ছিল। তিনি গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির বিরুদ্ধে ছিলেন। বারীন্দ্রের সহিত তাঁহার দেখা হইত না। তবে যতীন্দ্রের কাছ হইতে তিনি বারীন্দ্রের গতিবিধির সমস্ত খবর পাইতেন।

যতীন্দ্র ব্যানার্জী অরবিন্দ প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির প্রথম নেতা। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই গুপ্ত সমিতি পুরাদমে চলিতেছে। ঠিক এই সময়ে সরলা দেবীর লাঠি খেলোয়াড়ের দলও পুরাদমে চলিতেছে। সরলা দেবী লিখেছিলেন, "my lathi cult was in full swing in those days."। অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়াই প্রথমে যতীন্দ্র ব্যানার্জীকে কলিকাতা পাঠাইয়াছিলেন। সরলা দেবী আরও লিখিতেছেন যে, যতীন্দ্র ব্যানার্জী প্রথম হইতে শেষ অবধি তাঁহার সহিত কাজ করিয়াছেন। সুতরাং দুই দলের মধ্যে যতীন্দ্র ব্যানার্জী একটি যোগসূত্র অথবা সেতু স্বরূপ। যতীন্দ্র ব্যানার্জী অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিও পরিচালনা করিতেছেন, আবার সরলা দেবীর লাঠি খেলার দলেও কাজ করিতেছেন। অথচ সরলা দেবী গুপ্ত সমিতির বিরোধী। 'ইংরেজ ঘুষি দিলে আমরা দেশী কিল দিব,'— 'ভারতী' পত্রিকায় ইহা লিখিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেরা ডাকাতি করিবে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন না। তাঁহার মতে ডাকাতেরাই শুধু ডাকাতি করিবে।

নিবেদিতা সরলা দেবীর লাঠি খেলার দলে যোগ দেন নাই। সরলা দেবী বিপ্লবী নহেন, নিবেদিতা বিপ্লবী। উভয়ের চরিত্রে এইখানেই তফাৎ।

নিবেদিতা ও মিঃ গোখলে

১৯০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে নিবেদিতা মিঃ গোখলেকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, "আপনি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিবেন না যে, আমি আপনার কার্য্যকে কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।" ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যাইবেন স্থির করিলেন। কেন না, তাঁহার রাজনৈতিক বন্ধুরা তখন দার্জিলিংয়েই অবস্থান করিতেছিলেন। বিশেষতঃ গোখলে তখনও দার্জিলিংয়েই ছিলেন। তিনি দার্জিলিং গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। মিঃ গোখলে অর্থনীতিবিদ্, কিন্তু মডারেস্য মডারেট এবং গুপ্ত সমিতির অত্যন্ত মারাত্মক রকমের বিরোধী। অরবিন্দ লোকমান্য তিলকের গুণমুগ্ধ, এমন কি অনুগামী। কিন্তু মিঃ গোখলেকে তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। এমন কি গভর্ণমেন্টের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অবস্থায় নিবেদিতার সহিত গোখলের এতটা ঘনিষ্ঠতা হইল কি করিয়া! গোখ্লে কি নিবেদিতার বৈপ্লবিক কর্মপন্থার কার্য্যাদির বিষয় অবগত ছিলেন

না? নিবেদিতা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে থাকাকালীন রমেশ দত্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি রমেশ দত্তের গুণগ্রাহী ছিলেন। এই বৎসর রমেশ দত্ত বলিলেন, "দিল্লী দরবার (১৯০৩) একটা প্রকান্ড ধাপ্পাবাজী — a mockery and a delusion।" রবীন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের এই দিল্লী দরবারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। নিবেদিতার নিকট রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ইহারা উভয়েই শুধু পরিচিত নহেন, ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং লর্ড কার্জনের এই mockery ও delusion উগ্রপন্থী নিবেদিতার মনকেও কম আঘাত দেয় নাই। এই বৎসরের (১৯০৩) আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, নিবেদিতা বিপিনচন্দ্র পালের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তা ছিলেন, এখন লেখিকা হইতে চলিলেন।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর একটি শাখা নিবেদিতা, আর একটি শাখা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ* ট্রিনিটি কলেজে উপাধ্যায় আবার তিনটি বক্তৃতা দিলেন — (১) হিন্দু নির্গুণ ব্রহ্ম, (২) হিন্দু ধর্মনীতি, (৩) হিন্দু ভক্তিতত্ত্ব। উপাধ্যায় দার্শনিক মতবাদে নির্গুণ ব্রহ্ম ও অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। নিবেদিতাও বিবেকানন্দের অনুগামী হইয়া অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রী অরবিন্দের দার্শনিক মত স্পষ্ট অদ্বৈতবাদ-বিরোধী। ডাঃ মেটাগার্প (Dr. Metaggarp) সবগুলি বক্তৃতাতেই সভাপতি হইয়াছিলেন।

সুতরাং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ-এ দার্শনিক ভূমিতে, উপাধ্যায় "ফিরিঙ্গিজয় ব্রত" ছয়মাসেরও কম সময়ের মধ্যে উদ্‌যাপন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পর ইহা সহজ কাজ ছিল না। মিঃ ডবলইউ ষ্টেড (W. Stead) উপাধ্যায়কে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অক্সফোর্ড আবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। এদিকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শনের জন্য একটি নূতন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিবার কথা হইল। উপাধ্যায়ের বেদান্ত বক্তৃতাই ইহার কারণ।

উপাধ্যায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া সর্বাগ্রে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক পদে বরণ করিয়া কেম্ব্রিজ পাঠাইবার জল্পনা কল্পনা আরম্ভ করিলেন। ফলে কিন্তু উহা ফাঁসিয়া গেল। একটা বিরুদ্ধ দল ছিল। উপাধ্যায় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন — "ব্যথা হ'ল আমার, ছেলে হ'ল ওদের।"

নিবেদিতার দার্জিলিং-এ বিশ্রাম দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। উত্তর ভারত হইতে জরুরী নিমন্ত্রণ আসিল, ঐ সকল প্রদেশে কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে হইবে। ডিসেম্বরে প্রচন্ড শীতের মধ্যে নিবেদিতা বাঁকীপুর রওয়ানা হইলেন। প্রভাতে ষ্টেশনে পৌছিবামাত্রই তাঁহার কামরাতে সম্ভ্রান্ত মুসলমান প্রতিনিধিগণ আসিয়া ফুলের তোড়া, এক চুপড়ী কমলা লেবু এবং তুলট কাগজে লিখিত একটি মানপত্র প্রদান করিলেন। নিবেদিতা অত্যন্ত খুশী হইলেন।

তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ঐ অঞ্চলের নানা স্থান ঘুরিয়া হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী সম্বন্ধে অতিশয় সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। মুসলমান যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতের এই দীর্ঘ শতাব্দীগুলির মধ্যে হিন্দু-মসলমান এই দেশে একই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করিয়াছে তাহার বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিলেন। এই বক্তৃতাগুলি পরের বৎসর (১৯০৪) "The Web of Indian Life" গ্রন্থে 'Islam in India' নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী সদানন্দ ীপুর আসার কালে এই প্রথম নিবেদিতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ কংগ্রেস — উগ্র রাজনীতি

নিবেদিতা কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও ইহা তাঁহার কার্য্যকলাপের ও চিন্তার বাহিরে ছিল না। অরবিন্দকেও কংগ্রেসে দাঁড়াইয়া কোনদিন বক্তৃতা করিতে দেখি নাই। এবার কংগ্রেসে ইংরাজী ভাষায় বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ সভাপতি, স্যর ফিরোজ শা মেহতা লালমোহনের প্রতি একটু বক্রোক্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনি এখন পলিটিক্যাল যোগী। ইহার উত্তরে লালমোহনের বক্তৃতায় যে আগ্নেয়গিরির প্রস্রবন ছুটিয়াছিল, তাহা এখন বাঙ্গালী কংগ্রেসীদের কল্পনারও বাহিরে। এই কংগ্রেসেই লালামোহন বাংলা ও মাদ্রাজকে দ্বিখন্ডিত করিবার প্রস্তাবের প্রথম প্রতিবাদ করিলেন। তে হি দিবসাগতাঃ। তারপর বালক বালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব করিলেন।

নিবেদিতা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মের প্রথমদিকে বাঁকীপুর ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই শুনিলেন যে, গভর্ণমেন্টের তীক্ষ্ণ ও বক্র দৃষ্টি যাঁহাদের উপর ছিল, তাঁহার নামও সেই তালিকাভুক্ত। পুলিশ তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। বাগবাজারে তাঁহার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া পুলিশ গোপনে খোঁজ নিতেছে। স্বামী সদানন্দের নামও পুলিশের তালিকাভুক্ত ছিল। বিনা কারণে স্বামী সদানন্দ অদৃশ্য হন নাই।

এই সময় নিবেদিতা আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম— Aggressive Hinduism —প্রচার করিতেছিলেন। চারিদিকের আবহাওয়া তাঁর অনুকূলে বহিতেছিল।

(ক) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে "Personality of Sri Krishna" সম্বন্ধে কলিকাতা আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিলেন, মিঃ এন্ এন্ ঘোষ সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা "Kali, the Mother" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, মিঃ এন্ এন্ ঘোষ সেই সভায় সভাপতি হইতে প্রথমে স্বীকৃত হইয়া পরে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। উপাধ্যায় গত বৎসর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ-এ থাকাকালীন 'বঙ্গবাসী' পত্রে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুয়ানী সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাধারায় গোঁড়া রক্ষণশীলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। 'সন্ধ্যা' পত্রের সূচনাতেও তিনি লিখিলেন—

"আমরা হিন্দু। আমরা হিন্দু থাকিব। বেশ-ভূষায় অসনে-বসনে সর্বপ্রকারে হিন্দু থাকিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর, হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও ... ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতি মর্যাদা রক্ষা করিলে কোনো দোষ স্পর্শ করিবে না।"

যদিও স্বামী বিবেকানন্দ এই নব্য হিন্দুয়ানীর প্রবর্তক, তথাপি ব্রাহ্মণে এতটা ভক্তি আর জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিতে এতটা উৎকণ্ঠা তাঁহার ছিল না। "দুষ্ট পুরোহিত" গুলোর প্রতি তিনি খুব সদয় ছিলেন না।

(খ) রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই তাঁহার স্মরণীয় প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম পাঠ করিলেন। রমেশ দত্ত সভাপতি হইলেন। পরে কার্জন থিয়েটারেও ঐ প্রবন্ধ আবার পাঠ করিলেন। এ প্রবন্ধেও যথেষ্ট হিন্দুয়ানীর প্রচার করা হইল।

(গ) বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় হিন্দুধর্মের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে লাগিয়াছেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিপিনচন্দ্রকে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

(ঘ) অরবিন্দ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে (১৬ই বৈশাখ, ১৩০৮) প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চৌদ্দ বছরের এক মেয়েকে হিন্দুমতে বিবাহ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর সমালোচনা করিয়াছেন — " ব্রাহ্ম-সংস্কারকেরা যে শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়ে বাহির করিতেছেন ঐ সকল মেয়েরা প্রাণহীন, তাহারা কেবল জানে ভাসা-ভাসা পিরীত করিতে, বিবাহ করিতে, আর পিয়ানো বাজাইতে। আমরা এরকম মেয়ে চাই না।"*

* "Our social reformers ... have turned out a soulless and superficial being fit only for flirtation, match-making, and playing on the piano." (Induprakash, 13 August, 1894).

প্রতিক্রিয়া, উপাধ্যায় অপেক্ষা অরবিন্দে আরও বেশী দেখা যাইতেছে।

অরবিন্দকে নিবেদিতা বরোদায় বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' উপহার দিয়া আসিয়াছিলেন। ফলে ইহার পরের বৎসরেই অরবিন্দ হিন্দুধর্মানুমোদিত যোগ অভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্ম, আধাব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকলেই উপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছেন, "যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর, হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও ...।"

চারিদিক হইতে এই অনুকূল হাওয়া নিবেদিতাকে বেষ্টন করিয়া বহিতেছিল, এবং ইহারই মধ্যে দন্ডায়মান হইয়া নিবেদিতা কিছুদিন হইতে বক্তৃতা করিতেছিলেন—"Aggressive Hinduism," আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম।

নিবেদিতা বলিতেছেন, "হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মই পরিবর্তন-মুখে এতটা আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। বিভিন্ন যুগে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম অথবা সংস্কৃতি হিন্দুধর্ম্মের সম্মুখে আসিয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম সে-গুলিকে অঙ্গীভূত করিয়া নিজের শক্তির পরিচয় দিয়াছে।"*

ইহা একটি অভিনব ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলাদেশ বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্ম এবং ক্রমবর্ধমান মুসলমানধর্ম এ ব্যাখ্যার সমর্থনে সাক্ষ্য দেয না।

নিবেদিতা বলিতেছেন, "আত্মরক্ষাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ নয়। অপরকেও আমরা এখন converted করিব।" আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গিয়া ভগিনী নিবেদিতা একটু বেশী দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। আমরা হিন্দু, অন্য ধর্মাবলম্বীকে convert করিয়া আনিয়া হিন্দুসমাজে স্থান দিতে পারি না। আমরা অন্য ধর্ম দ্বারা converted হইতে পারি এবং হইয়াও আসিয়াছি। ভারতবর্ষের মুসলমান যুগের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। ভগিনী নিবেদিতাও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন এমন কি আমাদের চেয়েও উৎকৃষ্ট হিন্দু হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকেও হিন্দু সমাজভুক্ত করিয়া লইতে পারি নাই। হিন্দুধর্ম জাতিগত (ethnic) ধর্ম। যে জন্মে হিন্দু নয়, তাহাকে এই ধর্মে আনিয়া সমাজভুক্ত করা যায় না। ইহা ethnic ধর্মের বিশেষত্ব। পরন্তু মতের (creed) ধর্মে পৃথিবীর যে কোন ধর্মের মানুষকে ঐ ধর্মের সমাজভুক্ত করা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ খৃষ্টান বা মুসলমান হইতে পারে, কিন্তু মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, — হিন্দু হইতে পারে না।

অবশ্য ধর্মেই হৌক বা রাষ্ট্রেই হৌক, পড়িয়া পড়িয়া ভারতবাসীরা বিদেশীর

* "No other religion in the world is so capable of this dynamic transformation."

নিকট মার খাইয়া আত্মরক্ষার জন্যই আক্রমণশীল (aggressive) হউক, এ কথা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। এবং এই পরিবর্তিত মনোভাব যে আমাদের মনে একটি বিপ্লব আনিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।*

এই সব নব্য-হিন্দুয়ানীর প্রচারকদের মধ্যে উপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র রাজনীতিতে চরমপন্থী। আর অরবিন্দ ও নিবেদিতা বিপ্লবী। নব্য-হিন্দুয়ানীর সহিত উগ্ররাজনীতির যোগাযোগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি কেন ভাঙ্গিল

নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বেই ইহার সহিত জড়িত হইয়া ইহাতে যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা তাহা দেখিয়াছি। এখন এই বৎসরের মাঝামাঝি এই গুপ্ত সমিতিটি ভাঙ্গিয়া গেল। বারীন্দ্র যতীন্দ্রের অধীনে কাজ করিতে রাজী হইল না। কাহারও নেতৃত্ব সহ্য করা তাহার স্বভাবে নাই। সে সার্কুলার রোডের কেন্দ্র ছাড়িয়া গ্রে ষ্ট্রীটে কেন্দ্র স্থাপন করিল। সার্কুলার রোডের কেন্দ্রে যতীন্দ্রের একটি বিধবা যুবতী ভগিনী ছিল। বারীন্দ্র তাহার মাতুল সত্যেন্দ্র বসুর সহিত ঐ যুবতীর খারাপ সম্পর্কের কথা রাষ্ট্র করিল। এমন কি, ঐ যুবতীটি যতীন্দ্রের ভগিনী নয়, প্রণয়িণী — এমন কথাও রাষ্ট্র করিল। অবশ্য এই উভয় কথাই মিথ্যা। আর তা ছাড়া বারীন্দ্র নিজে শুকদেব গোস্বামীও নহেন এবং ভীষ্মদেবও নহেন। তিনি নিজে "আত্মকথায়" স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, বৈদ্যনাথে তাহার ছাত্র অবস্থাতেই "নৈতিক চরিত্রে পঙ্কিলতা প্রবেশ করে।" আরও লিখিয়াছেন যে, "জন্ম হইতেই আমার মধ্যে কামশক্তি অতিশয় প্রবল।" কোন্ শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকারা তাহার নিকট হইতে এই জরুরী সংবাদটি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, জানি না।

অরবিন্দ যখন বরোদা হইতে এই কলহ মিটাইবার জন্য কলিকাতা আসিলেন, তখন বারীন্দ্র এই সমস্ত মিথ্যা কথা অরবিন্দের কানে তুলিলেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন, — "এক তরফা বিচারে অরবিন্দ যতীন্দ্রকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। ফলে সার্কুলার রোডের আড্ডা উঠে গেল।" (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ৩৮০)

বারীন্দ্র কুমার লিখিয়াছেন— "Jatindra Nath our first revolutionary leader and myself and Devebrata Bose quarelled simply because

---

* Aggression is to be the dominant characteristic of the India that is today. *** Merely to change the attitude of the mind, in this way is already to accomplish a revolution." — Aggressive Hinduism, p. 4.

we did not want Jatin with his proud abrupt military temperament to boss the show and brush us side to a secondary position."

(Barindra k. Ghosh—Dawn of India, Dec. 22,1933)

স্পষ্ট কথা। কোন ঘোর, প্যাঁচ নাই।

পরবর্তীকালে অরবিন্দ নিজে বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের তিন-চারি বৎসর পূর্বে তিনি বাংলা দেশে যে গুপ্ত সমিতির অভিযান সুরু করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন তাহার কারণ বাংলা দেশ তখন প্রস্তুত ছিল না। অরবিন্দ বলিতেছেন—When I went to Bengal three or four years before the swadeshi movement was born*** what I found there was apathy and despair." (The Present situation — a lecture at Bombay, 19th January, 1908)

অরবিন্দ বারীন্দ্রের উপর স্পষ্টতঃই পক্ষঃপাতিত্ব করিলেন। নেতাদের মধ্যে পি. মিত্র ও সরলা দেবী, ছেলেদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও ভূপেন্দ্র দত্ত অরবিন্দেব নেতৃত্বে আস্থা হারাইলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই সমস্ত দেখিয়া কি ভাবিলেন বা কি করিলেন কোথাও উল্লেখ নাই। প্রমাণ হইল, অরবিন্দের নেতৃত্বে বিচক্ষণতার অভাব।

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা (১৯০৪)

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার জমিদারীর কাছারী শিলাইদহে থাকিতেন, তখন নিবেদিতা সেখানে যাইতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"আমি যখন শিলাইদহে থাকতাম, তখন নিবেদিতা কখনো কখনো এসেছেন। এক দিনের ঘটনা বললেন। পদ্মার চরের মধ্য হতে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া হচ্ছে। চাষীরা ভোরের সময় লাঙ্গল কাঁধে মাঠে আসছে। গেরুয়াবসন-পরিহিতা গৌরাঙ্গী এক মেমসাহেবকে আমার সাথে দেখে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিবেদিতার সহিত আর একটি মেয়ে ছিল তার সহচরী। কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা! নিবেদিতা দৌড়ে চাষীদের কাছে চলে গেলেন। বললেন, ভাই তোমরা এমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তারা বলল আমরা মেমসাহেবকে দেখছি। তিনি বললেন মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই, চল তোমাদের বাড়ী যাই, তোমাদের দেখবো আমি। চাষীরা শশব্যস্তে তাঁকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস নিবেদিতা যেন আমাকেও চিনতে পারেন না। আমার জমীদারীর যতগুলি গ্রাম ছিল সমস্ত গ্রাম তিনি গিয়েছেন এবং ঐ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে, মন মিলিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হয়েছেন। তাদের সঙ্গে চিড়ে কুটেছেন, ধান ভেনেছেন — তাদের নাড়ু মোয়া

খেয়েছেন — তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের জন্য কত সাহায্য করেছেন। আমি দেখে অবাক হয়ে গেছি যে তিনি তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে ঢেঁকিতে পা দিয়ে ধান কুটেছেন।*

"শিলাইদহের গৃহস্থবাড়ীর রান্নাঘর, শয়নঘর, ঢেঁকির গরুবাছুর সব দেখিয়া তাঁহার কি আনন্দ! পল্লী নরনারীর স্বহস্তকৃত সেকেলে কাঁথা, ছেলেদের দোলাই, কুলো, ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ করা, বাঁশের কাজ করা, পাখা লাঠি—তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মুসলমান জোলার তাঁতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি সাগ্রহে দেখিয়া লইলেন। বুনোপাড়ার ছেলেদের "অষ্টসখীর' নাচগানও শুনিতে ছাড়েন নাই।" (মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৫৬)।

ভগিনী নিবেদিতা প্রথমে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে বোধগয়া যান। বোধগয়ায় মোহান্তের সহিত হিন্দু ও বৌদ্ধের একটা বিরোধ দেখা দিয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশ অনুসারে নিবেদিতা বোধগয়ায় গিয়া ঐ বিরোধ মিটাইয়া দিয়া আসেন। বৌদ্ধেরা হিন্দু হইতে পৃথক নয়, ইহাই নিবেদিতা সাব্যস্ত করেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন 'আমি এখন এক ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইতেছি বৌদ্ধ ধর্ম্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, আর খৃষ্টান ধর্ম্ম তার দূরাগত প্রতিধ্বনি, — I go forth to preach a religion of which Buddhism is a rebel child and Christianity a distant echo."

নিবেদিতা সাঁচী বৌদ্ধ স্তূপ দেখিতে গিয়াছিলেন। সাঁচীর ভাস্কর্য্যকে সরল ও অনাবিল বলিয়াছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার পথে রাজগৃহের সহিত ইহার তুলনামূলক বিচারও করিয়াছেন। সাঁচীর ধ্বংসোন্মুখ বৌদ্ধস্তূপ যখন তিনি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্বে মিশর প্রত্যাগত একজন মহিলা বলিলেন, "আপনি যদি মাত্র দু'হাজার বৎসরের অতীতকে দেখিয়াই এমন বিহ্বল হন, তবে চার হাজার বৎসরের অতীতকে দেখিলে কি করিবেন?" নিবেদিতা উত্তর করিলেন, "আমি অতীতের কথা ভাবিতেছি না। সাঁচী কতকগুলি স্তূপাকার পাথরের ভগ্নাবশেষ। আমি ভাবিতেছি যে কল্পনা ও শক্তি লইয়া একদিন এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ভারতবাসীর মধ্যে সেই শক্তি এখনও বিদ্যমান আছে।"

ভগিনী নিবেদিতা আবার যখন বুদ্ধগয়া দেখিতে যান, তখন তাঁহাদের দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ চন্দ্র বসু ও লেডী অবলা বসু। স্যার

---

* শ্রীমতী লীলা সরকার, উদ্বোধন, কার্ত্তিক, ১৩৫৯, পৃঃ ৫৭৬-৭৭।

যদুনাথ সরকার পরে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন—

(১) সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া ধ্যান করিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ইহার একটি ডাল লঙ্কায় নিয়া তথাকার রাজা তথায় প্রোথিত করেন।

(২) অল্প কিছু দূরে একখানি গোলাকার পাথর ছিল, তাহার উপরে একটি বজ্র খোদিত ছিল। এই বজ্রটি কথিত আছে স্বয়ং ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে দিয়াছিলেন। এই বজ্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নিবেদিতা বলিলেন ইহার অর্থ এই যখন কেহ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেন তখন এই বজ্রের মতই শক্তিশালী হইয়া দেবতাদের নির্দিষ্ট কার্য্য করেন। তিব্বতবাসী বৌদ্ধেরা এখনও ইহা ব্যবহার করেন, যদিও ভারতে এখন আর ইহার প্রচলন নাই। নিবেদিতার বহু গ্রন্থের পুরোভাগে এই বজ্রের চিহ্ন ছাপান আছে।

(৩) সন্ধ্যাকালে নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা একত্রে বেড়াইতে বাহির হইতাম। সুজাতা বুদ্ধদেবকে স্বর্ণ থালাতে করিয়া পায়েস খাইতে দিয়াছিলেন। সুজাতার পায়েস ভক্ষণ করিয়াই বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন। সুজাতার বাড়ী ছিল উরুবেলা গ্রামে। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। ঐ গ্রামটিকে এখন উর্বিল বলা হয়। নিবেদিতা বলিলেন, এই গ্রামেই সুজাতা বাস করিতেন। উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে নিবেদিতা সেই গ্রামের খানিকটা মৃত্তিকা তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, সুজাতার গ্রামের মৃত্তিকা পবিত্র।*

(৪) নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং এই তীর্থগুলির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "Sister Nivedita had a wonderful, sympathetic and penetrative power of going to the very heart of things. The rituals, the customs and the traditions, some of which we have forgotten and some of which we follow blindly or as explained by the priests, were restored to their original colour, their true meaning, by the novel and critical exposition of the Sister. First she wrote, "The Web of Indian Life" in which she threw new light on various Hindu systems. She wrote many other books

---

* In the fervour of her zeal, Nivedita took up a clod of earth end exclaimed, this the home of Sujata, was sacred soil.

in the same spirit". (স্যার যদুনাথ সরকার, "প্রবুদ্ধ ভারত", জানুয়ারী, ১৯৪৩, ইংরেজী হইতে উদ্ধৃত ও অনূদিত)।

ভগিনী নিবেদিতা নালন্দা ও সারনাথেও গিয়াছিলেন।

রাজগৃহে নিবেদিতা (১৯০৪, অক্টোবর)

বোধগয়ায় নিবেদিতা এবং তাঁহার দলটি মাত্র এক সপ্তাহ ছিলেন। বোধগয়া হইতে রাজগৃহ মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূর। স্ত্রীলোক এবং শিশুরা একটি হাতীতে চড়িয়া রাত্রে চারিদিকে মশাল জ্বালাইয়া চলিলেন। আর পুরুষেরা চাঁদনী রাতে পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন। বোধগয়ার দলটিরই সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র বসু, লেডী অবলা বসু, স্যর যদুনাথ সরকার। একটা দুঃখ ছিল, নিবেদিতার বন্ধু মিঃ গোখলে অসিয়া যোগ দিতে পারেন নাই।*

নিবেদিতা এবং তাঁহার দলটি রাজগৃহে বেশ কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারত ইতিহাসের অতি প্রাচীন স্থানটি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। ইহার পাহাড়, ঝরণা, শস্যক্ষেত্র, ইহার আকাশ-বাতাস তাঁহাকে সেই সুদূর অতীতে লইয়া গিয়াছিল। রাজগৃহের সেই গৌরবময় অতীতকে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা পুরাণে পাই, বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণের যুগের কথা। পরে মহাভারতের যুগে মগধের রাজা জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভীম, অর্জুনকে লইয়া এই স্থানে আসিয়া ছিলেন। জরাসন্ধ যে স্থানে যে ভূমির উপর ব্যায়াম করিতেন, স্থানীয় লোকেরা এখনও সেই স্থানটি দেখাইয়া দেয়।

ভগিনী নিবেদিতা রাজগৃহ সম্পর্কে যে একটি মনোরম প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বুদ্ধদেব হইতেই এই স্থানের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। তখন বিম্বিসার এবং তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকাল। নিবেদিতার লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৫৯০ সালে এই স্থানটি ভারতের ইতিহাসে অতিশয় জমজমাট ছিল। সেই সময় বেবিলন, ফিনিশিয়া, মিশর এবং সেবার এই সব স্থানগুলিও ইতিহাসে

---

* Footfalls of Indian History, pp. 37

** From Buddha Gaya to Rajgir it was a distance of 50 (fifty) miles. The pilgrims walked on foot as in the time of Baddha and only marched in the night in clear moonlight. There came an elephant for the ladies and children. The men followed the bearer of torches. Every night two halts were made around a great fire far resting; then one of the pilgrims recited the words of the Buddha melodiously ... Amongst the friends of Nivedita Gokhale alone missed the call. — (Ibid. p. 259)

জীবন্ত ছিল। বুদ্ধদেব এই সময়ের কোন এক প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় এই পথ দিয়া আসিয়াছিলেন। একটি খোঁড়া ছাগ শিশুকে কাঁধে লইয়া তিনি রাজপ্রাসাদের দিকে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে এক হাজার ছাগ বলির জন্য রাজপ্রাসাদের দিকে যাইতেছিল। অনুকম্পায় তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

যে প্রবেশদ্বার দিয়া বুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিবেদিতা সেই দ্বারটি আবিষ্কার করিলেন। পরে অম্বপালির ('The Indian Mary Magdalene') আম্রকাননটিও আবিষ্কার করিলেন। নিবেদিতা এই ধ্বংসস্তূপের (an austere desolate ruin) মধ্যে ঘুরিযা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ইহার মধ্য হইতেই রাজা বিম্বিসারের প্রাসাদ এবং তাঁহার প্রজাদের বাড়ী কোথায় কি ধরনের ছিল, ভাবিতে লাগিলেন।

এখানে গৃধ্রকুট পর্বতে বুদ্ধদেব বর্ষাকালে আসিয়া বাস করিতেন।

দুইটি রাজগৃহের কথা নিবেদিতার মনে উদয় হইল। একটি বুদ্ধদেবের সময়ের আর একটি তাহার পরবর্ত্তীকালের। যেমন, রাজপুতানায় প্রথম অম্বর,পরে জয়পুর রাজধানী হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এইখানে একাধিকবার আসিয়া বাস করিয়াছেন। এখনও যেন এই গুহাগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

নিবেদিতার মনে প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধদেব এই পথে এখানে আসিয়াছিলেন কেন? রাজধানীর সন্নিকটে পন্ডিত ব্যক্তিরা বাস করিতেন। নালন্দায় বুদ্ধদেবের সময়েও হয়তো পন্ডিতেরা বাস করিতেন। হয়ত তাঁহাদের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে আসিয়া থাকিবেন। এখানে আসিবার পূর্বেই তাঁহার মনে ভবিষ্যৎ নির্বাণের ধারণা জন্মিয়াছিল। কেবল কিছুদিন তপস্যার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি এখান হইতে সোজা বিল্ববৃক্ষের নির্জন অরণ্য বোধগয়ায় গিয়া তপস্যায় বসিয়াছিলেন।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে তিনি রাজগৃহে বৌদ্ধযুগের মধ্য দিয়া মহাভারতের যুগে গিয়া পৌছাইয়াছিলেন।*

"দি ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ" (ভারতীয় জীবনজাল—১৯০৪)

১৯০১ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা লন্ডনে ছিলেন। তখন তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়া এই গ্রন্থের গোড়াপত্তন করেন। পরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ

---

* "I felt this when I was at Rajgir, and saw so plainly, shining through the Buddhist period, the outline and colour of an earlier India still, — the India of the Mahabharata."
Hints on National Education in India, p. 102.

হইতে বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইন্ডিয়া'তে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্যার যদুনাথ এবং আরও বহু মনীষী এই গ্রন্থখানিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত করিয়াছেন। অনেকের মতে এই গ্রন্থখানি ভগিনী নিবেদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আবার কেহ কেহ বলেন The Master as I saw Him সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"The mental sense, by the help of which we feel the spirit of a people, is like the sense of sight, or of touch — it is a natural gift. It finds its objects not by analysis, but by direct apprehension ... Sister Nivedita has uttered the vital truths about Indian Life."

নিবেদিতার ভারত প্রীতির সহিত হিন্দু প্রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; অরবিন্দেরও ঠিক তাই। অরবিন্দ 'কর্মযোগীন'-এ লিখিয়াছেন, "I am a Hindu, I am a Nationalist". নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধ্যে এক্ষেত্রে একই চিন্তাধারা প্রবাহিত।

হিন্দু ও ভারত প্রীতি এক হওয়ার দরুণ এই গ্রন্থে নিবেদিতা হিন্দু-সমাজের রীতি, নীতি, আচার, পূজা, পার্বণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে মনোরম ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে আত্মতুষ্টি আনে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হিন্দুরক্ষণশীলতার দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। গত শতাব্দীর খৃষ্টান মিশনারী ও যুক্তিবাদী ব্রাহ্মসংস্কারকগণ এবং তৎপূর্বে ডিরোজিও সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুসমাজের পূজা-পার্বণ ও আচার ব্যবহারকে যেরূপ কালাপাহাড়ী সমালোচনা করিয়াছিলেন, প্রতিক্রিয়ামুখে নিবেদিতা তাহার উল্টা করিয়াছেন। আমাদের মেয়েদের সম্পর্কে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves." রমেশচন্দ্র দত্তও ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সতীদাহ সম্পর্কে যে তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সতীরা আগুনকে উপহাস করিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন, দুই-এক ক্ষেত্রে ইহা সত্য হইলেও সমাজের এই প্রথা কি চলিতে দেওয়া উচিত? রাজা রামমোহন, যাঁহার নিকট স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ঋণ বহু স্থানে বহুবার গর্বের সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই রাজা রামমোহন এ-যুগের যুগপ্রবর্তক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সতীদাহ সম্পর্কে ইংরেজী ও বাংলাতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং দেশবাসীর

পর্বত প্রমাণ বাধাকে সিংহবিক্রমে চূর্ণ করিয়া সতীদাহ প্রথা আইনের বলে দূব করিয়া দিয়াছেন আমরা কি তাহা ভগিনী নিবেদিতার কথায় উপেক্ষা করিতে পারি?

ভগিনী নিবেদিতা হিন্দু বিধবাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন। কোন এক হিন্দু বিধবা নাকি নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা জন্মি একবার, মরি একবার এবং বিবাহ করি একবার।" নিবেদিতা এই কথা শুনিয়া অতিশয় গর্ববোধ করিয়াছিলেন। করিবার কথাই। কিন্তু সমাজে বিধবাদের যে অবস্থা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেদনায় ভরপুর হইয়া নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে তাঁহার পক্ষে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করা কি সময়োপযোগী সংস্কার হয় নাই? সময়ের পরিবর্ত্তনের গতিমুখে যা কিছু প্রাচীন, তাহাই আঁকড়াইয়া থাকা ত জীবন্তসমাজের লক্ষণ নয়। একথা আমাদের অপেক্ষা ভগিনী নিবেদিতা অনেক বেশী জানিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কাহারও অপেক্ষা কম হিন্দু ছিলেন না, বা তাঁহার মধ্যে জাতীয়তাবোধ কাহারও অপেক্ষাই কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বিধাতা যখন সাত কোটি বাঙ্গালী তৈরী করিয়াছিলেন, তখন ভুলিয়া একজন মানুষ তৈয়ার করিয়াছিলেন।" ঈশ্বরচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখিয়াছিলেন।

নিবেদিতা আমাদের মেয়েদিগকে সীতা, সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। আমাদের মেয়েরা যদি তাহা করেন, তবে কেহই আপত্তি করিবে না। আর যদি না করেন, তবে এ-যুগে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখা শক্ত। আদর্শবাদী নিবেদিতা অপেক্ষা বাস্তববাদী রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র সমাজের অধিকতর গুরুতর প্রয়োজন সাধন করিয়া গিয়াছেন নিশ্চয়।

এই বছর (১৯০৪, ডিসেম্বর) বোম্বাই শহরে কংগ্রেস হয়। সভাপতি স্যর হেনরি কটন্। কটন সাহেব ঝুনো সিভিলিয়ান। সেক্রেটারী হিসাবে তাঁহার হাত দিয়াই সাত সাতটি লেফটেনন্ট গভর্ণর পার হইয়াছে। আসামে তিনি চীফ কমিশনার ছিলেন। সুতরাং শাসনকার্য্যে তিনি বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। লর্ড কার্জন ১৯০৩, ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন। শাসনকার্য্যের সুপরিচালনার জন্যই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই যুক্তির অসারতা খন্ডন করিবার জন্য কটন সাহেবের মত শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কে হইতে পারে! সভাপতির আসন হইতে কটন সাহেব বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। সমগ্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া বাঙ্গালীরা কমপক্ষে দু'হাজার সভায় বঙ্গভঙ্গের তুমুল প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কটন সাহেবের বক্তৃতায় বাঙ্গালীরা

সন্তুষ্ট হইল। তিনি বাঙ্গালীদের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালীরা পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত লোকমত সৃষ্টি করেন ও পরিচালিত করেন।*

কটন সাহেব রাজা রামমোহনের নাম পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা নিশ্চয়ই ঔৎসুক্যের সহিত মনোনিবেশ সহকারে এই বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন।

স্বদেশী যুগ

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দু'হাজার সভা করিয়া বাঙ্গালী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ১০৫৯-এর প্রথমার্দ্ধেও এইরূপ প্রতিবাদ চলিয়াছে। গভর্ণমেন্ট ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া বিস্তৃত ভাবে সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালী জাতি চমকিয়া উঠিল। ইহার মাত্র ষোল দিন পর, — ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট, — টাউন হলে বিলাতি দ্রব্য বর্জন করিবার জন্য 'বয়কট' সভা হইল। লক্ষাধিক লোকের সমাগমে একটি সভা ভাঙ্গিয়া তিনটি সভায় বিভক্ত হইল। ইতিহাসে লিখিবার মত ইহা একটি স্মরণীয় সভা। স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৫, ৭ই আগষ্টের পূর্ব পর্য্যন্ত ধূমায়িত অবস্থায় ছিল। এই ৭ই আগষ্ট ইহা প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল। এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থার পটভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে দেখিতে পাইব।

এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলিলেন যে, নিবেদিতাকে তিনি স্বপ্নে গেরুয়া-পরা আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই উভয় প্রস্তাবই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিবেদিতা বলিলেন যে, তাঁহার নূতন করিয়া গেরুয়া পরা হইবে না। কারণ স্বামিজীর নিকটে তিনি সন্ন্যাস পাইয়াছেন। তাহাই মানিয়া চলা তাঁহার কাছে উচ্চ ব্রত। স্বামিজী তাঁহাকে "শিব, শিব, শিব" বলিয়া অক্লান্ত মন্ত্রোচারণ করিতে শিখাইয়াছেন। তিনি সেই রূপেই চলিবেন। উভয়ে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহাদের ভিতরে ঐ বিষয়ে আর আলোচনা হয় নাই। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৮৬-২৮৮)।

এই ঘটনাটি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে হইবে। এক নিবেদিতা ভিন্ন অপর কেহ শ্রীশ্রীমার কথায় অসম্মত হইতে পারিত না। নিবেদিতার গুরুভক্তি

---

* "Babus from Bengal, strenuous and able, who rule and control public opinion from Peshwar to Chittagong."

ও চরিত্রের দৃঢ়তা দুইই এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে প্রকাশ পাইল। তবে উভয়ে যে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, তাহা অনুমান হয় স্বামিজীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় উভয়েই ভাবাবেগে কিছুটা বিচলিত হইয়াছিলেন। নিবেদিতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনমনীয়। স্বামী ব্রাহ্মানন্দ যখন তাঁহাকে রাজনীতি ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি। এবং শ্রীশ্রীমা যখন তাঁহাকে গেরুয়া পরিয়া পুনরায় দীক্ষা নিতে বলিলেন, তখনও তাঁহাকে দেখিলাম। এই দেখার মধ্যেই নিবেদিতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু (জন্ম ১৮১৭—মৃত্যু ১৯০৫)

নিবেদিতা প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন, নিবেদিতার পক্ষে বিস্মরণ হইবার কথা নয়। বিশেষতঃ গত দুই বৎসর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সহিত নিবেদিতা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ কাছারীতে গিয়া বাংলার পল্লীসমাজের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। প্রাচ্য রীতি অনুসারে চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের সহিত নিবেদিতার পরিচয় অতিশয় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু নিবেদিতার মনকে স্পর্শ করিবে না, ইহা সম্ভব নয়। দেবেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিয়াছেন, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বলিতে গেলে এক রকম মহর্ষির শিষ্য ছিলেন, আর ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র ত শিষ্য ছিলেনই। রাজ রামমোহনের পর মহর্ষির মৃত্যুতে বড় একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। বাংলার ঊনবিংশ সহিত বিংশ শতাব্দীর যে একটি যোগসূত্র ছিল, দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে এই দুই শতাব্দীর মধ্যে একটি গভীর বিচ্ছেদের রেখাপাত করিয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী রাজনীতি নাই; নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নাই; গুপ্ত সমিতি, গুপ্তহত্যা ও বৈপ্লবিক ডাকাতি এসব কিছুই নাই; 'তাং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী' নাই; বন্দেমাতরম্ গান নাই, শিবাজী-উৎসব বা ভবানী পূজা নাই। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ভরপুর রহিয়াছে। তিনি রামমোহন উপাসিত নির্গুণ ব্রহ্ম বিরোধী; উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্যক্তি। তিনি শঙ্করানুগামী রামমোহনের নির্গুণ ব্রহ্ম ও মায়াবাদের বিরোধী, পরন্তু সগুণ ব্রহ্ম ও পরিণামবাদের পক্ষপাতী। তিনি অবতারবাদ বা নর পূজার একান্ত বিরোধী। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র যখন মুঙ্গেরে অবতার হইলেন; ব্রাহ্মিকারা যখন কেশব চন্দ্রের পা ধুইয়া চুল খুলিয়া পা মুছিয়া দিতে

লাগিলেন, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিলেন— "ওগো রাজনারায়ণ বাবু, যে দেশে মৎস্যও অবতার, কচ্ছপও অবতার, সে দেশে কেশবের এত অবতার হইবার সাধ হইল কেন?" বিংশ শতাব্দীর নর পূজা ও অবতারবাদীরা দেবেন্দ্রনাথের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, কোন আমলই দিতেছেন না। ইতিহাস স্মরণীয় মহর্ষির এই মহিমান্বিত দীর্ঘ জীবন কলিকাতার নিমতলা শ্মশান ঘাটে ১৯শে জানুয়ারী তাঁহার শেষ চিতা শয্যা রচনা করিল। নিবেদিতা এ দৃশ্য চাহিয়া দেখিলেন।

লর্ড কার্জনের কন্‌ভোকেসন বক্তৃতা

লর্ড কার্জন (১৮৯৮, ৩০শে ডিসেম্বর—১৯০৫, ৭ই নভেম্বর) খুব জবরদস্ত বড়লাট ছিলেন। তিনি আমাদের দেশে সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ কন্‌ভোকেসন বক্তৃতায় তিনি প্রাচ্য দেশবাসীদের উক্তিকে স্বভাবতঃই এবং সর্বদাই অতিরঞ্জিত এবং অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট বলিলেন। ইহা প্রাচ্য দেশবাসীদিগকে মিথ্যাবাদী বলার কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসীদের সহিত তুলনা করিয়াই লর্ড কার্জন এইরূপ কথা বলিলেন।*

ভগিনী নিবেদিতা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রাচ্য প্রীতিতে ভরপুর। এশিয়ার সভ্যতা বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ ওকাকুরার "আইডিয়ালস্ অফ্ দি ইষ্ট" (১৯০৩) গ্রন্থের ভূমিকায় নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে সমগ্র এশিয়া খন্ডের প্রত্যেক প্রদেশে একই জীবন স্পন্দিত হইতেছে। প্রাচীন মানবসভ্যতার প্রসূতি এশিয়া চির দিন এক এবং অখন্ড।

নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন যে (এবং সেইটি বড় কথা) ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার উদ্ভব কেন্দ্র, অর্থাৎ ভাবতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই এই সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক তেমনই উন্নত।

ভগিনী নিবেদিতার এই সিদ্ধান্ত স্বদেশী যুগের রাজনীতি ক্ষেত্রে, এমন কি চিত্রশিল্পে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছিল।

লর্ড কার্জনের দাম্ভিকতাপূর্ণ বক্তৃতা নিবেদিতার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল তা সহজেই অনুমেয়। লর্ড কার্জনের বক্তৃতা নিবেদিতার নিকট অসহ্য

* "If I were asked to sum in a single word the most notable characteristic of the East — physical, intellectual and moral — as compared with the West, the word exaggeration or extravagance is the one that I should employ. It is particularly patent on the surface of the Native Press."

বোধ হইল। তিনি সভা ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্যর গুরুদাস ব্যানার্জীকে জোর করিয়া ধরিয়া 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে গেলেন। সেখানে লর্ড কার্জন লিখিত "The Problems of the East" গ্রন্থ বাহির করিয়া দেখাইলেন যে লর্ড কার্জন নিজেই মিথ্যাবাদী। পরের দিন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ইহা তিনি অমৃত বাজার পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়া দেশের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিলেন যে লর্ড কার্জন নিজেই কত বড় মিথ্যাবাদী। কর্তব্যকর্মে এই ক্ষিপ্রকারিতা ও নির্ভীক দুঃসাহসিকতা নিবেদিতা চরিত্রেই সম্ভব। ইহা বঙ্গভঙ্গ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ছয়মাস পূর্বের ঘটনা।

ব্যাপারটা এইখানে থামিল না। রবীন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের নাকের উপর দেখাইয়া দিলেন যে, বুয়র যুদ্ধে (১৮৯৫-১৯০২) ইংরেজ জাতি — বুয়রদের বিরুদ্ধে কিরূপ বে-পরোয়া ভাবে সকল প্রকার মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়াছে।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জীও তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ১৭৫) লর্ড কার্জন নিজে যে মিথ্যাবাদী তাহা প্রমাণ করিয়া এক চোট নিয়া তবে ছাড়িলেন।

এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় ঘটনা টাউন হলের প্রতিবাদ সভা। এই সভায় ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি। তিনি বলিলেন প্রাচ্য দেশবাসীর ভাষণে যদি কিছু জমকাল ভাব থাকে, তবে লর্ড কার্জনের বক্তৃতাতে ত গ্রীক দেশীয় কমনীয়তা (Attic grace) কিছু দেখিতেছি না। লর্ড কার্জন পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা হাতে পাইয়া Chancellor এর গাউন পরিধান করিয়া অতিশয় নির্লজ্জ দাম্ভিকতার সহিত Convocation সভায় প্রাচ্য দেশের সত্যের আদর্শকে মিথ্যা আক্রমণ করিয়াছেন। যে প্রাচ্য দেশ শুধু বুদ্ধদেব ও মহম্মদকেই জন্ম দেয় নাই; পরন্তু যীশু খৃষ্টকেও জন্ম দিয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে পররাজ্যলোলুপতা শিক্ষা দেন নাই, পরন্তু কি করিয়া মানুষের মত বাঁচিতে হয় এবং মানুষের মত মরিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।

লর্ড কার্জন কাজটা ভাল করেন নাই। ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে তৎকালে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। এবং ভগিনী নিবেদিতাই এই আন্দোলনের প্রবর্তক। এবং এইখানেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। (ফরাসী জীবন চরিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ না থাকা অশোভনীয় হইয়াছে।)

ডন সোসাইটি (Dawn Society — 1902-1906)

ডন সোসাইটি ভগিনী নিবেদিতার একটি কর্মক্ষেত্র ছিল। অনেকের মতে ইহা তাঁহার একটি বাহন ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এপারে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শিব নারায়ণ দাসের গলির ভিতরে একটি ছাত্রাবাস ছিল। সেই মেসের দোতলায়

ছিল ডন সোসাইটি, আর একতলায় ছিল ফীল্ড্ এন্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব। এই দুইটি ছিল যেন গ্রীন রুম। আর সম্মুখে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ছিল — ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্বদেশী যুগের "পান্তীর মাঠ"।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন পত্রিকা প্রকাশের পাঁচ বৎসর পর ১৯০২ সালে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে দুই দিন বক্তারা বক্তৃতা করিতেন, আর ছাত্রেরা সেই বক্তৃতা শুনিত এবং খাতায় নোট লিখিয়া নিত। সতীশ মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী ছিলেন, এবং শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। সেই সূত্রে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সতীশ বাবুর গুরুভাই ছিলেন। কেন না তাঁহারাও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভগিনী নিবেদিতা এই সোসাইটিতে যোগদান করেন। পরে ১৯০৪-১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই সোসাইটিতে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। অনেক যুবকেরা নিবেদিতার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

কলিকাতায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ১ম, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ভগিনী নিবেদিতাই ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ২য়, সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি— বরোদা হইতে অরবিন্দ আসিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। লোয়ার সার্কুলার রোডে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩য়, ডন সোসাইটি — সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের বৎসরের শেষার্দ্ধে এই তিনটি সমিতির সহিতই ভগিনী নিবেদিতা জড়িত হইয়া পড়েন। এই তিনটি সমিতিতেই ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় যোগদান করেন।

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে নিবেদিতা আর একটি নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকান্দ যেমন তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নামে একটি মঠ তৈরী করিয়া গিয়াছেন, তেমনই নিবেদিতাও তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের নামে এর একটি নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই নূতন মঠে ছাত্রেরা বৎসরে ছয়মাস পড়াশুনা ও ধ্যানধারণা করিবে, এবং বাকী ছয়মাস ভারতের বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিবে। এই রূপে সাত বৎসর ছাত্রদের শিক্ষানবীশী করিতে হইবে, অবশ্য ব্রহ্মচর্য্যও পালন করিতে হইবে। যে শক্তি বিবেকানন্দকে সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই শক্তি তাঁহাকেও (নিবেদিতাকেও) বল দিবে, ও সকল রকম প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট নিবেদিতা তাঁহার এই পরিকল্পনাটি বর্ণনা করিয়া

অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ মত দিলেন না। কাজেই নিবেদিতার এই কল্পনাটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। কিন্তু নিবেদিতা দেখিলেন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনেকটা এই ধরনের কল্পনা লইয়াই ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন। এই সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক শিক্ষাদানের সম্ভাবনা ও ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাজেই নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে যোগদান করিলেন।*

নিবেদিতা শুধু ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা করিতেন না, ডন পত্রিকাতেও লিখিতেন। মৃত্যুর বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ডন পত্রিকায় (১৯১১) লিখিয়া গিয়াছেন। ডন পত্রিকা ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতেও বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ডন পত্রিকার তিনটি স্তর। ১ম, ১৮৯৭—১৯০২, এই স্তরে বেশীর ভাগ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে লেখা হইত। ২য়, ১৯০২—১৯০৬, এই স্তরে ডন পত্রিকা ডন সোসাইটির মুখপত্র হইয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা, অর্থনীতি ও সমাজতত্ব সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লেখা হইত। ৩য়, ১৯০৬—১৯১৩, এই স্তরে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে-প্রবন্ধ লেখা হইত। ইহা ছাড়া স্বদেশী যুগে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল ঃ

(ক) Principles of the Swadeshi Movement (Nov. 1905)

(খ) The true character of the Boycott in Bengal.

(গ) The true character of the Swadeshi in Bengal.

(ঘ) Prospect of the Swadeshi.

ডন পত্রিকা স্বদেশী যুগের দর্পণ স্বরূপ, অসহযোগের যুগে জ্ঞান গরিমায় বাঙ্গালী এতটা উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে নাই।

নিবেদিতা যদিও অনেক আশা লইয়া বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা ডন সোসাইটির মত উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, বিবেকানন্দ সোসাইটিতে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের মত লোক ছিল না। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা ঠাকুর ঘরে পূজা আর্চ্চা, ধ্যানধারণা, ভোগ

* "The power that created Swamiji will furnish me the necessaries" said Nivedita to Swami Brahmananda when she laid bare her plans to him *** This project of Nivedita could not be realised, but at every point it served as the basis of the work which Satish Chandra Mukherjee laid down soon. *** Mukherjee took it in hand, gave it a shape, a form, an aim — the possibility of offering to all its members a complete political education." (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৪৪)

আরতি লইয়া ব্যস্ত, বিবেকানন্দ সোসাহটিতে আসিয়া বক্তৃতা করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না।

সন্ন্যাসী সারদানন্দ সোসাইটিতে বহু বক্তৃতা দিয়াছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ সোসাইটিতে বহুদিন বাস করিয়াছেন।

ডন সোসাটিতে নিবেদিতা প্রধানতঃ জাতীয়তা ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁর বক্তৃতার মূল ভিত্তি ছিল। রুশ বিপ্লবের মহান নেতা প্রিন্স ক্রপাটকিনের শিক্ষাপ্রাপ্তা নিবেদিতা ঐ সকল বক্তৃতায় আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানসম্মত অনেক নূতন কথাই বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরলোকগত অধ্যাপক বিনয় সরকার বলিয়াছেন ঃ

"তাঁর (নিবেদিতার) বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'জাতীয়তা' *** নিবেদিতা রমেশ দত্তের গুণগ্রাহী। *** ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার ডাক জাতীয় শিক্ষার আদর্শমাফিক লেখাপড়া লাইনে খুব বেশী পড়ত। আমাদের বিচারে তিনি ছিলেন সতীশ মণ্ডলের অন্তর্গত। ** পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমান্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার ছিল ভরপুর। *** ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি মুড়কি খাওয়ার মতন সোজা কাজ ছিল। *** কোনো স্বদেশী পন্ডিত ভারতীয় নরনারীর জীবন-কথা এত গভীরভাবে বুঝতে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব। *** আমার বিশ্বাস তাঁর প্রভাবের প্রধান কারণ স্বদেশিকতা ও বিপ্লব-নিষ্ঠা। দ্বিতীয় কারণ তাঁর গবেষণা-শক্তি, সংস্কৃতি-বিশ্লেষণের কায়দা, জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর ইংরেজী রচনা কৌশল। এই দুই কারণে বহু সংখ্যক যুবা নিবেদিতার কাছে প্রেরণা পেয়েছে। *** জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর অতি আত্মীয় ছিলেন। যদুনাথ সরকার আর ব্রজেন শীলও নিবেদিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। *** ভারতীয় সংস্কৃতির এক নয়া মূর্তি, শুক্র নীতির তর্জমার যুগে (১৯১১-১৩) আমার নজরে জোরের সহিত দেখা দিতে সুরু করেছিল। সে হচ্ছে সমর-নিষ্ঠ, অর্থ-নিষ্ঠ, রাষ্ট্র-নিষ্ঠ, হিংসা-নিষ্ঠ, শক্তি-নিষ্ঠ ভারত। তার পাশে নিবেদিতা প্রচারিত ভারত-মূর্তি অতি কাল্পনিক, অতি অলীক, অতি ভাবনিষ্ঠ, অতি আদর্শনিষ্ঠ মনে হচ্ছিল। *** ব্যাখ্যাগুলা অনেকটা তথ্যহীন ও বস্তুহীন।" (বিনয় সরকারের বৈঠক, পৃঃ ২৮৮, ২৯০, ২০১, ২৯২)।

বিনয় সরকার ভগিনী নিবেদিতাকে আদর্শবাদী বলিলেন। তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথও নিবেদিতাকে idealist বলিয়াছেন। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষও নিবেদিতাকে idealist বলিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয় সরকার নিবেদিতার এই আদর্শবাদকে

বাস্তববাদের পক্ষ হইতে যেরূপ কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহা কি রবীন্দ্রনাথ, কি রাসবিহারী ঘোষ করেন নাই। শুক্র নীতিতে যে বস্তুতন্ত্রতা আছে, যার ফলে সমর-নিষ্ঠ, অর্থ-নিষ্ঠ, রাষ্ট্র-নিষ্ঠ, হিংসা-নিষ্ঠ, শক্তি-নিষ্ঠ ভারতের দর্শন মিলে তাহা নিবেদিতার আদর্শের মধ্যে ভরপুর ছিল। এবং বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতার মধ্যে তা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ছিল না বলিলে নিবেদিতা-চরিত্রকে ভুল বুঝা হইবে। আশঙ্কা হয়, এক্ষেত্রে অধ্যাপক সরকার নিবেদিতার আদর্শ নিষ্ঠাকে ভুল বুঝিয়াছেন।

নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ডন সোসাইটিতে "ব্যক্তি ও সমাজ" সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছেন। আমরা অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বড়জোর পরিবারকেন্দ্রিক। তার বাহিরে আমাদের দৃষ্টি যায় না। কিন্তু নিবেদিতা বলিলেন সমাজ না বাঁচিলে ব্যক্তি বাঁচে না। সমাজ না উন্নত হইলে ব্যক্তি উন্নত হইতে পারে না। আমাদের এই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসের দেশে, এই মায়াবাদীর দেশে সমাজচেতনা বোধ জাগ্রত করিবার একটি মহান দায়িত্ব নিবেদিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন সাধন করা যে একটি কত বড় কাজ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ডন সোসাইটিতে তৎকালে দেশের সকল বিখ্যাত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা বক্তৃতা করিয়াছেন। কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব।

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দিন সভাপতি হন জজ গুরুদাস ব্যানার্জী। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রিন্সিপাল নগন্দ্রেনাথ ঘোষ, পন্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, যদুনাথ সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন—ইঁহারা সকলেই ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা সুপরিচিত ছিলেন।

ডন সোসাইটি যেন একটি শতদল পদ্ম, আর ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যাদায়িনী রূপে ঐ পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। পাপড়িগুলি তাঁহার দুই চরণ বেড়িয়া পড়িয়া আছে। এই কল্পনাকে রূপ দিয়া যদি কোন চিত্রকর ছবি অঙ্কিত করেন, তবে সেই ছবি মিথ্যা হইবে না।

ডন সোসাইটির একটি বক্তৃতায় গীতা সম্পর্কে বলিতে গিয়া নিবেদিতা বলিলেন, "একহাতে গীতা ও অপর হাতে তলোয়ার লইয়া কবে আমাদের মধ্যে দেশ উদ্ধারের জন্য সেই যোদ্ধা আসিবেন? — When will arise then the veritable fighter in the good cause again, with the Geeta in the one hand and the sword in the other?"—(ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৪৫)

অরবিন্দ বরোদা হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে আসিয়া হেমচন্দ্র কাননগুকে একহাতে গীতা আর একহাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্ত সমিতির মন্ত্রে এই বলিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন যে "ভারতের স্বাধীনতার জন্য সব কিছু করব।" গীতার সঙ্গে তলোয়ার থাকিতে হইবে। শুধু গীতা নয়। নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল রহিয়া গিয়াছে। গীতা আর তলোয়ার সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই পরামর্শ হইয়াছিল। নতুবা উভয়ের এতটা মিল কি করিয়া সম্ভব হইল? নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে দাঁড়াইয়া অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। নিবেদিতা আদ্যপান্ত বিপ্লবপন্থী। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিপ্লব-নিষ্ঠা অব্যাহত ছিল।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের গার্হস্থাশ্রমে নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রেভারেন্ড কালীচরণ ব্যানার্জীর ভ্রাতুস্পুত্র, এবং স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর বক্তৃতা শুনিয়া ছাত্রাবস্থায় তিনি ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডী হইবার সঙ্কল্প করেন। উপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬১, ১১ই ফেব্রুয়ারী, মৃত্যু ১৯০৭, ২৭শে অক্টোবর।

প্রথমে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানে যোগ দিয়া ব্রাহ্ম হন (১৮৮৭)। তারপর রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হইয়া সন্ন্যাসী হন (১৮৯৪)। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেন (১৯০১)। সারস্বত আয়তন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (১৯০২-১৯০৩)। "সন্ধ্যা" প্রতিষ্ঠা করেন (১৯০৪-১৯০৭)। ইহার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৯০৫)-ও আছে। তিনি (১৯০২-১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) Oxford ও Cambridge-এ হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি জয়ব্রত উদ্‌যাপন করেন। দেশে ফিরিয়া হিন্দু সমাজের আনুগত্য স্বীকার করেন। গোবর ও গঙ্গাজল খাইয়া মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে উপবীত ধারণ করেন। অথচ প্রভু যীশু খৃষ্টকে তাঁহার ত্রাণকর্তা বলিয়া কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার শব নিমতলা শ্মশান ঘাটে দাহ করা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দু সমাজ আনুগত্য তাঁহার স্বাদেশিকতার নামান্তর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এরূপ তেজঃপুর্ণ অদ্ভুত জীবন বাংলা দেশে দুইটি দেখা যায় নাই।

উপাধ্যায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত ডন সোসাইটিতেও বক্তৃতা করিয়াছেন। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার বলিয়াছেন,— "এঁকে (ব্রহ্মবান্ধবকে) আমি ডন সোসাইটিতে দেখি ১৯০৪ সনে। ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (১৯০২—১৯০৩)। ** তিনি বিলাতি বক্তৃতার কিঞ্চিৎ চুম্বকও দিলেন। *** বক্তৃতার বৃত্তান্ত বোধ হয় ডন ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। *** ঐ প্রথম দেখলাম। গেরুয়াপরা লোক, পায়ে ছিল না জুতো। কাছাখোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নেই;— গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি একটা নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম। *** তাঁর চোখের আর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে, লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মানুষের মতন মানুষ। ** একটা দিগ্‌বিজয়ী বাঙ্গালীর বাচ্চাকে স্বচক্ষে দেখা গেল।" (বিনয় সরকারের বৈঠক, পৃঃ ২৮১-২৮৪)

স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থার (১৯০৫, ৭ই আগষ্ট) প্রায় এক বৎসর পূর্বে উপাধ্যায় "সন্ধ্যা" কাগজ বাহির করেন। এই কাগজের দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরের ভাষা গুরুগম্ভীর, হিন্দুত্ব ও বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রশংসা থাকিত। "ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না।" (স্বামী বিবেকানন্দ এই ধরনের একটা হিন্দুয়ানীর প্রশ্রয় দেন নাই।) দ্বিতীয় স্তরের ভাষা বিলকুল বদলাইয়া গেল।

"আপামর সাধারণের হৃদয়-গ্রাহী গ্রাম্য ভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও হেঁয়ালী প্রভৃতি দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিলেন, যাহা জনসাধারণের অতীব আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। দোকানের দোকানী, পশারী, জমিদারের সরকার গোমস্তা, পাঠশালার গুরুশিষ্য, রাস্তার মুটে গাড়োয়ান — সকলেই হাসিত, কাঁদিত। কখনও বা ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিত। কখন 'সন্ধ্যা' আসিবে, আজ 'সন্ধ্যা'-য় কি লিখিয়াছে এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।" —(উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, প্রবোধচন্দ্র সিংহ, পৃঃ ৮৪-৮৫)।

স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' যাহা করিল, সমাজের নিম্নস্তরে যে আগুন জালাইয়া দিল তাহা সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি বা ডন ম্যাগাজিন পারে নাই। বিবেকানন্দের জলন্ত চিতা হইতে যে দুইটি অগ্নিশিখা বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তার একটি ভগিনী নিবেদিতা, আর একটি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। এই দুইটি যমজ অগ্নিশিখাকে কখনও পৃথক করিয়া কখনও বা একত্র করিয়া দেখিলে বাংলার স্বদেশী যুগকে পুরাপুরি দেখা যাইবে।

স্বদেশী যুগের ধূমায়িত অবস্থা

১৯০৪/১৯০৫ জুলাই (এক বৎসর, সাত মাস) স্বদেশী যুগের প্রাথমিক ধূমায়িত অবস্থা বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়। এই ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করিয়া ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট ইহা প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছে। যেমন চালচিত্রির উপরে

দুর্গা প্রতিমা, তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকার উপর ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। বাঙ্গালীর এই স্বদেশী যুগের সহিত ভগিনী নিবেদিতার জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিবেদিতার জীবন ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশী যুগের ইতিহাস লেখা যায় না।

বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন (বরিশাল কন্‌ফারেন্স, এপ্রিল ১৯২১) যে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব একরকম বলিতে গেলে এই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। "Upadhyaya Brahma Bandhav was, in some sense, the founder of that (Swadeshi) Movement."। কেহ বলেন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন্ সোসাইটির মধ্য দিয়া স্বদেশী আন্দোলন সুরু করেন। অরবিন্দ বলিয়াছেন, রমেশ দত্তের ভারতীয় অর্থনীতির বইগুলি প্রকাশিত না হইলে স্বদেশী আন্দোলনে এতটা জোর বাঁধিত না। স্বদেশীর, যাত্রাপথে বহু বিচিত্র প্রতিভার মিলন ঘটিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ।

১৯০৪ সনে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' ও তদনুরূপ অনেকগুলি প্রবন্ধে একটি নূতন কথা খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন, যাহা অপর কেহ বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ইংরেজ গভর্ণমেন্ট আছে থাক, আমরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত রকম কাজ নিজেরা হাতে লইয়া স্বাধীন হইব। সমাজ স্বাধীন হইলে রাষ্ট্রের অধীনতা আমাদের গায়ে লাগিবে না। গ্রাম্য পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, অন্ন, বস্ত্র, জলদানের ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক এ সমস্তই আমরা পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া নিজেরা চালাইতে সুরু করি। আমাদের প্রাচীন মেলাগুলির মধ্য দিয়া দেশের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ করিয়া লই।" স্বদেশীর ধূমায়িত অবস্থায় ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা, এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে কিছুটা কাজও আরম্ভ হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী গভর্ণমেন্টের ভিতরেই আর একটি স্বদেশী স্বাধীন গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা। বিপিনবাবু ১৯২১-এ বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে বলিতেছেন— 'Our idea was to gradually build up what might be called a State within the State at present controlled by the foreign Bureaucracy in the country. Rabindranarth's "Swadeshi Samaj" was moved by this idea and tried to realise it.'

আমরা দেখিয়াছি, ১৯০৩ সালে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্ব পুরাদমে চলিতেছে; এবং ভগিনী নিবেদিতা তাহাতে ঘর্মাক্ত কলেবরে সক্রিয়

অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুই মহা বিপ্লবী স্বদেশী ভূমিষ্ঠ হইবার দুই বৎসর পূর্ব হইতেই বাংলা দেশে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গুপ্ত সমিতির প্রচারকদের শিক্ষা দিবার মহড়া পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। সুতরাং ইতিহাস-পথে আগে গুপ্ত সমিতির সন্ত্রাসবাদ (১৯০২/১৯০৩) পরে স্বদেশীর ধূমায়িত ও প্রজ্জ্বলিত অবস্থা (১৯০৪/১৯০৫)। ভগিনী নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতিতেও আছেন, এবং স্বদেশীর ধূমায়িত ও প্রজ্জ্বলিত অবস্থার মধ্যেও আছেন।

এখন কথা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজকে অরবিন্দ ও নিবেদিতা কিভাবে গ্রহণ করিলেন? এই দুই মহা বিপ্লবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের যোল আনা মতের মিল হয় নাই। বিদেশী গভর্ণমেন্ট আছে থাক, আমরা তাহার অধীনে স্বাধীন হই, ইহা গুপ্ত সমিতির প্রবর্তক সন্ত্রাসবাদীদের মতবাদ হইতে পারে না। বিদেশী গভর্ণমেন্ট আছে থাক, ইহা তাহাদের কাম্য নয়। অরবিন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইংরেজের শাসন একটা পরগাছার মত আমাদের সমাজের উপর শিকড় গাড়িয়া বসিয়া সমাজের রস, রক্ত সমস্তই শোষণ করিয়া নিতেছে। অতএব আমাদের সর্বপ্রথম কাজ, শিকড়শুদ্ধ এই বিদেশী শাসনকে উৎপাটন করিয়া ফেলা। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট আছে থাক, এ কোন কাজের কথা নয়। ১৯০৮, এপ্রিল মাসে কিশোরগঞ্জে একটি বক্তৃতায় অরবিন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন, বিদেশী শাসন থাকিতে জাতির কোন উন্নতি সম্ভব নয়।*

স্বদেশী সমাজে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী নহেন; সুতরাং অরবিন্দ ও নিবেদিতা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ হাত মিলাইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সমাজকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতা তা দেখেন নাই। দুইটি জিনিষের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম, — বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে প্রথম পাতায় লিখিতে হইবে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ। এখানে আছেন অরবিন্দ ও নিবেদিতা। দ্বিতীয়, — এই ইতিহাসের পরের পাতায় দেখিতে পাই স্বদেশীর জন্ম। এবং এই স্বদেশীর সূতিকাগারে দেখিতে পাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বহু মনীষীর একত্র সমাবেশ। বিপ্লবী এবং অ-বিপ্লবী একত্রে মিলিয়া স্বদেশীর ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতেছেন।

---

* "As soon as a foreign organism established itself in and dominates in the country, then that foreign body draws to itself all the sources of nourishment and the natural centres, deprived of their sustenance, fail and disappear.*** Foreign rule is inorganic and therefore tends to disintegrate the subject body-politic by destroying its proper organs and centres of life."

স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থা

আগষ্ট এবং তার পরবর্তী মাসগুলিতে অরবিন্দ, নিবেদিতা ও মিঃ গোখলে কে কোথায়? — অরবিন্দ বরোদায় যোগ-নিমগ্ন। নিবেদিতা কলিকাতায় টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। মিঃ গোখলে লন্ডনে বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার জন্য ভারত সচিবের নিকট আবেদন নিবেদনে ব্যস্ত।

অরবিন্দ ১৯০৫, ৩০শে আগষ্ট তাঁহার স্ত্রীকে লিখিলেন ঃ—

"প্রিয়তমা মৃণালিনী—হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই (ভগবান সাক্ষাৎ করিবার) পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে। সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। একমাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।"

সুতরাং সমস্ত আগষ্ট মাস অরবিন্দ বরোদায় যোগে নিমগ্ন। ১৯০২, অক্টোবরে ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" বইখানি উপহার দেন। উহা পাঠ করিয়াই অরবিন্দের মন যোগের দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। স্ত্রীর নিকট ঐ পত্রে আরও আছে যে, দেশের ত্রিশ কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে। কষ্টে, দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোনমতে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের হিত করিতে হয়। পরিশেষে আছে—

"অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?"

স্বদেশকে মা বলিয়া জানার মধ্যে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু গোল বাঁধিয়াছে এই "রাক্ষস" কথাটি লইয়া। আলিপুর বোমার মামলায় আদালতে এই চিঠিখানির বিশদ আলোচনা হয়। গভর্ণমেন্টের পক্ষে মিঃ নর্টন (Mr. Norton) বলেন, ইহা ইংরেজ গভর্ণমেন্টকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ সি, আর, দাস বলিলেন, ওটা কিছু নয়। অরবিন্দ বহু ভাষাবিদ্, মস্ত পণ্ডিত লোক। তার বলিবার ধরণ ঐ রকম। ইহাকে একটা উপমা, রূপক বা অলঙ্কার বলা চলে।

It is only an analogy. He has used only a metaphor. His basis of patriotism is that he regards his Country as Mother.

It is to him not a physical non-entity, but is a concrete manifestation of Divinity.

স্বদেশকে এই "Mother" ও "Divinity" রূপে ভাবা নিবেদিতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ইহা স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই নিবেদিতার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে আরও লিখিলেন :

"তুমি কি পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে? যেমন অন্ধ রাজমহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন"? আশ্চর্য্য এই যে, ভগিনী নিবেদিতাও মহাভারতের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে গান্ধারীকে সর্বশ্রেষ্ঠা নারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতার চিন্তাধারার মধ্যে সর্বত্রই এইরূপ মিল দেখা যায়। হয় তো পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের জন্য এইরূপ মিল হইয়া থাকিবে। নিবেদিতার মনের এতটা মিল এক অরবিন্দ ছাড়া অপর কোন ভারতীয় নেতার সহিত দেখা যায় না। স্ত্রীর নিকট পত্রের পরেই অরবিন্দ "ভবানীমন্দির" নামে ১৫।১৬ পাতার একটি বৈপ্লবিক চটি গ্রন্থ লিখিয়া বারীন্দ্র কুমারকে দিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতা পাঠাইলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাউলাট কমিটি "ভবানীমন্দির" সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের "আনন্দমঠের" অনুকরণে ইহা লেখা হইয়াছে। মা ভবানীর পূজারী একদল তরুণ সন্ন্যাসীর দল ভারতবর্ষকে বিদেশীর শাসন হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবে। বাংলা দেশের বৈপ্লবিক সমিতিগুলি এই ভবানীমন্দিরের আদর্শকে এবং ইহার নিয়মাবলীকে পরবর্তীকালে অবিকল গ্রহণ করিয়াছে। এবং সেই সঙ্গে রাশিয়ার হিংসামূলক বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছে।

সর্বশেষে বলা হইয়াছে, এই গ্রন্থে ধর্মের আদর্শকে বৈপ্লবিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। (The book is a remarkable instance of perversion of religious ideals to political purpose.)। আগামী বৎসর (১৯০৬) অরবিন্দ বরোদার চাকুরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিয়া গুপ্ত সমিতির দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ করিবেন। আমরা তাহার জন্য প্রস্তুতি দেখিতে পাইলাম। এবং গুপ্ত সমিতির এই দ্বিতীয় পর্বেও ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের সহিত মিলিত হইয়া সর্বাপেক্ষা বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতা টাউনহলে ৭ই আগষ্ট, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জন (Boycott) সঙ্কল্প করিয়া এক বিরাট সভা হইল। নরেন্দ্রনাথ সেন বয়কট্ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন। টাউনহলে এতবড় সভার স্থান হইল না। একটি সভা ভাঙিয়া নীচের তলায় এবং ময়দানে আরও তিনটি সভা হইল।

এই সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। তিনি তখন টাইফয়েড্ জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। অবশ্য ১লা আগষ্ট কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জীবনী পত্রিকায় বয়কট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এ আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থার প্রথম তোপধ্বনি করেন। নিবেদিতার বন্ধু এবং চেলা ষ্টেটস্ম্যান সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফ্ লিখিয়াছেন যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ভগিনী নিবেদিতা সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। কিন্তু নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতে আছে যে, ১৯০৫ সালে আগষ্ট মাসে নিবেদিতা হঠাৎ টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হন।

নিবেদিতার বাগ্‌বাজারের সঙ্কীর্ণ বাড়ী তাঁহার এই কঠিন রোগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না। কিন্তু যখন তাঁহাকে ইংরেজদের হাসপাতালে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইল, তিনি তাঁহাতে তৎক্ষণাৎ অস্বীকৃত হইলেন। তিনি একজন হিন্দুর মত চিকিৎসিতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অগত্যা আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ীর সন্নিকটে খোলা হাওয়া বাতাস লাগে এমন একটি বাড়ীতে তাঁহাকে আনা হইল। তিনি এমন কি সাহেব ডাক্তার দ্বারাও চিকিৎসা করাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কাজেই ডাঃ নীলরতন সরকার নিবেদিতার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। ক্রিশ্চিয়ানা (Miss Christine Greenstidel) শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। স্বামী সদানন্দকেও এখানে আবার দ্বাররক্ষীরূপে দেখিতে পাইয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। ব্যাধির আক্রমণ ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। দুইবার মনে হইয়াছিল যেন তিনি আর বাঁচিবেন না। কিন্তু অবশেষে তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন। জগদীশ বসু ও তাঁহার পত্নী নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া দার্জিলিং লইয়া গেলেন। নিবেদিতা জগদীশ বসুর “Response in the Living and Non-Living” গ্রন্থের একত্রিশ অধ্যায় পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া গেলেন। নিবেদিতা খুব ভাল ইংরেজী লিখিতে পারেন বলিয়া এই গ্রন্থখানির লেখায় নিবেদিতার লিপিচাতুর্য্য ছিল। দার্জিলিংয়ে বসিয়া নিবেদিতা এই গ্রন্থখানি লেখা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু নিবেদিতার বাগ্‌বাজারের স্কুলটি যে ইতিমধ্যে অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এ কথা তাঁহাকে বলা হয় নাই। কেন না, রুগ্ন শয্যায় এই দুঃসংবাদ তাঁহার মনকে গুরুতর আঘাত করিবার আশঙ্কা ছিল।

দেখা যাইতেছে যে, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের তখন এই স্কুলটি সম্বন্ধে কোনই দায়িত্ব ছিল না। নতুবা সামান্য অর্থাভাবে ইহা বন্ধ হইবে কেন? বেলুড় মঠ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াই নিবেদিতা এই স্কুলটি এখন চালাইতেছিলেন।

নিবেদিতা ২০শে সেপ্টেম্বর লন্ডনে মিঃ গোখ্‌লেকে চিঠি দিলেন, “এখানে এক গুজব রটিয়াছে যে আপনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মত দিয়াছেন। অবশ্য আমরা

ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিনা। তথাপি আপনার স্বাক্ষরযুক্ত ইহার একটি প্রতিবাদ আপনি সত্বর সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করুন।"

আরও একটি পত্রে নিবেদিতা গোখ্‌লেকে লিখিলেন যে :

"আপনি ইংরেজদের বুঝাইয়া দিবেন যে, এই বয়কট প্রস্তাবে বাঙ্গালী জাতির প্রাণে এক নূতন শক্তির আবিভাব হইয়াছে। রাশিয়ানদের মধ্যে এই শক্তি জাগিয়াছিল বলিয়াই নেপোলিয়ান্ রাশিয়া জয় করিতে পারেন নাই। ফরাসী জাতির মধ্যে এই শক্তি একদিন জাগিয়াছিল বলিয়াই নেপোলিয়ন এত সহজে ফরাসী দেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। এবং আমেরিকানদের মধ্যে একদিন এই শক্তি জাগিয়াছিল বলিয়াই, আমেরিকা স্বাধীন হইতে পারিয়া ছিল। এবং কয়েকমাস পূর্বে যে শক্তি দেখা যায় নাই, আজ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সেই শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।"

ফরাসী জীবন চরিতে আছে, ১৫ই অক্টোবর নিবেদিতা যখন দার্জিলিংয়ে ছিলেন, সেখানে একটি সভা হয়। কিন্তু ইহা ১৫ই অক্টোবর নয়, ১৬ই অক্টোবর হইবে। এই সভায় মাত্র দুই জন বক্তা ছিলেন। মিঃ সি, আর, দাশ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) এবং নিবেদিতা। নিবেদিতা বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার জন্মভূমির জন্য আমি লজ্জিত। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ইংরেজকে বঙ্গভঙ্গ আইন উঠাইয়া লইতে বাধ্য না করে, এবং ইংরেজ আমাদিগকে যথোচিত সম্মান না দেয়, ততদিন আমরা সংগ্রাম করিয়া যাইব।*

Federation Hall প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৬ই অক্টোবর কলিকাতায় আবার একটি বিরাট সভা হইল। মিঃ আনন্দমোহন বসুকে তাঁহার অন্তিমশয্যা হইতে তুলিয়া আনিয়া সভাপতি করা হইল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জী তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, স্যর তারকনাথ পালিত ও ভগিনী নিবেদিতা এই সভার প্রতি পূর্ণ সমর্থন (wormly supported) জানাইয়াছেন।**

নিবেদিতা কলিকাতা আসিবার পূর্বে "A Study of Love and Death" নামে একখানি ছোট পুস্তক প্রকাশ করিলেন।***

---

* "Shame to my nativeland," said Nivedita striking her breast, "we shall fight until the sacrifice and heroism of the children of India oblige the English to drop the unjust barrier that divides Bengal, until they show respect to us."

**"That beneficient lady who had consecrated her life to, and died in, the service of India." 'A Nation in Making,' p. 213.

*** আমি "উদ্বোধন" পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৫০, পৃঃ ১৬০) "শ্রীঅরবিন্দ" লিখিবার সময় ভ্রমক্রমে লিখিয়াছিলাম যে, ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতায় Federation Hall-এর সভায় উপস্থিত ছিলেন। এখন দেখিতেছি তিনি কলিকাতায় ছিলেন না। ১৬ই অক্টোবর দার্জিলিং-এ বক্তৃতা করিয়াছেন। এবং কলিকাতার সভায় সহানুভূতি সূচক চিঠি পাঠাইয়াছেন। আমার এই ভ্রমের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। —লেখক

মিঃ গোখ্‌লে লন্ডন হইতে দেশে ফিরিতেছেন। নিবেদিতা তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি দার্জ্জিলিং হইতে শীঘ্রই কলিকাতা আসিতে মনস্থ করিলেন। গোখ্‌লে বিলাতে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে, ভগিনী নিবেদিতা তাহা মিথ্যা জানিয়াও বিচলিত হইয়াছেন, এবং ৭ই আগষ্ট বয়কট প্রস্তাবের পর হইতে যে বিষম অন্দোলন সুরু হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শের জন্যই গোখ্‌লের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের প্রয়োজন। গোখ্‌লে অতিশয় নরমপন্থী (Moderate); বিপ্লবী নিবেদিতার এই গোখ্‌লে প্রীতি আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। বিপিন পাল গোখ্‌লের বিরুদ্ধবাদী। অরবিন্দ ত গোখ্‌লেকে দেশদ্রোহী বিভীষণ আখ্যা দিয়াছেন। অথচ নিবেদিতা বাংলার চরমপন্থী দলের অর্ন্তভুক্ত। শুধু তাই নয়, অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম হইতেই পরামর্শদাতা। নিবেদিতা কি গোখ্‌লের নিকট আত্মগোপন করিয়াছেন? অথবা মিঃ গোখ্‌লে বিপ্লবী নিবেদিতার কার্য্যবলী জানিয়াও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন?

আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর (১৯০৫), এই পাঁচ মাস নিবেদিতা দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। ডিসেম্বরে তিনি কলিকাতা ফিরিলেন। কিন্তু নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থার অগ্রগতি এই পাঁচ মাসে বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল।

আগষ্ট -- ৭ই আগষ্টের বয়কট্ সভাকেই আমরা স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থার প্রথম ও প্রধান ঘটনা বলিয়াই বার বার উল্লেখ করিয়া আসিতেছি।

সেপ্টেম্বর — স্বদেশী গানের একটি প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়। বাংলা দেশের হৃদয় হইতে সাক্ষাৎ চণ্ডী বাহির হইয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, — এই চণ্ডীর ডান হাতে খড়গ জ্বলে, ইহার ললাট-নেত্র "আগুন বরণ"। কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ লিখিলেন— "পাষন্ড প্রচন্ড বলে অঙ্গ খন্ড খন্ড করে"; অতএব হে মা চণ্ডী, তুমি দণ্ড দিতে অগ্রসর হও। কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য লিখিলেন— "অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সুদর্শনধারী মুরারী।" রজনীকান্ত সেন গাইলেন, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।" ইত্যাদি। ২২শে, কলিকাতা টাউনহলে বিরাট প্রতিবাদ সভা হইল। মিঃ মেহতার দর্পচূর্ণকারী ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী মিঃ লালমোহন ঘোষ সভাপতি হইলেন। ২৫শে, কলিকাতা ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনতাকে পুলিশ লাঠির গুঁতায় ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। ইহাই দমন নীতি এবং এই তাহার প্রথম আরম্ভ।

অক্টোবর — ১০ই, কার্‌লাইল সার্কুলার জারী হইল। ছাত্রেরা সভা করিতে পারিবে না, শোভাযাত্রা বাহির করিতে পারিবে না, "বন্দেমাতরম্" গান মুখে উচ্চারণ

করিতে পারিবে না। ইহা দমন নীতির আর একটা দিক। ১৬ই, "মিলন মন্দির"-এর সভায় আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব করিলেন। তিনি বলিলেন, "বিদায়, জীবনের এই পারে আপনাদের সঙ্গে আমার বোধ হয় এই শেষ সাক্ষাৎ।" সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লিখিয়াছেন যে "এই দিন আনন্দমোহনের বাগ্মিতার চরম উৎকর্ষ দেখা দিয়াছিল।"*

লালমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, ইঁহারা ইংরেজী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী। খাস ইংল্যান্ডেও ইঁহাদের তুলনা মিলে না। ২২শে, দ্বিতীয়বার কার্লাইল সার্কুলার জারী হইল। প্রতিবাদে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হইল। আইন অমান্য আন্দোলনের ইহাই প্রথম সোপান। ২৭শে, চোরবাগানে, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে সভায় জাতীয় ভান্ডারের জন্য চাঁদা তোলা হয়।

"সন্ধ্যা"য় ইতর ভাষা প্রয়োগের অভিযোগের উত্তরে উপাধ্যায় বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিয়াই সর্ব্বসাধারণের মুখে এই ভাষা তুলিয়া দিতেছি। ইংরেজকে ফিরিঙ্গি বলিয়া গাল দিতে শিখিলে লোকের ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

নভেম্বর — ৪ঠা, গোলদিঘীতে ছাত্রদের সভা। রংপুরে ছাত্রদের দন্ডের প্রতিবাদ। এই শতাব্দীর ছাত্র আন্দোলন এই সভাতেই সুরু হয়। ৫ই, শ্যামপুকুর ময়দানে সভা। বগুড়ার নবাব আব্দুল সোহ্‌বান চৌধুরী সভাপতি। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে এই বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, তাঁহারা এই আন্দোলনে পুরাপুরি যোগ দিতেছেন না। ৯ই, ছাত্ররা গোলদিঘীতে সভা করিল। আবার ফীলড্ এন্ড এ্যাকেডেমি ক্লাব-এ রাজা সুবোধ মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দিবেন ঘোষণা করিলেন। এই কথা শুনিয়া সি, আর, দাশ "বলেন কি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুবোধ মল্লিকের বাড়ী গিয়ে দেখা করেন ও দুই ঘণ্টা কথাবার্ত্তা বলেন। পরের দিন ১০ই, পান্তির মাঠের সভায় সি, আর, দাশ রাজা সুবোধ মল্লিক-কে ধন্যবাদ দিয়া বক্তৃতা করিলেন। ১১ই, গোলদিঘীর সভায় বিপিন পাল ও হীরেন দত্ত প্রভৃতি ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বলিলেন! ইহার মূলে ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। এইখানেই নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে ফাটল ধারিল। ১৭ই, 'ফীলড এন্ড এ্যাকাডেমি' ক্লাব-এর সভায় সুরেন্দ্র ব্যানার্জী সভাপতি হইয়া ছাত্রদের বলিলেন, তাহারা যেন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ না করে। এইদিন নরম ও চরমপন্থীদের ভেদ পাকা হইয়া গেল। ভগিনী নিবেদিতা এই সময় দার্জিলিংয়ে বসিয়া লন্ডন হইতে গোখ্‌লের প্রত্যাবর্ত্তনের

---

* I regard it as the greatest of his oratorical performances and one of the noblest orations to which it has been one's privilege to listen. "A Nation in Making," p. 215.

প্রতীক্ষা করিতেছেন। ২৪শে, পান্তির মাঠে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইল। ২৬শে, ঐ মাঠের সভায় রংপুরে গুর্খা সৈন্য রাখার তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। ছাত্র আন্দোলন সংহত ও সুগঠিত হইতে চলিয়াছে।

ডিসেম্বর — ৩রা, পান্তির মাঠে সম্পূর্ণ গভর্ণমেন্ট নিরপেক্ষ হইয়া "আত্মপ্রতিষ্ঠা" ও "আত্মরক্ষার" সংকল্প গ্রহণ করা হইল। ইহাই বাংলার চরম-পন্থীদলের ক্রীড (creed) রূপে গৃহীত হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের প্রভাব দেখা যায়। ইহা সুরেন্দ্র ব্যানার্জী ও গোখ্‌লের মত Moderate-দের আবেদন-নিবেদন নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শ। ৯ই, গোলদিঘীতে সভা হইল। ১৭ই, পান্তির মাঠে "স্বদেশী আন্দোলন ও তাহার ভবিষ্যৎ" সম্পর্কে বক্তৃতা হইল। ১৮/২১/২২/২৩শে এই চারিদিন, বিপিন পালের নেতৃত্বে 'ফীল্‌ড্‌ এন্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব-এ আলোচনার পর ২৪শে তারিখে,সি, আর, দাশের বাড়ীতে চরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান "স্বদেশী মন্ডলী" ভূমিষ্ঠ হইল। ইহা ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্বদেশী মন্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এইখান হইতেই পৃথক্‌ হইয়া কাশী কংগ্রেসে রওনা হইলেন। বাংলার নরমপন্থী ও চরমপন্থী কাশী কংগ্রেসের পূর্বেই মিঃ সিং, আর, দাশের বাড়ী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। সি, আর, দাশ নরমপন্থী বিরোধী, চরমপন্থী দলভুক্ত। এই পাঁচ মাসের আন্দোলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন —

(১) বিপিনচন্দ্র পাল, (২) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, (৩) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, (৪) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (৬) রাজা সুবোধ মল্লিক, (৭) ব্যারিষ্টার এ, চৌধুরী, (৮) ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়, (৯) সি, আর, দাশ, (১০) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, (১১) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (১২) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, (১৩) কৃষ্ণকুমার মিত্র, (১৪) মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, (১৫) শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, (১৬) রমাকান্ত রায়, এবং (১৭) অশ্বিনী কুমার দত্ত।

এই পাঁচ মাসে 'ডন্‌ সোসাইটি' (Dawn Society) অপেক্ষা 'ফীল্‌ড্‌ এন্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব' (Field and Academy Club) হইতেই প্রেরণা ও উত্তেজনা বেশী অসিয়াছে। ইহাই ভগিনী নিবেদিতার এই সময়কার জীবন ইতিহাসের পটভূমিকা। আন্দোলনের এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় তিনি নিজেও একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

নিবেদিতা দার্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিয়া একটি বাগান বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গত কয়েকমাস তিনি কলিকাতা ছিলেন না। সুতরাং

পুলিশ তাঁহার কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। পুলিশের উপদ্রবের মধ্য দিয়াই সাবধানী অথচ নির্ভীক নিবেদিতা তাঁহার জীবনের ব্রত সম্পন্ন করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার জীবনের পথে অগ্রসর হইতে বহু বিঘ্ন ছিল। এখন তিনি কাশী কংগ্রেসে রওনা হইবেন। কাশী রওনা হইবার পূর্বে তিনি কংগ্রেস সম্পর্কে সংবাদপত্রে এই বলিয়া একটি বিবৃতি* প্রচার করিলেন যে, কংগ্রেস ইহার সভ্যদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবে। এবং হিমালয় হইতে কেপ্ কমোরিন্ এবং মণিপুর হইতে পারস্য উপসাগর মধ্যে যে একটি বিরাট পরিবার বাস করে, তাহাদের পরস্পর সহানুভূতির ভাব কংগ্রেস প্রকাশ করিবে।

২৪শে ডিসেম্বর। অর্থাৎ কংগ্রেস বসিবার তিন দিন পূর্বে নিবেদিতা কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গণেন মহারাজ আগে গিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিল ভান্ডেশ্বরের সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে এই খোলার বাড়ীটি অবস্থিত ছিল। এই বাড়ীটির নীচের ঘরগুলিতে অফিস বসিয়াছিল। কতকগুলি সেক্রেটারী লইয়া নিবেদিতা এই অফিসে বসিয়া কাজ করিতেন। বিরুদ্ধ মতের নেতারা সকলেই নিবেদিতার কাছে আসিতেন, পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিতেন। রমেশ দত্তকে সঙ্গে করিয়া বরোদার মহারাজা অসিতেন। নিবেদিতা পূর্বেই বরোদার মহারাজার সহিত বরোদাতে গিয়া (১৯০২ অক্টোবর) পরিচিত হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রিতে নিবেদিতার বাড়ীতেই গোখ্‌লে আসিয়া বরোদার মহারাজার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া গেলেন। এবং তাঁহার পরিকল্পনাটি সকলকে বলিলেন। নিবেদিতার বন্ধুরাই গোখ্‌লের "Servents of India Society"-র প্রথম সভ্য হইলেন। গোখ্‌লের কাজে নিবেদিতার হস্ত সর্বদাই লক্ষিত হয়।

নিবেদিতাকে বাহিরে বড় একটা দেখা যাইত না। অথচ নেতাদের গতিবিধির জন্য তিল ভান্ডেশ্বরের গলি সরগরম হইয়া উঠিল। নিবেদিতা অন্তরালে থাকিয়া সকল কাজ করিলেন। চিরদিনই তিনি এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন।

এখন একবার কংগ্রেসে আসা যাক্। বিপিন পাল প্রমুখ বাংলার চরমপন্থীদল বলিলেন, কংগ্রেসকে বাংলার বয়কট্ মানিয়া লইতে হইবে। সভাপতি গোখ্‌লে

---

* Appeal issued by Nivedita just befor the opening of the session of the Benaras Congress, 1905:
"It must animate its own members in the sense of nationality, *** it must push forward to bring to light the mutual sympathy that binds the vast family living between the Himalayas and Cape Comorin, between Manipur and the Persian Gulf."

তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন, বয়কট্ কথাটার মধ্যে একটা প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ভাব রহিয়াছে। ইংল্যান্ডের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, তাহাতে কংগ্রেস বয়কট্ প্রস্তাব সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সমর্থন করিতে পারে না। কিন্তু বাংলার জনমত উপেক্ষা করিয়া যেভাবে বাংলাকে লর্ড কার্জন দ্বিখন্ডিত করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে বয়কট্ সমর্থনযোগ্য। — "Perhaps the only constitutional and effective means left". বাংলার চরমপন্থীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। যুবরাজের অভিনন্দন প্রস্তাবের সময় বাংলার চরমপন্থীরা কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া গেলেন। যুবরাজ-বয়কটের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন। বাংলার চরমপন্থীরা যুবরাজের অভিনন্দনে যোগদান করেন না। লোকমান্য তিলক সিংহবিক্রমে বাঙ্গালীর পক্ষে হইয়া কংগ্রেস মন্ডপে গোখ্‌লে প্রভৃতি মডারেটদের আক্রমণ করিয়াছিলেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, লাজপৎ রায় বাংলার আন্দোলনকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন যে, বাংলার সিংহ এতদিন শৃগালের মত ছিল, কিন্তু লর্ড কার্জনের উৎপীড়নে বাংলা এখন সিংহবিক্রমে জাগিয়া উঠিয়াছে।

বাংলার বয়কট্ সম্পর্কে গোখ্‌লে বিলাতে থাকাকালীনই নিবেদিতার সহিত চিঠিপত্রে তাঁহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। নিবেদিতা বা কি বলিয়াছেন, আর গোখ্‌লেই বা তাহার উত্তরে কি লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না।

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মাদ্রাজ কংগ্রেসের (১৯০৮) সভাপতির অভিভাষণে এই কাশী কংগ্রেসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাংলার চরমপন্থীদলের নূতন আন্দোলন সর্বপ্রথম কাশী কংগ্রেসেই দেখা যায়। কাশী কংগ্রেস সম্পর্কে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের মন্তব্য খুব ঠিকই হইয়াছে।*

ভগিনী নিবেদিতা এই কংগ্রেসের বিবরণী "An English Observer" এই নাম দিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফকে কলিকাতায় পাঠাইতেন। এই বিবরণগুলির মধ্যে কংগ্রেস রাজনীতির দুর্বলতা কোথায়, তাহা তিনি নিখুঁত ও নির্মমভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কংগ্রেস সম্পর্কে নিবেদিতার একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায় — Civic and National Ideals গ্রন্থে (৪৯ পৃঃ)। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, কংগ্রেস দলাদলির রাজনীতি

---

* "The first ominous sign of a movement which has since unmasked itself appeared in the Banaras Congress in December, after the reactionary policy of Lord Curzon had culminated in the partition of Bengal."

নহে। ইহা জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক অংশমাত্র। ইহা দলাদলির রাজনীতি হইতে পারে না।**

প্রিন্স ক্রপাটকিন্ শিষ্যা এবং অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির পরামর্শদাতা নিবেদিতা কি মনে করেন যে, আবেদন-নিবেদনবাদী গোখ্‌লে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী বিপিনচন্দ্র, আর সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দ, কংগ্রেস মন্ডপে একসঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারেন?

কাশী কংগ্রেস জের

ভগিনী নিবেদিতা কাশী কংগ্রেস হইতে কলিকাতা ফিরিলেন। তিনি কোনদিন কংগ্রেস রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সম্মুখে আসিয়া কোন বক্তৃতা করেন নাই। অথচ তিল ভান্ডেশ্বরের গলিতে তাঁহার বাড়ীর নিচের তলায় যে অফিস বসিয়াছিল সেখানে কংগ্রেসের সকল প্রদেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল নেতা আসিয়াই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন।

ডন সোসাইটির মাধ্যমে তিনি যেমন বাংলা দেশের সকল জ্ঞানী-গুণীর সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন, কাশী কংগ্রেসে নেপথ্যে থাকিয়াও তিনি ভারতের সকল প্রধান রাজনৈতিক নেতার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিবার ও মিশিবার সুযোগ পাইলেন। কোন একজন বিদেশী মহিলা ভারতবর্ষে আজও পর্য্যন্ত এতটা প্রভাব করিতে পারেন নাই।

কাশী কংগ্রেসে বাংলার চরমপন্থীরা মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবকে দলভুক্ত করিয়া ভারতের সকল প্রদেশের নরমপন্থী দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। লোকমান্য তিলক ("মারাঠা যার পাদপীঠ আর কেশরী যার বাহন") আর পাঞ্জাব কেশরী লাজপৎ—ইঁহারা উভয়েই বাংলার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবর্ত্তক বিপিনচন্দ্রকে বয়কট প্রস্তাবে সমর্থন জানাইলেন। অপর প্রদেশের নরমপন্থী নেতারা সমর্থন দূরে থাকুক, বিরোধিতা করিলেন।

পরবর্ত্তী কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসে (১৯০৬) এই নরম ও চরমপন্থী দলের দ্বন্দ্ব আরও ঘোরালো রকম হইয়া দেখা দিয়া তারপর সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) এই দলাদলি চরমে উঠিয়া মারামারিতে গিয়া পৌঁছিল। কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল।

কলিকাতা (১৯০৬) কংগেসের সময় নিবেদিতা সাংঘাতিক পীড়ায় মুমূর্ষু

** Here is not a movement of partisan politics at all, but a national, that is to say, a unanimous progression **** The Congress represents, not a political, or partisan movement, but the political side of a national movement — a very different thing." (pp. 49, 51)

অবস্থায় শয্যাশায়ী। আর সুরাট কংগ্রেসের সময় তিনি ভারতবর্ষেই ছিলেন না। পুলিশের দৌরাত্ম্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় পালাইয়া গিয়াছিলেন।

কাশী কংগ্রেসের পর হইতেই লাল-বাল-পাল (লালা লাজপৎ, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল) চরমপন্থীদলের এই ত্রিমূর্ত্তি ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। অরবিন্দ তখনও বরোদা হইতে আসেন নাই। আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে গোপনে সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ করিবেন, এবং ছয় মাস পরেই প্রকাশ্যে বিপিন পালের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে যোগ দিবেন। বাংলায় চরমপন্থী দলের প্রধান নেতা বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি সন্ত্রাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

অরবিন্দ প্রবর্ত্তিত সন্ত্রাবাদী গুপ্ত সমিতির দ্বিতীয় পর্বেও ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের সহিত হাত মিলাইবেন। তিনি যে বরোদায় (১৯০২, অক্টোবর) অরবিন্দের হাতে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন — "আপনি আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন, আমি আপনার বন্ধু" (Count upon me, I am your ally), এই প্রতিশ্রুতি নিবেদিতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভঙ্গ করেন নাই। এই বৎসরে বাংলা দেশে দ্বিতীয় বার যে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হইল, তাহাতে অরবিন্দ ও নিবেদিতা একদিকে, আর বিপিনচন্দ্র পাল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া বিপরীত দিকে।

কাশী কংগ্রেস যখন শেষ হয় (২৯শে ডিসেম্বর ১৯০৫) সস্ত্রীক যুবরাজ তখন কলিকাতায় আসিলেন। ভূপেন বসু সদ্য কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া ধূলিপায়ে স্টীমার ঘাটে যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলেন। চরপন্থীরা যুবরাজের অভ্যর্থনা বয়কটের প্রথম প্রবর্ত্তক। বাংলার চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই দলে ক্রমেই ছাড়াছাড়ি হইতে লাগিল।

নিবেদিতা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে, বিশেষত কংগ্রেসের মধ্যে, নরম ও চরমপন্থী এই দুই দলের দলাদলি পছন্দ করেন নাই। বিদেশী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে একটি দল থাকাই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। কংগ্রেসের মধ্যে দুই দলের কলহ (Party politics) ইংরেজের রাজনীতির অন্ধ অনুকরণ।*

নিবেদিতা যদি রমেশ দত্ত গোখ্‌লেকে একদিকে, এবং তিলক, বিপিন পাল ও অরবিন্দকে অন্যদিকে, আবার তারই মধ্যে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিপিন পাল ও অরবিন্দকে এক দলভুক্ত করিতে চান, তবে তাহা আদর্শ ও বাস্তব উভয়দিক

* Civic and National Ideals, p. 49.

হইতেই অসম্ভব। নিবেদিতা প্রথম শ্রেণীর আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক (patriot), কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ধুরন্ধর রাজনীতি বিশারদ (shrewd politician) নহেন।

ভগিনী নিবেদিতার একসঙ্গে গোখ্‌লে প্রীতি ও অরবিন্দ প্রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। নিবেদিতা বলিতেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে গোখ্‌লে তাহার রাজস্ব সচিব (Finance Minister) হইবেন। কিন্তু তার আগে ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে হইবে? ইহা লইয়াই তো মতভেদ। অর্থনীতিবিশারদ নিরীহ মডারেট গোখ্‌লে কি নিবেদিতার আয়র্ল্যান্ড ও রাশিয়ার অনুকরণে সন্ত্রাসবাদ (terrorism) ও বিপ্লব (revolution) অনুমোদন করিবেন? কিছুতেই না। তবে দলাদলি না হইয়া উপায় কি?

নিবেদিতার গোখ্‌লে প্রীতি কিছুটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর কিছুটা রাজনীতির দিক দিয়া হয় তো প্রতিপত্তিশালী গোখ্‌লেকে হাতে রাখিবার চেষ্টাও বটে।

যুগান্তর পত্রিকা — মার্চ, ১৯০৬

"আনন্দমঠ"-এর অনুকরণে, অরবিন্দের "ভবানীমন্দির" শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতা চাঁপাতলার গলিতে (২৭নং কানাইলাল ধর লেনের বাড়ী) যুগান্তর পত্রিকার অফিসে আসিয়া পরিণত হইল। বারীন্দ্র কুমার শোন নদীর তীরে কাইনুর পাহাড়ে মাসাবধি কাল চেষ্টা করিয়াও ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠার স্থান নির্দেশ করিতে পারিলেন না। ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অরবিন্দ ভাব (idea) দিতে পারেন, কোন বাস্তব কাজ পরিচালনা করিতে পারেন না। অরবিন্দ লিখিয়াছেন, "আমি কবিতা ও দেশকে সমান ভালবাসি।" মুস্কিল ঐখানে। কোথায় ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা, "Far from the contamination of modern cities, in a high and pure air steeped in calm and energy — আর কোথায় চাঁপাতলার গলির আড্ডায় ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া বোমা রিভলবার সহযোগে কতিপয় আনাড়ি যুবকের ভারত উদ্ধারের প্রচেষ্টা।

প্রথম হইতেই যুগান্তর পত্রিকা খোলাখুলিভাবে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা" ঠিক এইরূপ প্রকাশ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করে নাই।

নিবেদিতা ও অরবিন্দ কেহই বাংলা ভাষা উত্তমরূপে বলিতে পারেন না, লিখিতেও পারেন না। তথাপি তাঁহারা উভয়েই যুগান্তরের সূচনা হইতেই ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই যুগান্তরের আড্ডাই অরবিন্দ প্রবর্ত্তিত বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতির দ্বিতীয় পর্ব বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বেও নিবেদিতা যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কেন না বারীন্দ্র কুমার লিখিয়াছেন, (বোমার কাহিনী, স্বদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮) — "সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক দেড়শ' বই দিয়াছিলেন।" ইহা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। পুনরায় ১৯০৬ মার্চ মাসে দেখিতেছি নিবেদিতার বাড়ীতেই বারীন্দ্র কুমার ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরের সকল রকম প্ল্যান স্থির করিয়া প্রথম সংখ্যা লিখিয়া ফেলিলেন।*

সুতরাং যুগান্তরের আড্ডার বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্ব ও পরামর্শ ব্যতীত আরম্ভ হইল না। এই ঘটনার মধ্যেই ইতিহাসে নিবেদিতার নির্দিষ্ট স্থান কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এই যুগান্তর পত্রিকার সহিত অরবিন্দের কি সম্পর্ক তাহাই বলিতেছি। অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ২০/৬/৪৩ তারিখে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে ঃ

"অরবিন্দ মধ্যে মধ্যে যুগান্তরে প্রবন্ধ দিতেন, কিন্তু তাঁহার নাম দিতেন না, তাঁহার বাংলা প্রবন্ধে সংস্কৃত ও মারাঠী শব্দ ও অক্ষর পর্য্যন্ত থাকিত। অবিনাশবাবু ঐগুলির ভাব বজায় রাখিয়া ভাষা সংশোধন করিয়া দিতেন। তাতে বারীন্দ্র অবিনাশ বাবুকে ধমক দিয়া বলিত— "কি তুমি সেজদার লেখার উপর কলম চালাও!" — অরবিন্দ ইহা শুনিয়া অবিনাশবাবুকে সমর্থন করিতেন।"

সুতরাং যুগান্তরের সহিত অরবিন্দের সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনই অবকাশ রহিল না। কিন্তু আলিপুরে বোমার মামলায় (১৯০৯) মিঃ সি, আর, দাশ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যুগান্তরের সহিত অরবিন্দের কোনই সম্পর্ক ছিল না। মক্কেলের জীবন রক্ষার্থে উহা বিচক্ষণ কৌসুঁলীর সওয়াল মাত্র; সত্য ইতিহাস নয়। আর এই রূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা দোষের নয় বলিয়া অরবিন্দ তাঁহার গীতা প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। যুগান্তরের পরিকল্পনা নির্জলা বিপ্লব, কোনই ঘোর প্যাঁচ নাই। ১ম — বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি; ২য় — গরিলা যুদ্ধ; ৩য় — দেশীয় সৈন্যদের সাহায্যে, ক্ষমতা হস্তগত করিবার

* "Nivedita had been intimately connected with the bringing out of the Yugantar, It was at her house that Barindra Ghose and the younger brother of Vivekananda, Bhupendra Nath Dutt, had discussed their plans and composed their first numbers. When the Yugantar appeared in its definite form, in March 1906, it represented the combination of many endeavours. (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০১)

জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ। যুগান্তর পত্রিকা একথা খোলসা করিয়া লিখিতে দ্বিধা করে নাই। নিবেদিতা ও অরবিন্দের সমর্থন ছাড়া যুগান্তর তাহাদের এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা প্রকাশ করিতে পারিত না। ইহা শুধু মডারেট বিরোধী নয়, বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেরও বিরোধী।

বরিশাল কনফারেন্স (১৪ই এপ্রিল — ১৯০৬)

নিবেদিতা এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন না। অরবিন্দ ছিলেন। তথাপি পরোক্ষভাবে এই কনফারেন্সের প্রভাব নিবেদিতা ও অরবিন্দের জীবনে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে।

জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ব্যারিষ্টার এ, রসুল এই সভার সভাপতি। বিলাতে থাকাকালীন তিনি অরবিন্দ ও মিঃ সি, আর, দাশের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। এই কন্‌ফারেন্সের বিশেষত্ব হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বও নয়; চরমপন্থী ও নরমপন্থীর দ্বন্দ্বও নয়। ইহা ফুলারী দমন নীতির চরম প্রকাশ।

কারলাইল সাহেবের সার্কুলার অনুযায়ী "বন্দেমাতরম" ধ্বনি কেহ করিতে পারিবে না, মুখে উচ্চারণ মাত্রও নিষিদ্ধ। কিন্তু সভাপতি লইয়া শোভাযাত্রার সময় "বন্দেমাতরম" ধ্বনি শোনা গেল। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, মিঃ এমার্সন, সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করিয়া চারশ' টাকা জরিমানা করিলেন। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র বালক চিত্তরঞ্জনকে পুলিশ লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত দেহে পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। সভায় ব্যান্ডেজ বাঁধা চিত্তরঞ্জনকে সম্মুখে রাখিয়া মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা যে আবেগময়ী বক্তৃতা দিলেন, তাহার ফলে সভার মধ্যে একটা হিংস্র উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইল। পুলিশ আসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শাখার জন্য যে অভিভাষণ লিখিয়া নিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পকেটে লইয়াই কলিকাতায় ফিরিলেন। সভায় সকলে উঠিয়া আসিলেও কৃষ্ণকুমার মিত্র একা বসিয়া রহিলেন। ভূপেন বসু তাঁহাকে অবশেষে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলেন।

বিপ্লবী অরবিন্দ নীরবে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এ দৃশ্য চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখ নীরব ছিল, কিন্তু মন নীরব ছিল না।

এই সভায় নরমপন্থী, চরমপন্থী দুই দলই আসিয়াছিলেন। নরমপন্থী দলে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, ভূপেন বসু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি আর চরমপন্থী দলে বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। অরবিন্দ চরমপন্থী দলভুক্ত।

ইহার মাত্র এক মাস আগে অরবিন্দ ও নিবেদিতার নেতৃত্বে 'যুগান্তর' পত্রিকা ও সন্ত্রাসবাদী যুগান্তরের আড্ডা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে দেখা দিল।* বিপ্লব খেয়াল নয়, সাধনার বস্তু। "১৯০৬ এপ্রিল পুণ্যে বিশাল বরিশালের ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্রগুলো লোকের কানে সহজে ঢুকত। এমন কি হোমরা মডারেটও বিপ্লবের শোয়ালে সই দিতেন।"(বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, হেমচন্দ্র কানুনগো, পৃঃ ১১৭।)**

মডারেট বিপ্লবী হয়—সহজ কথা নয়।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জী এমন কি গোখ্‌লে, কড়া ভাষায় এই ফুলারী দমন নীতির নিন্দা করিলেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতা কোন নিন্দা করিলেন না বরং একটি সুযোগ পাইলেন।

ফুলার বধের চেষ্টা

বরিশাল কন্‌ফারেন্সের মাত্র একমাস পরেই নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিয়া অরবিন্দ ফুলার বধের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। বারীন্দ্র ফুলারের গ্রীষ্মাবাস শিলং যাত্রা করিলেন। তারপরে হেমচন্দ্র কানুনগোকে হত্যাকারী মনোনীত করিয়া শিলং পাঠানো হইল। হেমচন্দ্র নিজের নামটি গোপন করিয়া লিখিয়াছেন — "মেদিনীপুরের একজন ফুলার বধের ভার পেল। সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে সে গোয়ালন্দ যাত্রা করল। সেটা বোধ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। সন্ধ্যেবেলা তাকে শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌছে দিতে গেলেন পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।" (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ১২১)।

বরিশালের দমন নীতির প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত কাজ আরম্ভ করিল। ইহা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হইবে কি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হইবে; সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে কেন না, অরবিন্দ তাঁহার শ্বশুর ভূপাল বসুকে ১৯০৬, ৮ই জুন শিলংএ চিঠি লিখিতেছেন যে, "বারীন অসুস্থ, আমি তাকে শিলং চেঞ্জে (change) যাইতে বলিতেছি। যদি সে শিলং যায়, তবে আমি জানি আপনি বারীনের ভার নিবেন এবং তাকে যত্ন করিবেন।" সুতরাং, হেমচন্দ্রের মে মাসের তারিখ ঠিক নয়। অরবিন্দের চিঠি প্রমাণ করে যে, ইহা ৮ই জুনের ঘটনা।

---

* উল্লাসকর দত্ত বলেন যে, "১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী ও পুলিশের অকথ্য অত্যাচার তাঁহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া দেয়। সেই হইতে তিনি বিপ্লবী হইবার সাধনা আরম্ভ করেন।"

** ভারতে জাতীয় আন্দোলন (প্রভাতকুমার মুখার্জী, পৃঃ ১৩৫-১৩৬)

শিলং গৌহাটি, বরিশাল, রংপুর, সব স্থানেই হত্যাকারীরা ফুলারকে অনুসরণ করিলেন বটে, কিন্তু লাট সাহেবকে তাঁহারা হত্যা করিতে পারিলেন না। বরিশালে — "সামনে দিয়ে একটা প্রকান্ড বাঘ দূরে চলে গেলে, নূতন কাঁচা শিকারীদের যে সোয়াস্তি মিশ্রিত আফশোষ হয় ফুলার শিকারীদেরও প্রায় তাই হয়েছিল।" (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ১৪০)

হেমচন্দ্র নিজেদের ব্যর্থ হওয়ার কারণ খুব ঠিক ভাবেই লিখিয়াছেন। তাঁহারা অরবিন্দের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব কথা বিস্তারিত বলিলেন। তিনি নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া শুধু হাত দিয়া ইসারা করিলেন, "তোমরা বাড়ী চলিয়া যাও।" এরূপ নির্লিপ্ত ও নীরব বিপ্লবী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এখন দুইটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ১ম— সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, ফুলার বধের ষড়যন্ত্র আগে হইতেই জানিতেন কি না? ২য় — ভগিনী নিবেদিতা ফুলার বধের ষড়যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন কি না?

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ২৩১-২৩৪) এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন আগে কিছুই জানিতেন না। যখন প্রথম শুনিলেন, তখন কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইয়া গেলেন। ("I was a little staggered.") কিন্তু আমরা অন্য প্রমাণে দেখিতেছি যে, তিনি আগে হইতেই সব জানিতেন। কেন না, ভূপেন্দ্রনাথ স্পষ্ট লিখিয়াছেন — "ফুলারের উদ্দেশ্যে বোমা ফেলা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া বারীন্দ্র ও আমি যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমুলতলার গ্রীষ্মাবাসে গিয়াছিলাম, তখন তিনি এই 'সোনার বাঙ্গলা' pamphlet-এর কথা বলেন।" (দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, পৃঃ ১৪৬)।

ভূপেন দত্তের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অতএব সুরেন্দ্রনাথ এই ষড়যন্ত্র আগে হইতেই জানিতেন।

যে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র সুরেন্দ্র ব্যানার্জী আগে হইতে জানিতেন, তাহা কি ভগিনী নিবেদিতা অবিদিত ছিলেন? বারীন্দ্র ও ভূপেন দত্ত বোমা দেখাইতে সিমুলতলায় সুরেন্দ্রনাথের নিকট ছুটিয়া গিয়াছিলেন, আর তাহারা কি কলিকাতায় ভগিনী নিবেদিতার নিকট ইহা গোপন রাখিয়াছিলেন? নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়ীতে বসিয়াই না বারীন্দ্র ও ভূপেন দত্ত যুগান্তরের "প্রথম সূচনা" নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিয়া খসড়া করেন। সেই যুগান্তরের আড্ডার প্রথম বৈপ্লবিক কর্ম নিবেদিতার অজ্ঞাতসারে তো হইতে পারেই না, বরং মনে করি, বিশ্বাস করি, যে অরবিন্দ ও নিবেদিতার একত্রে মিলিত পরামর্শ অনুসারেই এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মের সূত্রপাত হইয়াছিল।

কলিকাতায় শিবাজী উৎসব ও লোকমান্য তিলক

কাশী কংগ্রেসের কিছু আগেই বাংলার চরমপন্থীদল মিঃ সি, আর, দাশের বাড়ীতে 'স্বদেশী মন্ডলীতে' সংহত হইয়াছে। এই "স্বদেশী মন্ডলী" শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া লোকমান্য তিলককে নিমন্ত্রণ করিলেন। ৪ঠা জুন তিলক কলিকাতা আসিলেন। ... তিলক সম্পর্কে নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতকার লিখিয়াছেন যে, তিলক ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটা বিপ্লবের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। উহা জাপান, রাশিয়া, ইটালি ও ফ্রান্সে সমর্থিত হইয়াছিল। এমন কি ইংল্যান্ডেও অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও এডিনবরার হিন্দু ছাত্রেরা কতকগুলি সংবাদপত্রের ও পার্লামেন্টের সভ্যদের সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। ভারতের চরমপন্থী হিন্দুগণ আইরিশ বিপ্লবীদের অনুকরণে নিজদিগকে "Nationalists" আখ্যা দিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৯৬)।

অরবিন্দ বরোদায় থাকিতে বোম্বাই তাজমহল হোটেলে মিঃ খাপার্দ্দে সহিত বাংলায় গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিলকের ইহা অবিদিত থাকিবার কথা নয়। এবং ভগিনী নিবেদিতা যে এই গুপ্ত সমিতির সহিত জড়িত, একথাও তিনি জানিতেন বলিয়া মনে হয়।

লোকমান্য তিলক ৪ঠা জুন কলিকাতা অসিয়া ৬ই জুন একটি বক্তৃতা করিলেন। "বেঙ্গলী" পত্রিকা তিলকের ঐ বক্তৃতাটি পর্য্যন্ত ছাপাইলেন না। সুরেন্দ্র বানার্জী গোঁসা করিয়া কলিকাতা হইতে একেবারে সিমুলতলায় চলিয়া গেলেন। নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে রেষারেষি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অনেক সাধাসাধি করিয়া সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে সিমুলতলা হইতে কলিকাতা আনা হইল। তিনি ৭ই জুন সভাপতি হইয়া এক বক্তৃতা করিলেন। নরমে গরমে আবার কিছুটা মিটমাটের ভাব দেখা গেল। ৮ই জুন উৎসবের মেলা শেষ হইল। তিলকের কলিকাতা আগমনে স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আরও কিছুটা ঘৃতাহুতি দেওয়া হইল। আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল, শিখা বিস্তার করিতে লাগিল।

১৭ই জুন, তিলক শোভাযাত্রা ও সমারোহের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ভারতমাতার ছবি শোভাযাত্রার আগে চলিতে লাগিল। কামানের শব্দের মত কতকগুলি বোমা ফাটার ফাঁকা আওয়াজ রাস্তার জনতাকে এবং গবাক্ষের মহিলাদের সচকিত করিয়া তুলিল।

এই সমারোহের মধ্যেই অরবিন্দ ৮ই জুন তাঁহার শ্বশুর ভূপাল বসুকে চিঠি দিয়া ফুলার বধের জন্য বারীনকে শিলং পাঠাইলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে

যে, শিবাজী উৎসবের প্রকাশ্য রাজনীতিতে নিবেদিতা ও অরবিন্দ যেমন যোগ দিতেছেন, ঠিক তেমনি আবার উভয়েই ঠিক একই সময়ে অন্ধকারের রাজনীতি — ফুলার বধ ও রংপুরের বৈপ্লবিক ডাকাতির — নেতৃত্ব করিতেছেন। আলো অপেক্ষা অন্ধকারেই বিপ্লবীদের গতিবিধি বেশী। কাজেই উহাদের জীবন ইতিহাসে উহা যথাযথ তুলিয়া ধরা সহজ নয়। প্রকাশ্য ও অন্ধকারের রাজনীতির মধ্যে নিবেদিতা ও অরবিন্দ সর্বদাই একটা যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

শিবাজী উৎসবে শিবাজীর আরাধ্যা দেবী মা ভবানীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজার অনুষ্ঠান হইল। শুধু তাই নয়, শিবাজীর গুরু রামদাসের মূর্ত্তি গড়িয়াও পূজা হইল। সুতরাং মূর্ত্তি পূজা, নর পূজা দুই-ই যোড়শোপচারে করা হইল। ইহা ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণকুমার মিত্র ইহাতে আপত্তি করিলেন। মহা মুস্কিলের কথা। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এই শিবাজী উৎসবে প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তি তিনি মিঃ সি, আর, দাশকে মধ্যস্থ মানিলেন। মিঃ সি, আর, দাশ দুই পক্ষ শুনিয়া বলিলেন, কালিঘাটের কালী মন্দির বাদ দিয়া আমরা কি দেশের লোকের নিকট পৌঁছিতে পারিব?*

ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে কিছুটা আপত্তি করিয়া পরে এই বলিয়া যোগ দিয়াছিলেন যে, ইহা, Idolatry নয়, Idea–latry। মা ভবানী একটা Idea, সেই Idea মূর্ত্তিতে আরোপ করিয়া পূজা করা। পরে এই বিপিনচন্দ্রই (১৯০৭, ৬ই জুন) বাংলার গ্রামে গ্রামে শ্বেতবর্ণের রক্ষা কালী পূজার ব্যবস্থা দিয়া শ্বেত ছাগল বলি দিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মগণ রামমোহনপন্থী। রাজা রামমোহনের দোহাই দিয়াই তাহারা মূর্ত্তি পূজার বিরোধী। কিন্তু রামমোহন সব ক্ষেত্রেই মূর্ত্তি পূজার বিরোধী নহেন। ক্ষেত্র বিশেষে, তিনি মূর্ত্তি পূজার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। মূর্ত্তিতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া পূজা করিলে গৌণভাবে ব্রহ্ম পূজা করা হয়। মনস্থিরের জন্য মূর্ত্তি পূজার বিধি রামমোহনের লেখা হইতে পাওয়া যায়।**

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন, রামমোহনের মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে কালা পাহাড়ী ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়।

* Both parties agreed to call in Mr. C.R. Das as arbitrator. Now victory was assured "Of course", said C.R. Das after hearing both sides of the question, "shall we reach the people without the Kali Mandir?" The Blade; Life and Work of Brahmabandhab Upadhyay by B. Animananda, p. 150.

** "স্থূল ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে।" (ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচাব, পৃঃ ৮২)

অরবিন্দ বরোদাতে নিজের বাড়ীতে কালা মূর্ত্তি পূজা করিয়াছেন। এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা মন্ত্র জপ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তিও পূজা করিয়াছেন। সুতরাং এতদুভয়ের ভবানী মূর্ত্তি পূজায় কোনই আপত্তি হইতে পারে না।

বন্দেমাতরম পত্রিকা (৭ই আগষ্ট, ১৯০৬)

যুগান্তর পত্রিকার চারি মাস পরে, বরিশাল কনফারেন্সের তিন মাস পর, শিবাজী উৎসবের দুই মাস পরে, এবং অরবিন্দের ফুলার বধের ব্যর্থ চেষ্টার মাত্র একমাস পরে বাংলার চরমপন্থীদলের সম্পদ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত হইল। প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, আর সহকারী সম্পাদক সঙ্ঘে প্রধান অরবিন্দ এবং সেই সঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি।

'ডন ম্যাগাজিন' (১৮৯৩), 'নিউ ইন্ডিয়া' (১৯০১), 'সন্ধ্যা' (১৯০৪), 'যুগান্তর' (১৯০৬), ইহাদের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা যাত্রা সুরু করিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন একটি অখন্ড প্রাণময় জীবন্ত বস্তু; আর এই সব সংবাদপত্রগুলি তাহার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। এই সংবাদপত্রগুলির যার যার নিজের বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান আবার সেই সঙ্গে ইহাদের সকলের মধ্যেই একটা যোগসূত্রও অতিশয় প্রত্যক্ষ। ভগিনী নিবেদিতা 'ডন ম্যাগাজিন', 'নিউ ইন্ডিয়া', 'যুগান্তর' প্রভৃতির সহিত প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সহিতও তিনি জড়িত ছিলেন। নিবেদিতার জীবন ইতিহাস যেমন তাহার শতাধিক অপ্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে, তেমনি এই সকল এবং ইহার পরেও 'ষ্টেটস্ম্যান', 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'কর্মযোগীন্' পত্রিকার পাতাগুলির মধ্যে লুপ্ত হইয়া আছে। কেহ উদ্ধার করেন নাই, এবং সেদিকে কোন চেষ্টাও হয় নাই। নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশের মাত্র আড়াই মাস পরেই অরবিন্দ প্রভৃতির সহিত সন্ত্রাসবাদ লইয়া মত বিরোধ হওয়ায় বিপিন পাল সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা ইংরেজ বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিল। উহা লাভের জন্য বিপিনচন্দ্র সর্বপ্রথম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance) কথা উত্থাপন করিলেন। পরে সন্ত্রাসবাদী (Terrorist) অরবিন্দও উহা সমর্থন করিলেন। বাংলার চরমপন্থী দলের স্বদেশী,— বয়কট, — জাতীয়-শিক্ষা, — শালিসী বিচার, স্বদেশী আন্দোলনের এ চারিটি প্রস্তাবও বন্দেমাতরম্ পত্রিকা

পূর্ণ সমর্থন করিল। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, University-র কোন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত তাহার আলোচনা পর্য্যন্ত করেন নাই। ভগিনী নিবেদিতা যে এই অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতি দ্বারা কতদিকে কি পরিমাণে অবহেলিতা ও উপেক্ষিতা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

১৮ই সেপ্টেম্বর বিপিন পাল "That Sinful Desire" প্রবন্ধে স্পষ্ট লিখিলেন, ইংরেজ-বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাই চরমপন্থী দলের আদর্শ। ভগিনী নিবেদিতার আদর্শও তাহাই, এ ক্ষেত্রে, ইঁহারা তিনজনেই একমত। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মডারেট-বিরোধী আদর্শ। ২০শে সেপ্টেম্বর 'Indian Mirror' এই ইংরেজ-বর্জিত আদর্শবাদীদের খোলাখুলি ভাবে "ইডিয়ট" (idiot) বলিয়া সম্ভাষণ করিল। 'বন্দেমাতরম্' তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রতি-আক্রমণ মুখে বলিল, 'ইডিয়ট' আমাদের একচেটিয়া নয়। মডারেটরাই 'ইডিয়ট'।" মডারেট ও চরমপন্থীদের বিরোধ এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজনীতির অগ্রগতিতে এইরূপ উগ্র দলাদলি অপরিহার্য্য। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ইহা বুঝিতেন; কিন্তু নিবেদিতা ইহা কম বুঝিতেন। নিবেদিতার গোখ্‌লে প্রীতি ইহার জন্য দায়ী, এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে আশঙ্কা হয়।

৯ই অক্টোবর মিঃ গোখ্‌লের বক্তৃতা 'বন্দেমাতরম্' তুলিয়া দিল। মিঃ গোখ্‌লে এই বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন যে, বিপিন পাল ও তাহার দলের সংখ্যা অতিশয় নগন্য এবং দেশবাসীর উপর তাহাদের কোনই প্রভাব নাই। ১২ই অক্টোবর 'বন্দেমাতরম্' মিঃ গোখ্‌লেকে — থুড়িয়া মুখের মত জবাব দিল। এই দলাদলি ও কটুক্তি বর্ষণ, বিশেষতঃ গোখ্‌লের বিরুদ্ধে, ভগিনী নিবেদিতার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মতে ইহা শক্তির অপচয় মাত্র। কিন্তু স্যর গুরুদাস ব্যানার্জী লিখিয়া গিয়াছেন যে, "রাজনীতি অতি গহন বিষয়।" ইহার ব্যয় আর অপব্যয়ের খতিয়ান একদিন ইতিহাস অবশ্যই করিবে।

আগামী কংগ্রেসে বন্দেমাতরম্-এর দল মিঃ তিলককে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলেন। মডারেটরা ইহার বিরোধিতা করিলেন। মডারেট শিরোমণি মিঃ গোখ্‌লেও নাকি তলে তলে বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এ সংবাদ নিবেদিতার কানে পৌঁছায় নাই, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

মিঃ সি, আর, দাশ আলিপুর বোমার মামলায় (১৯০৮-৯) 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্'-এর পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম '-এর মতবাদকে উপহাস করে। 'যুগান্তর' বলে, 'আগে জাতিকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। পরাধীন অবস্থায় জাতীয় শিক্ষা, শালিসী বিচার

এসব কিছুই চলিবে না, চলিতে পারেনা।'

মিঃ দাশের এই বিশ্লেষণ খাঁটি সত্য; কিন্তু এই দুই মতবাদের কাগজে সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী, নিবেদিতা ও অরবিন্দ সমান সহানুভূতি দেখাইয়া ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন কিরূপে তাহাই প্রশ্ন। বিপিন পাল জটিল নহেন, নিবেদিতা জটিল; এবং বেশী জটিল অরবিন্দ। ইতিহাস এখনও ইঁহাদের জটিলতার সমাধান করিতে অগ্রসর পর্য্যন্ত হয় নাই। অক্ষম স্তবস্তুতি ভিন্ন বাঙ্গালী আর বেশী কিছুই ইঁহাদিগকে দেয় নাই; তাও আবার অরবিন্দকে অবতার করিয়া যতটা দিয়াছে, নিবেদিতাকে কিছুই দেয় নাই।

'বন্দেমাতরম্' এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ মাদ্রাজ হইতে তিরুমানাচার্য্য নিবেদিতাকে তাঁহার "বালা ভারত" কাগজে সম্পাদকের ভার নিবার জন্য সাদরে ও সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিবেদিতা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কেন না, তখন তিনি সন্ত্রাসবাদী যুবকদের সিন্ ফিন্দের গুপ্ত সমিতির নিয়ম কানুন শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০০)।

ঠিক এই সময়ে (১৩ই আগষ্ট, ১৯০৬) সম্ভবতঃ নিবেদিতার পরামর্শেই বাংলার সিন্ ফিন্ অর্থাৎ যুগান্তরের দল বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য হেমচন্দ্রকে প্যারিসে পাঠাইয়াছিলেন। দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম, নিবেদিতা একই সময়ে, একই সঙ্গে বন্দেমাতরম্-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, আবার সেই সঙ্গে গুপ্ত সমিতির শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত। এই খানেই অরবিন্দের মতই তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ জটিলতাপূর্ণ। ২য়, তিনি আইরিশ সিন্ ফিন্দের কৌশলাদি (technique) সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির যুবকদের শিক্ষা দিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ ফিন্দের কার্য্য প্রণালী সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞা।

বিপিন পাল সন্ত্রাসবাদের বিরোধী কেন?

'সোনার বাংলা' নামে গুপ্ত সমিতির একখানি প্রচারপত্র (সম্ভবতঃ প্রথম প্রচারপত্র) মেদিনীপুরে সত্যেন বসুর নির্দেশক্রমে ক্ষুদিরাম বসু দ্বারা একটি সভায় প্রথম বিলি করা হয়। 'পাইওনীয়ার' পত্রিকা ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে। রাজনৈতিক কারণে ইহাতে গুপ্ত হত্যার সমর্থন ছিল। ইহা তখনকার দিনে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ৩রা অক্টোবর বিপিনচন্দ্র পাল এই 'সোনার বাংলা' সম্পর্কে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখিলেন যে, পাগলা গারদের বাহিরে যে সকল পাগল আছে কেবল তাহারা ভিন্ন এইরূপ গুপ্ত হত্যা বা বৈপ্লবিক ডাকাতি বর্ত্তমান অবস্থায়

কেহ সমর্থন করিবে না। বিপিনবাবু খোলাখুলি 'lunatic' কথাটি ব্যবহার করিলেন। ("No one outside a lunatic asylum will ever think of or counsel any violent or unlawful methods in India, in her present helplesness for the attainment of her civil freedom." (Golden Bengal scare— 3rd october, 1906 — Bipinchandra Paul)

অরবিন্দ জুন মাসে ফুলার বধের জন্য বারীন্দ্র কুমারকে শ্বশুরের নিকট চিঠি লিখিয়া শিলং পাঠাইয়াছেন। আর নিবেদিতা মাদ্রাজে "বালা ভারত" পত্রিকার সম্পাদক হইবার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া কলিকাতায় অরবিন্দ প্রবর্ত্তিত গুপ্ত সমিতির যুবকদের আইরিশ সিন্ ফিন্‌দের অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আর হেমচন্দ্রকে বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য প্যারিসে পাঠানো হইয়াছে। তিনি প্যারিসে তৈয়ারী অনেকটা শিখিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং অরবিন্দ বিপিন পালের এইরূপ লেখার প্রতিবাদ না করিয়া পারিলেন না। তিনি বলিলেন 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক সঙ্ঘে কেহ কেহ যখন সন্ত্রাসবাদের সমর্থনকারী আছেন, তখন ঐ পত্রিকায় প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লিখিলে অরবিন্দ প্রভৃতি সম্পাদক সঙ্গে থাকেন কি করিয়া। বটেই তো। ফলে বিপিন পাল সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলেন।

১৯২০, জুলাই মাসে এলাহাবাদের 'Democrat' পত্রে বিপিনবাবু লিখিলেন ঃ (বাংলা অনুবাদ)

"আমি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "বন্দেমাতরম্" পত্রের সম্পাদক ছিলাম। 'পাইও-নীয়ার' তখন 'সোনার বাংলা' নামক একখানি গোপনে প্রচারিত পুস্তিকার সন্ধান পান। **** তাহাতে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে কোনরূপ গুপ্তহত্যা সমর্থিত হইয়াছিল। আমি এই গুপ্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ নিন্দা করি এবং বলি ইহা কাপুরুষোচিত— ইহাতে জাতীয় দলের অনুষ্ঠানের মেরুদন্ড ভগ্ন হইতে পারে। আমাদের "বন্দেমাতরম্"-র লোকদের মধ্যে (Some members of our staff) ইহাতে অসন্তোষের সম্ভব হয়। *** "বন্দেমাতরম"র সহিত আমার সম্বন্ধচ্ছেদের তাহাই কারণ।"

বিপিন পাল রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যাকে বলিলেন, (১) ইহা কাপুরুষের কাজ, (২) ইহা চরমপন্থী দলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া জাতির মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিবে; (৩) আমাদের নিরস্ত্র ও অসহায় অবস্থায় যখন প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব নয়, তখন রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা অসমীচীন। লক্ষ্য করিতে হইবে, বিপিন পাল অহিংসার কোন অজুহাত তুলিলেন না। 'Non-Violence'-এর কোন দোহাইও দিলেন না। রাজা রামমোহন লিখিয়াছেন ('ব্রাহ্মণে-

সেবধি' — ১৮২১) — "আমাদের পরাধীনতার কারণ, হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও জাতিভেদ, যাহা সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যতার মূল হয়।" পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য হিংসা ত্যাগ করিবে না, ইহাই রামমোহনের অতিশয় সুস্পষ্ট অভিমত। কিন্তু বিপিনবাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিবেদিতা ও অরবিন্দ দুই জনেই পাগলা গারদের বাহিরে পাগল মাত্র। ইহা 'Indian Mirror' এর 'Idiot' বলা অপেক্ষাও অধিকতর তীব্র কষাঘাতপূর্ণ কঠোর সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার একটি গান মনে পড়িতেছে —

"যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে গায়ে ছুঁড়ে ধুলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে ছুটবেরে তোর পিছু পিছু।।"

নিবেদিতা ও অরবিন্দ সম্পর্কে রবান্দ্রনাথের গানটি কি সার্থক হয় নাই?

অরবিন্দের কলিকাতা আগমন

১৯০৬, ৭ই আগষ্ট অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক সঙ্ঘে যোগ দিলেন এবং ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। 'বন্দেমাতরম্' এর সম্পাদকের কাজের জন্য কোন বেতন ছিল না। আর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদের জন্য মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হইল। বরোদায় কলেজে অধ্যাপনার জন্য তিনি মাসে সাড়ে সাতশ টাকা বেতন পাইতেন। মাসে পঞ্চাশ টাকায় তিনি নিজে ও তাঁহার সংসার চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিবেদিতা ১৯০২, অক্টোবরে বরোদায় অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়েই অরবিন্দকে বাংলা দেশে কলিকাতায় আসিয়া কাজ করিবার প্রস্তাব করেন। অরবিন্দ তখন পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করিবেন, এই কথা বলিয়া নিবেদিতার কথায় রাজী হন নাই। এক্ষণে তিন বৎসর নয় মাস পরে নিবেদিতার প্রস্তাব অনুসারেই অরবিন্দ বরোদা ছাড়িয়া কলিকাতা আসিলেন। অরবিন্দ বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন তাঁহাকে বাংলায় টানিয়াছে — Swadesi began and I was drawn into the public field"। ৭ই ও ১৫ই আগষ্টে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অরবিন্দকে দিবালোকে স্পষ্ট দেখা যাইবে। কিন্তু ইহা ছাড়া একটা অন্ধকারের রাজনীতি আছে, সেখানে অরবিন্দ ও নিবেদিতাকে একত্রে দেখিতে হইবে। উহা আইরিশ সিন্ ফিন্ মতাবলম্বী গুপ্ত সমিতির রাজনীতি। অরবিন্দ সিন্ ফিন্ মতাবলম্বী ছিলেন কি না? ইহার ডত্তর মিঃ নেভিন্সন দিয়াছেন।* সুতরাং গুপ্ত সমিতির কার্য্যে

* "Arabindo's purpose, as he explained it to me, was the Irish policy of Sinn Finn." (The New Spirit in India, Mr. Nevinson, pp. 221)

আমরা নিবেদিতা ও অরবিন্দ উভয়কেই আইরিশ সিন্ ফিন্ মতাবলম্বী দেখিতে পাই। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯০৮) ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন যে, চরমপন্থীরা আইরিশ সিন্ ফিন্ এর উপর ভিত্তি করিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পাঁচ বৎসরেরও অল্পকাল মধ্যে আমরা বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় দেখিতে পাই তিনটি ধারা সমান প্রবাহিত হইতেছে —

১ম। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী — আদর্শ, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন, — উপায়, আবেদন-নিবেদন নীতি।

২য়। বিপিনচন্দ্র পাল — আদর্শ, ইংরেজ-বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা, — উপায়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)।

৩য়। নিবেদিতা ও অরবিন্দ — আদর্শ, ইংরেজ-বর্জিত স্বাধীনতা, — উপায়, পর পর সন্ত্রাসবাদ, গেরিলা যুদ্ধ, শেষে — (সৈন্য ভাঙ্গাইয়া আনিয়া) সশস্ত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহ। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের সহিত বাঙ্গালীর এই আন্দোলনের কোনই সংস্রব ছিল না। বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা কিন্তু এই আন্দেলনের সহিত শুধু জড়িত নহেন, ইহার মধ্যে অতিশয় সংঘাতিক যে ধারা, তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন। বিনা কারণে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও বেলুড় মঠের অপরাপর সন্ন্যাসীরা বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতাকে বিষধর সর্পের মত পরিত্যাগ করেন নাই। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা শুধু দ্রষ্টা, আর নিবেদিতা এই অগ্নি যুগের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ধারার একজন প্রধান স্রষ্টা। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুভাই শিষ্য সন্ন্যাসীরা নিবেদিতার উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে না। শিব বিষপান করিতে পারে অন্য দেবতারা পারে না।

মিঃ গোখ্‌লে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক চিঠি পাইলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। নিবেদিতা এই চিঠির কথা জানিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী যুবকদের একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তুমি কি ইহা করিয়াছ? আমি সম্ভব মনে করি না। এখন যে সময়, তাতে নিজেদের মধ্যে এইরূপ খুনাখুনি করা উচিত হইবে না।" (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৪)

মিঃ গোখ্‌লে বিপিন পালকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং বাংলার জাতীয় দলকে নগণ্য ও তুচ্ছ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। জাতীয় দলের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীরা কিন্তু আর যাই হউক, উপহাসের বস্তু নয়। নিবেদিতার যেমন গোখ্‌লে প্রীতি আছে, অরবিন্দের তেমনি গোখ্‌লে বিদ্বেষ আছে। সুতরাং, অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, যুগান্তরের আড্ডা হইতেই মিঃ গোখ্‌লে আচমকা এইরূপ চিঠি পাইয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিবেদিতাকে এ সংবাদ জানাইয়াছিলেন।

মিঃ গোখ্‌লে নিবেদিতার বিরোধী দল হইলেও তাঁহার বন্ধু ছিলেন। নিবেদিতা প্রকাশ্যে যখনই গোখ্‌লের বিরোধিতা করিয়াছেন, আবার তখনই বাড়ী ফিরিয়াই গোখ্‌লের নিকট ক্ষমা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। গোখ্‌লে সম্পর্কে এই দুর্বলতা বরাবর তাঁহার ছিল। (She had this whim in respect of Gokhale, ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৪)। মিঃ গোখ্‌লের পরম শত্রুরা তাঁহাকে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের গোয়েন্দা বলিয়া (spy) প্রচার করিত। কথাটা নির্জলা মিথ্যা।

পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে নিবেদিতা

বিপিন পাল ও অরবিন্দ যখন সন্ত্রাসবাদ লইয়া 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় মাতামাতি করিতেছেন, নিবেদিতা তখন বন্যা-প্লাবিত বরিশালে এক হাঁটু জল ও কাদার মধ্য দিয়া কোনক্রমে পথ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গরীব মুসলমান পল্লীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ("The land of the waterways" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। মিঃ নেভিন্‌সন নিবেদিতাকে বলিয়াছেন "আগুন" — Something flame — like about her and not only her language but her whole vital personality often reminded me of fire."

নেভিন্‌সন মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে তাঁহার যে করুণাময়ী মূর্ত্তি আমাদের মনের সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, তাহাতে স্বামী বিবেকানন্দের কথাই মনে পড়ে যে, নিবেদিতার মধ্যে বহু ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুমূর্ষু নারী ও শিশুদের দেখিয়া নিবেদিতা নিজের মনে বলিয়া উঠিলেন "Hunger so keen, ah God! so keen!" কিন্তু শুধু মেয়েলি করুণা ও নিরুপায়ের হু হুতাশ আমরা তাঁহার মধ্যে পাই না। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তিনি এমন অনেক সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্বে এমন করিয়া আমরা শুনি নাই। বন্যা-প্লাবিত পূর্ববঙ্গের ছবি এবং অনশন পীড়িত মুমূর্ষু নরনারী ও শিশুর কথা এমনভাবে লিখিয়াছেন, যেন ছবির মত সম্মুখে দেখা যায়। ইংরেজী ভাষায় এমন লেখা আর দেখি না।

তিনি শরৎকালের রূপ-প্লাবিত পূর্ববঙ্গকে "Venice" অথবা "Tropical Holland" বলিয়া অভিহিত করিলেন। খুলনা হইতে নদীপথে তিনি বরিশাল গিয়াছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর আমরা তাঁহাকে বরিশালে দেখিতে পাই। প্রভাতে তিনি দেখিলেন যে জলের উপর কত শত জলপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, "কহ্লার ভরা সরসী"। "It was dawn of the 8th September, one of those dawns of pearl and opal that come to us in the Indian Autumn. The water lilies lay open still, as they had lain all night long on the surface of the water."

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "হাজার বছরের সভ্যতা এক দুর্ভিক্ষেই ধ্বংস হইতে পারে। দুর্ভিক্ষ সমাজের পক্ষাঘাত স্বরূপ। দুর্ভিক্ষ সমাজে সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা আনে। ইহা শুধু ক্ষধা নয়, দেহের নগ্নতা, রাত্রির ভীষণ অন্ধকার, অজ্ঞান মুমূর্ষুদের আর্ত্তনাদ। আরও কত আছে।"*

তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে ভিক্ষুক আর কোটিপতি দুইটি যমজ ভাই। "The beggar is spiritually twin brother to the millionaire." — সমাজে কোটিপতি ভিক্ষুককে সম্ভব করে, আবার ভিক্ষুকই কোটিপতিকে জন্ম দেয়। ইহা একালের অগ্নিমুখো কমিউনিজমের কথা। আমাদের দেশে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে নিবেদিতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতার সিদ্ধান্ত এই, শুধু এক বৎসরের অজন্মাতে দুর্ভিক্ষ হয় না। পর পর বহু বৎসর ধরিয়া অল্প অল্প অজন্মা হইলে, তবে দুর্ভিক্ষ হয়। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, এমন এক বাড়ীতে গেলাম যে বাড়ীর একটি ছেলে ভিক্ষা করিয়া চারিটি চাউল আনিতে গিয়াছে। যদি না পায় তবে সব শুদ্ধ না খাইয়া মরিতে হইবে। "They would have nothing to cook that day, unless he should return with rice. Men are living like birds than human beings." বন্যা ও প্লাবন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়াকে দ্বিগুণ ভয়াবহ করিয়াছে। "Floods doubling the disaster created by famine."

পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ হইতে কলিকাতা ফিরিয়া নিবেদিতা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তথাপি পুনরায় তিনি শীতকালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে গিয়া মস্তিষ্কের প্রদাহসহ জ্বর (Cerebral fever) লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া দীর্ঘকাল ভুগিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতেই নিবেদিতা ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন। কেন না, ঐ সম্পূর্ণ বৎসরটি তিনি লন্ডনে রমেশচন্দ্র দত্তের সাহচর্য্যের অবাধ এবং প্রচুর সুযোগ পাইয়াছিলেন।

নিবেদিতার পীড়া ও অবসাদ

মিঃ র‍্যাটক্লিফ লিখিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়াই নিবেদিতা প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময়টা পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। মিঃ র‍্যাটক্লিফ কিন্তু উড়িষ্যার কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। ইহা তাঁহার অসাবধানতার ফল। কিন্তু ফরাসী জীবন চরিতে (পৃঃ ২৯৯) বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট

* "Famine is a social paralysis. Famine involves social disorganisation. Famine is many things besides hunger. Hunger so keen, ah God! so keen! But it is more than this as we have already seen nakedness, darkness of nightfall, ignorance etc."

ভাবে লিখিত আছে যে, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ হইতে কলিকাতা ফিরিয়াই তাঁহার জ্বর হয়। প্রথমে উহা ম্যালেরিয়া বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল পরে দেখা গেল যে উহা মস্তিষ্কের প্রদাহ জনিত জ্বর। ডাক্তার তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলিল এবং চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাগান বাড়ীতে আনা হইল। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৯৯)।

সুতরাং দেখিতেছি যে তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যেমন একবার মাত্র পীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি দুই দুইবার প্রবল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। ইহার ফলে কেবল তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল না, মনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার মনে হতাশা ও অবসাদ আসিল। মিঃ র‍্যাটক্লিফ লিখিয়াছেন — "The terrible strain of these two illnesses broke down her magnificent constitution and physically she was never the same again."। ফরাসী জীবন চরিতে (পৃঃ ২৯৯) আছে — "Nivedita did not seem to be the same woman."

নিবেদিতার জীবন ইতিহাসের পাতায় ইহা এক অতি মর্মান্তিক শোচনীয় দুর্ঘটনা বলিয়া লেখা থাকিবে।

এই তেজস্বিনী মহিলার মন এত ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন? ব্যাধি কি ইহার একমাত্র কারণ? মনে হয় না। তাঁহার এই সময়ের মানসিক বিপর্য্যয়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা এক দুরূহ ব্যাপার। দমদমের বাগান বাড়ীতে রুগ্ন শয্যায় শায়িত অবস্থায় বৃক্ষগুলির মধ্য দিয়া যেন কি এক কান্নার সুরে বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। মৃত্যুর ক্রন্দনধ্বনি বলিয়াই তিনি ইহা অনুভব করিলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উড়িষ্যার সন্তানেরা আর্ত্তনাদ করিয়া পেট চাপড়াইতেছে, ইহা তিনি শুনিলেন। গোপালের মা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন, এবং কিছুদিন পূর্বে যাঁহার মৃত্যুশয্যায় ও গঙ্গাযাত্রার সময় নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন, সেই গোপালের মার কণ্ঠস্বর তাঁহার কানে আসিল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার শক্তি চলিয়া যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, তিনি মা কালীর সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। "Mother what is thy will? How many times again, mother, should I have to fight?" — "যদি ইচ্ছা কর আমাকে বজ্রের শক্তি দাও।" কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া তিনি এই ভাবে কাটাইলেন। পরে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে আসিলেন। নিবেদিতার জীবনেও এইরূপ হতাশা ও অবসাদ আসে।

কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেস (১৯০৬, ডিসেম্বর)

কাশী কংগ্রেসে নিবেদিতা যেরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবার

কলিকাতায় তাহা পারিলেন না। কেন না, কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তিনি দমদমের বাগানে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন। চৌরঙ্গীর উপর এলগিন্ রোডের দক্ষিণে কংগ্রেসের মন্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরজী সভাপতি। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাঁহার অভিভাষণের পর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ মন্তব্য লিখিলেন, "ব্যাঘ্র বিড়ালের মত মিউ মিউ করিয়াছে। ("The tiger muses.")। দাদাভাই বলিলেন, "কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বরাজ লাভ।" মডারেটরা বলিল, "স্বরাজ অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন।" বিপিন পাল, তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীরা বলিলেন, "তা হবে কেন, ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা।" এইবারে বিপিন পাল বয়কট প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন ইহা শুধু নুন, চিনি, কাপড় বয়কট নয়, ইহা বিদেশী গভর্ণমেন্ট বয়কট বুঝায়। মিঃ গোখ্‌লে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্‌মের সম্মুখে আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, এই বয়কট প্রস্তাবের সহিত "আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। (We have nothing to do with this resolution, we dissociate ourselves from it.") একেবারে সাক্ষাৎ ইংরেজ গভর্ণমেন্ট বয়কট, এ অতি প্রলয়ঙ্কর কথা। স্যর ফিরোজ শাহ মেহতা সভায় উপস্থিত ছিলেন, এ কথা শুনিয়া তাঁহার মনের ভাব বর্ণনার অতীত। মিঃ সি, আর, দাশ ডেলিগেট হিসাবে এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। মিঃ মেহতার সহিত চরমপন্থীদের সংঘর্ষ হয়। বিপিন পাল বাংলার চরমপন্থীদের লইয়া বিষয় নির্বাচনী সভা হইতে মিঃ সি, আর, দাশের বাড়ীতে চলিয়া আইসেন। মিঃ তিলক আধঘণ্টা পরে আসিয়া বলিলেন, "আমি সব ঠিকমত করিয়া আসিয়াছি। দাদাভাই স্বরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু মিঃ মেহেতো ও মিঃ গোখ্‌লে এই স্বরাজের প্রস্তাবটি পছন্দ করেন নাই।"

নিবেদিতা দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাগানেই আছেন। গোখ্‌লে রাত্রির পর রাত্রি তাঁহার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বরফ ভাঙ্গিয়া নিবেদিতার মাথায় দিতেছেন, এবং কংগ্রেস সভ্যদের মধ্য হইতে নিবেদিতার চিকিৎসার জন্য চাঁদা তুলিতেছেন। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০০)।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কেন না, স্বামী বিবেকানন্দ তো আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু কলিকাতায় বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ বলিয়া তো একটা কিছু ছিল। মুমূর্ষু ভগিনী নিবেদিতার চিকিৎসার জন্য ভিন্ প্রদেশের কংগ্রেসী সভ্যদের নিকট গোখ্‌লের হাত পাতিয়া চাঁদা ভিক্ষা — বাঙ্গালীর ললাটের এই কলঙ্ক হয়তো আজ কালস্রোতে ধুইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে গভীর ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে, তাহার দাগ মিলায় নাই।

কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসের পরে

ভগিনী নিবেদিতা দমদমে মিঃ আনন্দমোহন বসর বাগানবাড়ীতে রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়া প্রতি রাত্রে নৌরজী কংগ্রেসের সমস্ত খবর মিঃ গোখ্‌লের নিকট হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন। মিঃ গোখ্‌লে দিনে কংগ্রেসের কাজ করিতেন। আর রাত্রির পর রাত্রিতে ("Several night") নিবেদিতার রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। সুতরাং কংগ্রেসের খবর নিবেদিতার কিছুই অবিদিত ছিলনা।

নিবেদিতা সমস্ত কংগ্রেসকেই একটা দলে পরিণত হইতে বলিয়াছিলেন। কাশী কংগ্রেসের পর নৌরজী কংগ্রেসে দেখা গেল যে, তাহা সম্ভবপর নয়। বাংলার 'বয়কট' প্রস্তাব এক লোকমান্য তিলক ছাড়া ভারতের অন্য প্রদেশের কোন নেতাই সমর্থন করিলেন না। মদন মোহন মালব্য প্রতিবাদ করিলেন। মিঃ গোখ্‌লে মঞ্চের সামনে লাফাইয়া আসিয়া দুই হাত কাঁপাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বিপিন পালের ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে 'বয়কট' প্রস্তাবের সহিত আমাদের কোনই সংস্রব নাই।" মাদ্রাজের গোবিন্দ রাঘব, মিঃ মেহেতার পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া সমগ্র মাদ্রাজের পক্ষ হইতে বয়কটের প্রতিবাদ জানাইলেন। মিঃ মেহতার সহিত মিঃ তিলকের বেশ বচসা হইয়া গেল। ফলে, মিঃ মেহেতা টিফিনের পর আর কংগ্রেসে আসিলেন না। এমন যে পাঞ্জাবকেশরী লাজপৎ তিনিও পাঞ্জাবীদের মনোভাব বুঝিয়া কিছুটা পিছু হটিলেন। মিঃ তিলক, বিপিন পাল, অরবিন্দ,, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মতিলাল ঘোষ, খাপার্দ্দে বিষয় নির্দ্ধারণ সমিতি ছাড়িয়া জটলা করিতে লাগিলেন। মিঃ সি, আর, দাশ শুধু ডেলিগেট হিসাবে এই কংগ্রেসে সম্ভবতঃ প্রথম যোগদান করিয়াছিলেন। সমগ্র কংগ্রেসে একটি দল হওয়া নিবেদিতার কল্পনা; — হয়তো একটা আদর্শ, কিন্তু বাস্তব নয়।

মিঃ তিলক বলিয়াছেন, " স্বদেশী দ্বারা বাংলা সমস্ত ভারতবর্ষের নেতৃত্ব করিতেছে — Bengal : the leader of all India"। ইহার এক বৎসর পরে অরবিন্দ ১৯০৮, ১৯শে জানুয়ারী বোম্বাইতে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন — "Bengal has come forward as the saviour of India."। বাংলা নেতৃত্ব করিতেছে সত্য, কিন্তু অন্য কোন প্রদেশ তাহার নেতৃত্ব মানিতেছে না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ বিচিত্র; এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান নিবেদিতা পাইয়াছেন, তাহাও একটা আদর্শ। রাজনীতি ক্ষেত্রে উহা বাস্তবরূপ গ্রহণ করে নাই। এই বৈচিত্র্য বিরোধের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নৌরজী কংগ্রেসে ইহা প্রত্যক্ষ। পরবর্ত্তী সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) এই বিরোধ দক্ষযজ্ঞের প্রলয়কান্ডে পর্য্যবসিত হইবে। নিবেদিতা তখন পুলিশের দৌরাত্ম্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাইবেন।

হিন্দু মুসলমান বিরোধের ব্যাপারে এই কংগ্রেসের সময় ঢাকায় নবাব ছলিমুল্লার প্রাসাদে মুসলীম লীগ ভূমিষ্ঠ হইল। একচল্লিশ বৎসর পরে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ইহা দ্বিখন্ডিত করিবে। নিবেদিতার অখন্ড ভারতের আদর্শ রক্তাক্ত হইয়া ভূমিস্যাৎ হইবে। সে রক্তের দাগ ইতিহাস কবে মুছিয়া ফেলিবে, বা ফেলিবে কিনা, কেহ জানে না।

The Master as I saw Him : আমার গুরুকে আমি যেমন দেখিয়াছি

দীর্ঘ ছয় বৎসর চেষ্টার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে নিবেদিতা এই গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত করিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লন্ডন হইতে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্র, তাঁহার কাগজপত্র, তাঁহার ভবিষ্যত কার্য্যের পরিকল্পনা, তাঁহার কবিতা (his letters, his papers, his projects of work, his poems) এই সমস্তই নিবেদিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়? যখনই তিনি লিখিতে গিয়াছেন তখনই চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছে। এই সামান্য ঘটনাতেই গুরুর প্রতি তাহার মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই তেজস্বিনী মহিলা তাহার মনের আবেগকে সামলাইতে পারেন নাই। অনেক চেষ্টার পর তিনি শান্ত হইয়া নিজের মনকে দর্পণ স্বরূপ মনে করিলেন। এবং সেই দর্পণে তাহার গুরুর প্রশান্ত মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল ("became a mirror in which reflected the serene face of the Guru.")।

নিবেদিতাকে প্রসঙ্গত সংক্ষেপে আরও দুই-চারিজন খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন চরিত লিখিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এরূপ ঐক্যন্তিক নিষ্ঠার সহিত এরূপ বৃহদাকারের জীবন চরিত আর কাহারও তিনি লেখেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি কথা, প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি পদক্ষেপ শুধু চক্ষু দিয়া নয়, মন দিয়া তিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, জীবনকে বিশ্লেষণ করিবার যে বিচক্ষণতা ও নিপুণতা তাঁহার লেখনীমুখে ছবি আঁকিয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। এক Mr. Nevinson ছাড়া কেহ ইংরেজী ভাষায় লেখনীমুখে এরূপ ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

Mr. S. K. Ratcliffe নিবেদিতার অতিশয় গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে গিয়া বক্তা হিসাবে এবং লেখিকা হিসাবে নিবেদিতাকে তুলনা করিয়াছেন। আমরা সে তুলনা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমাদের ধারণা, বক্তা অপেক্ষা লেখিকা হিসাবেই তাঁহার কৃতিত্বের বেশী পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

তাছাড়া, তাঁর বক্তৃতা অবেগের মুখে এত উচ্চস্তরে উঠিয়া যাইত যে, শ্রোতারা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিত না।

স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতাকে যে ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা যেরূপ প্রভাবান্বিতা হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং একদিকে ইহা যেমন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ইতিহাস, আবার অন্যদিকে ইহা ভগিনী নিবেদিতারও জীবন স্মৃতি।

১৮৯৫ নভেম্বর হইতে ১৯০২, ৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত প্রায় সাত বছর নিবেদিতা বিবেকানন্দের সংস্পর্শে ছিলেন। এই সাত বছরে সর্বদাই তিনি বিবেকানন্দের শুধু কাছেই থাকেন নাই। বিবেকানন্দের সহিত তিনি উত্তর ভারতে ও জলপথে একাদিক্রমে ছয় সপ্তাহ ভারত হইতে ইংল্যান্ডে জাহাজে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময় যে সকল কথোপকথন হইয়াছে, তাহা অতিশয় মূল্যবান। এই গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছেন— (ক) বেদান্তের পর পর তিনটি ধারা। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও সর্বশেষ অদ্বৈতবাদ। এই সর্বশেষ ধাপে পরমাত্মা একটি পারমার্থিক সত্ত্বা মাত্র (One Impersonal Absolute)। ইহাতে এই দৃশ্যমান জগৎ নাই, জীবাত্মা নাই। দেবদেবী বা কোন অবতার নাই। ইহা শঙ্করানুগামী অদ্বৈতবেদান্ত। রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই এই শঙ্করানুগামী অদ্বৈতবেদান্তই প্রচার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলিয়াছেন যে, এই বেদান্ত সম্পর্কে তিনি রাজা রামমোহনের নিকট ঋণী। অরবিন্দের সহিত বরোদায় সাক্ষাৎকালে (১৯০২, অক্টোবর) আমরা দেখিয়াছি যে, অরবিন্দ এই শঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করিতেন না, নিবেদিতা করিতেন। বেদান্তে নিবেদিতা মায়াবাদী, আর অরবিন্দ রামানুজপন্থী লীলাবাদী। (খ) বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে "Aggressive Hinduism"-এর কথা শিখাইয়াছেন। তার অর্থ, হিন্দু ধর্ম, অপর ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে স্বামিজী বা নিবেদিতার এই চেষ্টা কিছুমাত্র কার্য্যে প্রয়োগ করা হয় নাই। (গ) বিবেকানন্দ একটা আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে প্রচার করেন নাই ("I preach Principle, not Personality.")। স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী মঠে শ্রীরামকৃষ্ণে ফোটো বা মূর্ত্তি পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশরাবতাররূপে

প্রচার করিতে, আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর; একমাত্র আমি ঐ রূপ প্রচারের বিরোধী।" (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৪৭৯)।

অনেকের মতে এই গ্রন্থখানিই নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কিন্তু আমাদেব ধারণা, "The Web of Indian Life" শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বর্ত্তমান আলোচ্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু বহুলাংশে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর The Web of Indian Life গ্রন্থের বিষয়বস্তু অতি বিচিত্র, অতি ব্যাপক, বহু সভ্যতার ইতিহাস ও সমাজ জীবনের অতি নিপুণ বিশ্লেষণ।*

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৭৮)

ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠ হইতে বিছিন্ন হইলেও তিনি নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের (R. K. V) আশ্রিতা বলিয়া সর্বদাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহার কর্মজীবনে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সহিতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কর্মরত দেখিতে পাই। তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মদের নয়, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রধান শিষ্যদেরও দেখিতে পাই। তাঁহার কর্ম জীবন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা। স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষাও তাঁহার কর্মক্ষেত্র এদেশে অধিকতর প্রশস্ত ও বহুদিকে বিস্তৃত ছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিশ বৎসর পরে ভগিনী নিবেদিতা প্রথম কলিকাতা আসেন। এবং কলিকাতা আসিবার মাত্র তিন মাস পরে নৈনিতাল পাহাড় ও আলমোড়াতে রাজা রামমোহন সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী বলেন— তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে তিনিটি গ্রহণ করিয়াছেন। (১) বেদান্ত (২) স্বদেশ প্রেম (৩) হিন্দু ও মুসলমানে সমান প্রীতি।**

---

* আমার সহপাঠি বেলুড় মঠের সেক্রেটারী স্বামী মাধবানন্দ প্রথম জীবনে The Master as I Saw Him গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। উঃ। "উদ্বোধন" পত্রিকায় ধারাবাহিক-রূপে ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু গত ৪৩ বৎসর মধ্যে এত বড় একখানি মূল্যবান গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল না কেন, তাহার গূঢ় রহস্য আমরা জানি না। প্রতি বৎসর উদ্বোধন অফিস হইতে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তার সবগুলিই বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে এমন কেহই বলিবেন না। সুখের বিষয়, অতি সম্প্রতি এহ অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে। -- লেখক

** "It was here, too that we heard a long talk on Ram Mohun Roy in which he pointed out three things as the dominant notcs of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohun Roy had mapped out." (Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda, p. 12)

ইহা ১৮৯৮, মে মাসের ঘটনা; স্থান — হিমালয় পর্বত। বক্তা বিবেকানন্দ; শ্রোতা নিবেদিতা।

অন্যত্র রাজা রামমোহনকে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশে যুগ প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ রামমোহন হইতেই আমাদের দেশে মধ্যযুগের পর বর্ত্তমান যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন, "He is the first begotten of our illumination."। নিবেদিতা ব্রজেন্দ্রনাথের নিকট হইতেও রামমোহন সম্বন্ধে একথা শুনিয়া থাকিবেন। সুতরাং এদেশে পদার্পণ করার পরেই ভগিনী নিবেদিতা রাজা রামমোহন সম্পর্কে অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহারও তিনি নিজের জীবনে করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন ১৮২৮, ২০শে আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) কমলালোচন বসুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরিচালনাধীনে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ বিবর্ত্তন ও বিকাশের মুখে পঞ্চাশ বৎসর পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপনীত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, এবং সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও নিবেদিতাকে বলিয়াছেন যে, এখনও তাঁহার নাম ব্রাহ্মসমাজের খাতায় আছে, অবশ্য ব্রাহ্মগণ যদি উহা মুছিয়া ফেলিয়া না থাকেন তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত বলিয়াই দাবী করিতেন।*

প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথম যৌবনে একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময়েও তিনি একজন নেতৃস্থানীয় প্রখর ব্যক্তিত্বশালী ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরেও আট বৎসর (১৮৮৬) তিনি ঐ সমাজভুক্তই ছিলেন। পরে তাঁহার জীবনের শেষ চৌদ্দ বৎসর অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৯০০) বৈষ্ণব ধর্মের অবতাররূপে তাঁহার ভক্তমন্ডলীদ্বারা পূজিত হন। নিবেদিতা আমাদের দেশে আসিবার পর শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ তিনি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। নিবেদিতা যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দের সঙ্গে গিয়া দর্শন করিয়াছিলেন,

---

* "... first sulfilment in his youthful membership of the Sadharan Brahmo Samaj. And he was so far from repudiating this membership. That he one day exclaimed — It is for them to say whether I belong to them or not! Unless they have removed it, my name stands on their book to this day!' The Master as I saw Him, p. 305.

তেমনি শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণকেও দর্শন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কোন উল্লেখ দেখি না।

বিপিনচন্দ্র পাল ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য হন। ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য। অশ্বিনীকুমার দত্তও তাই। ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা কর্মক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

তাছাড়া, বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক দীনেশচন্দ্র সেন, ইঁহাদের দুইজনকেও নিবেদিতা পরামর্শ ও লেখা দ্বারা কম সাহায্য করেন নাই। ইঁহারা উভয়েই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য ইঁহারা দুইজন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না। দুই জনেই হিন্দু সমাজের লোক।

এখন বাকী রহিলেন এক শ্রীঅরবিন্দ। তিনি রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। সুতরাং, তিনপুরুষে ব্রাহ্ম। অথচ শৈশব হইতে বিলাতে (Cambridge) চৌদ্দ বৎসর থাকিয়া দেশে ফিরিবার পরেই (১৮৯৪, ২৭শে আগষ্ট) 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় বঙ্কিমপ্রসঙ্গে খোলাখুলিভাবে তিনি লিখিলেন যে, আমাদের দেশ ও জাতিকে দুইটি জিনিষের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ১ম, বিজাতীয় কংগ্রেস, ২য়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। কেন না ইহাদের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ আদৌ নির্ভর করে না। ("The future lies not with Indian unnational Congress or the Sadharan Brahmo Samaj.") বেচারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ! ভগিনী নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি ক্ষেত্রে অরবিন্দের সহিতই সর্বাপেক্ষা বেশী জড়িত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দ হইতে ভিন্নমত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, দেশকে নিয়মতন্ত্র প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল, যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মধ্যে সকল সভ্যই তাহার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারিবে এবং নেতা ও সভ্যদিগকে সমানভাবে ঐ নিয়মতন্ত্র মানিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ নাগরিক জীবন ও নাগরিক আদর্শের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে অতিশয় প্রয়োজন। (ভগিনী নিবেদিতা লিখিত আনন্দমোহন বসুর জীবন চরিতের বঙ্গানুবাদ)।

ভগিনী নিবেদিতা আরও একটি কথা লিখিতে পরিতেন যে, কংগ্রেস ভূমিষ্ঠ হইবার সাত বৎসর পূর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দেশ ও জাতিকে নিয়মতন্ত্র প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা কম গৌরব ও গর্বের কথা নয়।

নাগরিক জীবনের আদর্শ

রাজা রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সন্ন্যাস ছাড়িয়া গার্হস্থ্যের প্রতি আমাদিগকে অধিকতর মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। এবং "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ" হইয়া উন্নততর সমাজ জীবন যাপন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। — (ক) লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট চিঠি, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ (খ) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ। ভগিনী নিবেদিতাও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আমাদিগকে নাগরিক জীবনের এক অতি উচ্চ আদর্শ দিয়া গিয়ছেন, যাহা তৎকালে অপর কোন নেতা দেন নাই। (Civic and National Ideals গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। তিনি লিখিয়াছেন, উত্তম নাগরিক না হইতে পারিলে উত্তম জাতীয়তাবাদী হওয়া যাইবে না। সুতরাং, জাতীয়তাবাদী হইবার জন্যই উত্তম নাগরিক হওয়া প্রয়োজন। (Cities are the Schools of nationality)। একজন ঝাড়ুদার যদি তাহার কর্ত্তব্য উত্তমরূপে করে, আর একজন ব্রাহ্মণ যদি তাহার কর্ত্তব্য না করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, ঝাড়ুদার শ্রেষ্ঠ নাগরিক। একজন ব্যক্তির যেমন তাহার জাতি ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তাহা অপেক্ষা ঐ ব্যক্তি যে নগরে বাস করে, সেই নগরের প্রতি বেশী কর্ত্তব্য আছে। তুলনায় নাগরিকের কর্ত্তব্যকে (duties of citzenship) বড় স্থান দিয়াছেন। কোন নগরকে তিনি কেবল কতকগুলি ঘর-বাড়ীর সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করেন নাই। প্রত্যেক নগরকে তিনি একটি জীবন্ত প্রাণীর বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন। ("The city is something more than the aggregate of all homes that compose it. We should think of our city as a being, a personality sacred beautiful, and beloved.") রামমোহনের অযোধ্যানগরী লঙ্কানগরী হইতে পৃথক। বর্ত্তমান ভারতে লক্ষ্ণৌ কলিকাতা হইতে, বোম্বাই কাশী হইতে, দিল্লী আমেদাবাদ হইতে, অমৃতসর প্যারিস অথবা রোম হইতে পৃথক। প্রত্যেক সহর প্রত্যেক নগর তাহার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া নিজস্ব ভাব প্রকাশ করিতেছে। নগরগুলির এই বহুবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই এক অখন্ড জাতীয়তার ঐক্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। বৌদ্ধযুগে অশোক এই জাতীয়তার ঐক্যের উপর একটা সাম্রাজ্য গড়িতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুসলমান যুগে সম্রাট আকবরও এই নগরগুলির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া সাম্রাজ্য গড়িতে পারিয়াছিলেন। যে জাতির মানুষগুলির মধ্যে নাগরিকের কর্ত্তব্যবোধ পরিপুষ্ট হয় নাই, যে জাতি ইতিহাসে একটা জীবন্ত মহাপ্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে না। ভগিনী নিবেদিতা কখনও কখনও নিজে ঝাঁটা হাতে বোসপাড়ার সঙ্কীর্ণ গলিটি ঝাঁট দিতেন। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেবে শিখায়।"

এখন কথা, বিবাহ করিয়া গৃহী না হইলে পরিবার সৃষ্টি হয় না। পরিবারে বাস না করিলে নাগরিক হওয়া যায় না। অতএব, নাগরিক হইতে হইলে গৃহস্থ হইতে হইবে। মধ্যযুগে যাঁহারা সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন, বর্ত্তমান যুগে তাঁহারাই উত্তম নাগরিক হইবেন। আনন্দমোহন বসুর জীবন চরিত লিখিতে গিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, তিনি দুইশ' বছর আগে জন্মিলে একজন সাধু সন্ন্যাসী হইতেন। আমাদের কালে জন্মিয়াছেন বলিয়া একজন উত্তম নাগরিক হইয়াছেন। ("Ananda Mohan Bose, born two hundred years earlier, would have been an Indian saint. Born in our own tims, he became a citizen. Citizenship is an ideal as high as sainthood.") নাগরিকের আদর্শ সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার আদর্শ অপেক্ষা নীচু নয়, সমান উচ্চ। এবং তিনি লিখিয়াছেন যে, নাগরিক জীবন ও নাগরিক আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি স্কুল স্বরূপ (The Sadharan Brahmo Samaj so valuable to India, as a training school for the civic life and ideals."), বেলুড় মঠ নাগরিক জীবনের পক্ষে অনুকূল কি প্রতিকূল তা উল্লেখ করিলেন না।

ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা টাউনহলে যে বিরাট শোকসভা হয় (২৩শে মার্চ, ১৯১২), ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সেই সভায় সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে সন্ন্যাসেব মধ্য দিয়া আমাদের মুক্তি আসিবে না। পরন্তু, নাগরিক আদর্শের পরিপুষ্টি দ্বারাই আমাদের মুক্তি আসিবে। ("Sister Nivedita taught us that our true salvation lies not in asceticism but in the cultivation of civic virtues.")। ডাঃ ঘোষ খোলাখুলি ভাবেই বলিলেন যে ভগিনী নিবেদিতা নাগরিক আদর্শের পরিপুষ্টির জন্য সন্ন্যাসে বিপ্রতিপন্ন। অর্থাৎ, সন্ন্যাসের আদর্শ অনুকূল নয়, প্রতিকূল।

মিঃ রাণাডেও সন্ন্যাসের প্রতিকূল এবং ব্রহ্মোপাসক বিবাহিত গৃহস্থের পক্ষপাতী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে লাহোর কংগ্রেস হয়। Mr. N. G. Chandravarkar সভাপতি হন। কংগ্রেসের সঙ্গে একটি সমাজ সংস্কারের (Social Conference) সভা হয়। মিঃ রাণাডে উহার সভাপতি হন। তিনি বলেন বৈদিক যুগে সন্ন্যাস ছিল না ("Asceticism had not overshadowed the land.")। কথাটা ঠিক। প্রধানতঃ বুদ্ধ ও শঙ্কর পর পর ভারতের ইতিহাসে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। মিঃ রাণাডে কিন্তু বর্ত্তমানকালের অবিবাহিত সন্ন্যাসীদের উপর কিছুটা কটাক্ষপাত করিলেন এবং বাংলার ব্রাহ্মসমাজের নেতারা, (যথা— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র

মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রভৃতি) যে বিবাহ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া উন্নততর সমাজজীবন যাপন করিতেছেন, ইহার খুব প্রশংসা করিলেন। মিঃ রাণাডে বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজের নেতা। ঐ প্রার্থনাসমাজ বাংলার ব্রাহ্মসমাজের বোম্বাই সংস্করণ।

স্বামী বিবেকানন্দ মিঃ রাণাডের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী, কাজেই সন্ন্যাসের অতুলনীয় মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। স্বামিজী বলিলেন ঃ

"বেঁচে থাকুক রাণাডে ও সমাজ-সংস্কারকের দল। কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত! ভুলোনা বৎস, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্যগুরু যার মানেই বুঝতে পারছে না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা!" ইহা অনেকটা ধমক দেওয়ার মত শুনাইল। বিশেষ কোন যুক্তি পাওয়া গেল না।

এখন প্রশ্ন হইল সন্ন্যাসী হইলে কি নাগরিক হওয়া যায় না? স্বামী বিবেকানন্দ কি একজন নাগরিক নহেন? ভারতের জাতীয়তাবাদের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত নহেন? তিনি বলিয়াছেন, — "পরহিতায় সর্ব্বস্ব অর্পণ — এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? ইচ্ছা হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই। এই সব গরীব দুঃখী দরিদ্র নারায়ণদের বিলিয়ে দিই। *** আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পারছে না, — আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়না দেখে এক এক সময় মনে হয় — ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা। ... একটি কুকুর যতদিন পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু — অধর্ম্ম।" যে বিশাল হৃদয় হইতে ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্ম হয়, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা সেই হৃদয়ের পরিচয় পাইতেছি। তাঁহার সন্ন্যাস মধ্যযুগের মায়াবাদীদের সন্ন্যাস নয়, তাঁহার সন্ন্যাসের আদর্শে নাগরিক জীবনের আদর্শ দেদীপ্যমান। নতুবা অত বড় বৈদান্তিক হইয়াও তিনি কি বলিতেন যে, "অন্য নাম হাতের কাছে না পাওয়ায় আমি নিজেকে Socialist বলিয়া পরিচয় দিতে চাই।" শুধু বিবাহ করিলেই উত্তম নাগরিক হওয়া যায় না। আর বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই নাগরিকের আদর্শ হইতে স্খলিত হওয়া হয় না।

রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দে পৌঁছিতে একটা যুগ অতিক্রম করিতে হয়। রাজার সময় যাঁহারা মায়াবাদী বৈদান্তিক হইতেন তাঁহারা সমাজ

সংসার ছাড়িয়া যাইতেন। সমাজের প্রতি কোন দায়িত্ববোধ তাঁহাদের ছিল না। তাই তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখিয়াছিলেন যে বেদান্ত পড়িয়া আমাদের যুবকেরা উৎকৃষ্টতর নাগরিক হইতে পারিবে না।*

"Better members of society" তৈয়ারী করাই রাজার অভিপ্রায় ছিল। এক্ষেত্রে তিনি ভগিনী নিবেদিতার পূর্বগামী। জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, নাগরিক জীবনের আদর্শ-পরিকল্পনায় ভগিনী নিবেদিতা স্পষ্টতঃ রামমোহনপন্থী।

ভগিনী নিবেদিতা ও মডার্ণ রিভিউ

১৯০৬, ডিসেম্বর কলিকাতা কংগ্রেস বইয়ের ষ্টলে ১৯০৭, জানুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' প্রথম দেখা যায়। নিবেদিতা তখন দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাগান বাড়ীতে রুগ্নশয্যায় শায়িতা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে 'মডার্ণ রিভিউ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপধ্যায় আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে বলেন, "আপনার বিজ্ঞানের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি আমি মডার্ণ রিভিউতে ছাপাইতে চাই।" আচার্য্য বসু বলিলেন, "আমার হাতে এখন কোন প্রবন্ধ নাই।" রামানন্দবাবু পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিবেদিতাকে বলিব, তিনি প্রবন্ধ দিবেন।" নিবেদিতার লিখিবার ক্ষমতা সম্পর্কে আচার্য্য বসু বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ গবেষণা, যাহা আচার্য্য বসুর মনে বিদ্যুৎ চমকের মত খেলিয়া যাইত, তাহা আচার্য্য বসু নিজে লিখিতে পারিতেন না, নিবেদিতা লিখিয়া দিতেন। নিবেদিতা আচার্য্য বসুকে বলিতেন, "আমি তো আছি, আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মত তোমার কাজ করবে। মনে কর এ লেখা তোমারই।"

আচার্য্য জগদীশ বসুর মাধ্যমে রামানন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ার পর নিবেদিতা প্রথমে 'মডার্ণ রিভিউ'-তে রাজনৈতিক প্রবন্ধ দিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়াছেন, এবং সর্বশেষে অজন্তা গুহার চিত্রকলা সম্পর্কে চিত্র-সমন্বিত অনেক প্রবন্ধ দিয়াছেন।

১৯০৭, আগষ্ট হইতে ১৯০৯, আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিশের দৌরাত্ম্যে দুই বৎসর নিবেদিতা এদেশে ছিলেন না; ইউরোপ ও আমেরিকাতে ছিলেন। ১৯০৯,

---

* "Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother. ... have no actual entity, and they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১০, ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসর চারি মাস নিবেদিতা 'মডার্ণ রিভিউ'-তে প্রবন্ধ দিয়াছেন। পরে ১৯১১, জানুয়ারী হইতে তিন মাস নিবেদিতা আমেরিকা ছিলেন। কাজেই ১৯১১ এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাস নিবেদিতা প্রবন্ধ দিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর (১৯১১,১৩ই অক্টোবর) পরেও 'মডার্ণ রিভিউ'-তে নিবেদিতার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এবং লেডি অবলা বসু প্রভৃতি নিবেদিতার গুণমুগ্ধ অনেকে 'মডার্ণ রিভিউ'-তে নিবেদিতা সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন। 'মডার্ণ রিভিউ' লেখকদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যদুনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। এবং এই লেখক দলটির সহিত আগে হইতেই নিবেদিতার পরিচয় ছিল।

রামানন্দবাবুর সহিত আচার্য্য জগদীশ বসুর বাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় এবং নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের ছোট ভগ্নপ্রায় বাড়ীতে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হইত এবং কথাবার্ত্তা চলিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতে দেরী হয় নাই। 'New India'-তে লিখিবার সময় বিপিনচন্দ্র পালের সহিত, 'ডন' ম্যাগাজিনে লিখিবার সময় নিবেদিতার যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল 'মডার্ণ রিভিউ'-তে লিখিবার সময় রামানন্দবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বেশী হইয়াছিল। নিবেদিতা ও অরবিন্দ এক পালকের দুইটি পাখী। সুতরাং 'কর্মযোগীনে' নিবেদিতা অরবিন্দ চন্দননগরে প্রস্থানের (১৯১০, ফেব্রুয়ারীর শেষ) পরেও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কেন না, প্রস্থানের পূর্বে অরবিন্দ নিবেদিতাকেই 'কর্মযোগীনের' সমস্ত ভার দিয়া গিয়েছিলেন। সুতরাং, 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'কর্মযোগীনে' নিবেদিতা একই সময়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন। রামানন্দবাবু বলিয়াছেন, "নিবেদিতা একজন সাংবাদিক হইয়াই জন্মিয়াছিলেন। (She was a born journalist.)। এমন প্রাণ দিয়া 'মডার্ণ রিভিউ'-এর উন্নতির চেষ্টা আর কেহ করিয়াছিলেন কিনা জানি না।" (অর্ধশতাব্দীর বাংলা, শ্রীশান্তা দেবী, পৃঃ ১৫৭)।

নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতে (পৃঃ ৩০৮) আছে, "The prudent man and the audacious woman completed each other."। রামানন্দবাবু সাবধানী মানুষ ছিলেন, নিবেদিতা দুঃসাহসিক ছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউ' সম্পাদনার কার্য্যে নিবেদিতা রামানন্দবাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

নিবেদিতা দার্জিলিং-এ মৃত্যুর সময়ে রামানন্দবাবুকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কার্য্যগতিকে রামানন্দবাবু যাইতে পারেন নাই। উভয়ের পক্ষেই ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়।

নিবেদিতা আচার্য্য জগদীশ বসুর মাধ্যমে যে সময় 'মডার্ণ রিভিউ' এর সংস্পর্শে আসিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার জীবনে আর একটি গুরুতর ঘটনার সূত্রপাত হইল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে 'যুগান্তরের' সন্ত্রাসবাদী যুবকের দল নিবেদিতার কাছে আসিয়া বলিল "আমাদিগকেআইরিশ সিন্ ফিন্দের গুপ্ত সমিতির কার্যপ্রণালী শিক্ষা দিন।" নিবেদিতা কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে স্বীকৃতা হইলেন।

এই সম্পর্কে নিবেদিতার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে দুইটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। ১ম, স্বামী বিবেকানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের (১৮৯৫ নভেম্বর) পূর্বে নিবেদিতা একজন রীতিমত বিপ্লবী ছিলেন। বিপ্লবের কার্য্যে তিনি যেমন নিপুণ ছিলেন, তাঁহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর ছিল। তিনি বিপ্লবীদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বহুদিন বাস করিয়াছেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বিপ্লবের সঙ্কীর্ণ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া আরও বৃহত্তর বিপ্লবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।*

সিন্ ফিন্দের টেক্নিক (techique) সম্পর্কে অরবিন্দের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। "কেম্ব্রিজ মজলিসে" তিনি বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন মাত্র। নিবেদিতা এইখানে অরবিন্দ হইতে পৃথক। ২য়, নিবেদিতা পুণা ভ্রমণকালে (১৯০২ সেপ্টেম্বর) র‍্যান্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যাকারী চাপেকার ভ্রাতাদের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে প্লেগ দেখা দেয়। গভর্ণমেন্ট প্লেগ দমনে গোরা সৈন্যদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সৈন্যরা লোকদের ঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের গা টিপিয়া দেখিতে লাগিল প্লেগ হইয়াছে কি না। বিপর্য্যয় কান্ড। মিঃ তিলক মারাঠা কাগজে লিখিয়াছেন, "ইহা অপেক্ষা প্লেগ ভাল।" প্লেগ অফিসার মিঃ র‍্যান্ড ও লেফটন্যান্ট মিঃ আয়ার্ষ্টকে দামোদর ও চাপেকার দুটি মারাঠী যুবক (১৮৯৭, ২২শে জুন) পথিমধ্যে গুলি করিয়া হত্যা করিল। রাওলাট কমিটির মতে ইহাই এদেশে প্রথম রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা। মিঃ তিলককে এই হত্যার উস্কানী দাতা বলিয়া ২৭শে জুন গ্রেপ্তার করা হইল। মিঃ তিলক দেড় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইলেন। ফিনিকস্ পার্কের হত্যাকান্ড, পার্ণেলকে সেই হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত করিয়া কারাদন্ড—এই সমস্তই মিঃ তিলকের কারাদন্ডের অনুরূপ ঘটনা। অরবিন্দ পার্ণেল ও তিলকের কারাদন্ড দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিবেদিতা তখন লন্ডনে। ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ১৮৯৮, ২৮শে জানুয়াবা নিবেদিতা প্রথম ভারতে পদার্পণ

* "Nivedita knew what had been the armed struggle in Ireland; at London she had participated in the rebellions, lived in the midst of proscribed persons before Swami Vivekananda tore her away from her narrow conception of revolt". (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০২)।

করেন। এবং তাঁহার আগমনের মাত্র সাত মাস পূর্বের ঘটনা র‍্যান্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যা। স্বামী বিবেকানন্দ এই হত্যাকারীর প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাদের সোনার মূর্ত্তি (Golden Statue) তৈয়ারী করিয়া বোম্বাইয়ের জাহাজ ঘাটে প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছিলেন। মিঃ তিলক জেলে এই হত্যাকারীদিগকে গীতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। দামোদর, চাপেকারেরা মিঃ তিলকের এই গীতা হস্তে "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ" বলিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়া পড়িয়াছিলেন।

নিবেদিতা পুণাতে বিস্ময় ও ভক্তি গদগদ চিত্তে এই চাপেকার জননীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া পাদস্পর্শ করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন এই মা, ভারতবর্ষকে চারিটি সন্তান দান করিয়াছেন। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৩)। ভারতের অপর কোন মহিলাকে দেখিয়া নিবেদিতা এতটা বিস্ময়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হন নাই। তাঁহার জীবন ইতিহাসে ইহা একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত। এই নিবেদিতা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে যুগান্তর দলের যুবকদের নিম্নলিখিত রূপ শিক্ষা দিলেন :

(ক) ভারতব্যাপী একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের (armed struggle) পরিকল্পনা লইয়াই গুপ্ত সমিতির কার্য্যের ছক কাটা হইল। গ্রামে গ্রামেই এই গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইল। এবং কিছু চেষ্টাও হইল। সুতরাং বিপ্লবের কেন্দ্রগুলি প্রধানত পল্লীমুখী, সহরমুখী নয়। এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাগুলিতেই অনেকগুলি আধা বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি আপনা হইতেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই সবগুলি গুপ্ত সমিতিকেই নিবেদিতা একটা কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীনে আনিবার চেষ্টা করিলেন। এই সকল শাখা সমিতিগুলির মধ্যে যাহাতে দ্রুত বার্ত্তা প্রেরণ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যে বার্ত্তা লইয়া যাইবে সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইবে—"The couriers would get massacred rather than get corrupted."। সমস্ত শাখাকেন্দ্রগুলি যেন সময় আসিলে একসঙ্গে বলিতে পারে, "আমরা প্রস্তুত"। মেয়েরাও এই সব শাখা সমিতির সভ্য হইতে পারিবে। অনেক টাকার প্রয়োজন, নিবেদিতার হাতে যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি সমস্তই গ্রামের কেন্দ্রগুলিতে বারীন্দ্রের হাত দিয়া বিতরণ করিতে দিলেন।

(খ) এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে হাতে ছাপা রাজদ্রোহমূলক কাগজ বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইল, নিবেদিতা এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। কেন না বাল্যকালে প্রেসে কি করিয়া এই গোপন পত্র ছাপা হইতে পারে তাহা তিনি শিখিয়াছিলেন। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০২)।

(গ) ইংরেজ সৈন্য যদি গ্রামে আসিয়া পড়ে? তাহারও যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিবেদিতা দিলেন। সন্ত্রাসবাদীরা গ্রাম ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইবে। এবং অন্য সকল গ্রামবাসীরা পলাতকের রক্ষার জন্য যাহা কিছু সম্ভব—টাকা, খাদ্য ইত্যাদি দিয়া গোপনে সাহায্য করিবে। মেয়েরা ধান ভানিতে লাগিয়া যাইবে। লুক্কায়িত বিপ্লবীদের খোঁজ গ্রামবাসীদের দিবে না।

(ঘ) প্রিন্স ক্রুপাটকিনের শিক্ষায় নিবেদিতা নিজে বোমা তৈয়ার করিতে জানিতেন ("She was not a stranger to the manufacture of explosives." ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৬)। আলষ্টারের জঙ্গলে তাঁহার পিতাকে যে কার্য্য করিতে তিনি বাল্যকালে দেখিয়াছেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই। হেমচন্দ্র দাস প্যারিসে বোমা তৈয়ারী শিখিয়া তখনও দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের আর দেরী সহ্য হইতে ছিল না। ইতিমধ্যে উল্লাসকর দত্ত নিজের চেষ্টাতেই বোমা তৈয়ারীর একটি ফর্মুলা (formula) একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। সে কি আনন্দের দিন! নিবেদিতা আচার্য্য বসুকে বলিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের গবেষণাগারে উল্লাসকরের কার্য্যকে নিপুণভাবে পরিসমাপ্তির জন্য তাঁহাকে এবং আরও একটি যুবককে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর মাধ্যমে অন্যান্য যুবকদের তিনি বিখ্যাত রাসায়নিক পি, সি, রায়ের গবেষণাগারে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পি, সি, রায় নিবেদিতার অনুরোধ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রক্ষা করিলেন।

নিবেদিতা নিজেই পি, সি, রায়ের নিকট যুবকদের লইয়া গিয়াছিলেন। পি,সি, রায় গবেষণাগারের চাবি ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া যাইতেন, এবং অনেক রাত্রে একা আসিয়া শূন্য গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ করিতেন, বোমা তৈয়ারীর ফর্মুলাগুলি টেবিলের নীচে কাগজ চাপা থাকিত। তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিতেন। যন্ত্রগুলি নিজেই পরিষ্কার করিতেন। এ্যাসিডগুলি উধাও হইয়াছে তাহাও দেখিতেন। এই সাহায্যের জন্য নিবেদিতা পি, সি, রায়ের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ ছিলেন।

নিবেদিতার বোমা তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়— এই দুই জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে পাইলাম। অরবিন্দ এই কার্য্যটি পারিতেন না। নিবেদিতার বিশেষ অবদান কি, তাহা উল্লেখ করিবার জন্যই তুলনা করা হইল।

নিবেদিতা যুবকদের বলিলেন, "আমাদের মৃত্যুভয় জয় করিতে হইবে। কাপুরুষ বলিয়া আমাদের যে অখ্যাতি তাহা আমাদের শক্তি দ্বারাই ধৌত

করিতে হইবে।" যে সকল যুবকেরা মরণে ভয় পায়, নিবেদিতা তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠিবে যে, নিবেদিতা হিংসাবাদী কি অহিংসাবাদী। জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের মত অহিংসাবাদী, নিবেদিতা কোনকালেই ছিলেন না। অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য গীতায় যদি শ্রীকৃষ্ণ হিংসাবাদী হইয়া থাকেন, তবে নিবেদিতা হিংসাবাদী। আর যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়া সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ যদি হিংসাবাদী না হইয়া থাকেন, তবে নিবেদিতাও হিংসাবাদী নহেন। পুনরায় রাজা রামমোহনের কথাই উল্লেখ করিতে হইতেছে। রাজা বলিয়াছেন "আমাদের পরাধীনতার একটি কারণ, হিংসাত্যাগকে ধর্ম্ম জানা (ব্রাহ্মণে সেবধি)।" নিবেদিতা যুবকদিগকে বলিলেন—"He who does not strike because he is weak commits a sin. He who does not strike because he is afraid is a coward."

স্পষ্ট কথা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না।

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ

নিবেদিতার সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ এবং যুবকদিগকে আইরিশ সিন্ ফিন্দের টেকনিক (technique) শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সমস্তই প্রথম হইতে অবগত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এজন্য নিবেদিতাকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। তিনি নিবেদিতাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন "তোমার বিশ্বাস (faith) আছে, শক্তি আছে। তুমি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলিতে পার, কিন্তু তোমার চারিদিকে যে যুবকদল আসিয়া জুটিয়াছে তাদের বিশ্বাসও নাই, শক্তিও নাই। তাহারা হাতের কাছে যেমন তেমন একটা কাজ চায় মাত্র। তুমি না থাকিলে তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না।" (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৪)।

রবীন্দ্রনাথের কথা কিছুটা সত্য, সবই সত্য নয়। সন্ত্রাসবাদী যুবকদের রবীন্দ্রনাথ যে চক্ষে দেখিয়াছেন অরবিন্দ তাহাদের সে চক্ষে দেখেন নাই। দুই বৎসর পর অরবিন্দ, এই সন্ত্রাসবাদী যুবকদের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, "এই যুবকদের আত্মত্যাগ ও দুর্জ্জয় সাহসের তুলনায় আমি কিছুই না। তাহাদের চারিত্রিক বল আমার চেয়েও বেশী।"*

---

* "In many of them I discovered a mighty courage, a power of self-effacement in comparison with which I was nohting. One or two were not only superior to me in force and charactor, but in intellectual ability, on which I prided myself."—(উত্তরপাড়া বক্তৃতা, ১৯০৯, মে)

নিবেদিতার অনুচর সন্ত্রাসবাদী যুবকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, কানাই দত্ত, ইহারা প্রত্যেকেই পরবর্ত্তী ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের ভৎর্সনা ও সতর্কবাণী কালে তুলিলেন না। নিবেদিতা ও অরবিন্দ বিপ্লবী, রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী নহেন। বিপদ ঘনাইয়া আসিলে রবীন্দ্রনাথ ভয়ে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ইতিহাসে একথা মুছিয়া ফেলা যায় না। (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৮৭)।

কুমিল্লা ও জামালপুর ১৯০৭

বরিশাল কনফারেন্সের (১৯০৬, ১৪ই এপ্রিল) ঠিক এক বছর পরে কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনা। ইংরেজ গর্ভণমেন্ট স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্য তাহার টেক্‌নিক্ বদলাইয়া ফেলিলেন। বরিশালের প্রত্যক্ষ দমন নীতির পরিবর্ত্তে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লেলাইয়া দিলেন। মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাই তাঁহার জমিদারী কুমিল্লাতে গিয়া এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত করিলেন। মুসলমানেরা হিন্দুর দোকান লুট করিল, হিন্দুর বিধবাদিগকে জোর পুর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া পাশবিক অত্যাচার করিল। গর্ভণমেন্ট পিছনে থাকিয়া মুসলমানদের উস্কানী দিলেন।*

অহিংসা দ্বারা ইহার কী প্রতিকার হইতে পারে? ঢাকায় মুসলিম লীগ ভূমিষ্ঠ হইবার দুই মাস পরেই কুমিল্লার দাঙ্গা। কুমিল্লার দেড় মাস পর এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে জামালপুরে বাসন্তী পূজার সময় মুসলমানেরা বাসন্তী প্রতিমা ভাঙিয়া ফেলিল। হিন্দু স্ত্রীলোকদের ধরিয়া লইয়া গিয়া মুসলমান গুন্ডারা অকথ্য পাশবিক অত্যাচার করিল। গর্ভণমেন্ট নির্য্যাতিত হিন্দুদের গ্রেপ্তার করিল। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দল, কেহই মুসলমানদিগকে হাতে রাখিতে পারিল না। পরন্তু গভর্ণমেন্ট মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণ হাত করিল। চল্লিশ বৎসর পর ইতিহাসের এই ধারাই বাংলা দেশকে দ্বিখন্ডিত করিয়া ফেলিবে। অবাঙ্গালী কংগ্রেস নেতারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবে। ইহাতে সায় দিবে।

অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় আগ্নেয়গিরির প্রস্রবনের মত লিখিতে লাগিলেন। "যদি বাঙ্গালী জাতি সত্যই এমনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে যে দুর্বৃত্তের

* মিঃ নেভিনসন লিখিয়াছেন, "Hindu shops were looted, Hindu windows abducted and the cases of outrage upon Hindu woman by gangs inercased in number." (The New Spirit in India, Introduction, p. 16-by Mr. Nevinson)

দ্বারা তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নষ্ট হইতে দেখিয়াও প্রতিকারার্থে আঘাত না করে, তবে যতশীঘ্র এই বাঙ্গালী জাতি পৃথিবী ভারাক্রান্ত না করিয়া পৃথিবী হইতে মুছিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, ততই ভাল।"*

মিঃ তিলক মারাঠী পত্রিকায় লিখিলেন যে ইহা কি বিশ্বাস করিতে হইবে, যে, বাসন্তী প্রতিমা ভগ্ন এবং হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর বলাৎকার দেখিয়াও, প্রতিকারার্থে রাস্তায় রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই? ("Without blood flowing freely in expiation")। মিঃ তিলক ও অরবিন্দ কেহই অহিংসার কথা বলিলেন না। নিবেদিতা ঠিক এই সময়েই বাংলার যুবকদের আইরিশ সিন্ ফিনদের টেক্‌নিক্ শিক্ষা দিতেছেন। ইতিহাসে আচমকা অকস্মাৎ কিছুই হয় না। কার্য্যকারণ সম্পর্কে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ।

ভারত সভা, কংগ্রেস, কনফারেন্স, ব্রাহ্মসমাজ বিবেকানন্দের কথায় "মঠ-ফট, ঘণ্টানাড়া, শাঁখবাজান" দূর দিগন্তে ধূসর ছায়ার মত বিলীন হইয়া যাইতেছে। ইতিহাসের এই দুর্দমনীয় বেগ বাঙ্গালী জাতিকে যে পথে লইয়া যাইতেছে, ভগিনী নিবেদিতাকে তাহার পুরোভাগে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতে দেখা যাইতেছে।

অরবিন্দ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ৯ই এপ্রিল হইতে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিলেন। যদিও অরবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন যে, বিপিনচন্দ্র পালই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম প্রবর্ত্তক, তথাপি বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হইতে অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। এবং এই পার্থক্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বিপিনচন্দ্র সন্ত্রাসদের বিরোধী, অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক। সুতরাং উভয়ের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এক হইতে পারে না। বিপিনচন্দ্র প্রতিরোধের জন্য শুধু নিষ্ক্রিয়তার উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। অরবিন্দ তাহা করেন নাই। অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে অবস্থাধীনে সক্রিয় হইতে হইবে। এইখানেই বিপিনচন্দ্র হইতে অরবিন্দ পৃথক। অরবিন্দ লিখিয়াছেন,— "We advocate passive resistance without wising to make a dogma of it." —আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিব সত্য কিন্তু আমাদের পশ্চাতে ক্ষত্রিয়ের তীর ধনুক প্রস্তুত থাকিবে ("We should have the bow of the Kshatriya ready far use though in the back-ground." রাজনীতি বিশেষভাবে

* "If Bengal has been seized with such a severe palsy as not to strike a blow ever for the honour of our woman,it is better for her people to be blotted from the earth than cumber it longer with their disgrace. (Bande Mataram 7th May, 1907)

ক্ষত্রিয়দের কাজ। যদিও তিনি বলেন নাই কিন্তু বলিতে পারিতেন, যে ইহা বৈশ্য বা বণিকের কাজ নয়।*

অরবিন্দ মতে প্রতিরোধ প্রথমে নিষ্ক্রিয় থাকিবে। পরে অবস্থা বুঝিয়া সক্রিয় (active) হইবে, সক্রিয় (active) হইলেও আক্রমণাত্মক হইবে না। পরের ধাপে অত্যাচার হইলে সক্রিয় প্রতিরোধ আক্রমণাত্মক হইতে পারিবে, এবং শেষ ধাপে, সশস্ত্র বিদ্রোহে (armed struggle) গিয়া পৌঁছিবে। এবং উহা দ্বারাই ইংরেজকে তাড়াইয়া দেশ স্বাধীন হইবে। অত্যাচার বেশী হইলে "Passive Resistance ceases and Active Resistanse becomes a duty."—সশস্ত্র বিদ্রোহই লক্ষ্য এবং ইহার প্রথম ধাপ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

ইহাতে শুধু নিষ্ক্রিয়তা নাই, এবং অহিংসার কোন বুজরুকিও নাই। নিবেদিতা ও অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে, এমন কি যোগাযোগও রহিয়াছে। অরবিন্দ লিখিয়াছেন 'We do not want to develop a nation of women who know only how to suffer and not how to strike." —কিন্তু "women" কথা লেখা ঠিক হয় নাই। অরবিন্দ হঠাৎ বিস্মরণ হইয়াছেন যে ভগিনী নিবেদিতা একজন "woman"।

নিবেদিতা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্পর্কে কুত্রাপি একছত্রও লেখেন নাই। অরবিন্দ ইহা লিখিয়া বিপিনচন্দ্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন এবং নিবেদিতা অরবিন্দের সমর্থন করিতেছেন, বিপিনচন্দ্রকে নহে।

অরবিন্দ যখন ইহা লিখিতেছিলেন তখন একদিকে কুমিল্লা-জামালপুর চলিতেছে, আর অন্যদিকে নিবেদিতা, জগদীশ বসু ও পি, সি, রায়ের লেবরেটরীতে তাঁহার যুবকদের পাঠাইয়া বোমা তৈয়ারীর ফরমুলা লিখিতেছেন।

বিপিনচন্দ্র পালের মাদ্রাজ বক্তৃতা

রাওলাট কমিটি লিখিয়াছে (পৃঃ ১১৫) যে, বিপিনচন্দ্র "সমুদ্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী নগরগুলির মধ্য দিয়া এপ্রিল মাসে বক্তৃতা করিলেন। রাজামন্দ্র সহরে তাঁহার বক্তৃতার ফলে গর্ভণমেন্ট কলেজের ছাত্রেরা ২৪ এপ্রিল ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। ২রা মে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় তিনি বলিলেন যে, (ক) ইংরেজ ভারতবর্ষকে তাহাদের অধীনে রাখিয়া সুশাসন প্রবর্ত্তন করিতে চায়, কিন্তু ভারতবাসী ইংরাজের কর্ত্তৃত্ববিহীন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে চায়। ("The Indians desired to

* "Politics is especially the business of the Kshatriya, and without Kshatriya strength at its back all political struggle is unavailing."

make it autonomous, absolutely free of the British Parliament.") (খ) এদেশে ইংরেজের রাজত্ব শুধু মায়া বা মরীচিকার ("maya or illusion") উপর স্থাপিত। নূতন আন্দোলন এই মায়া বা ভ্রমকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াই শক্তিমান হইতে চলিয়াছে।"

আমাদের দেশে ইংরেজ রাজত্ব একটা মায়া (maya or illusion), বেদান্তের পরিভাষায় ইহার পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। মুমুক্ষু সাধক যেমন মায়াকে মিথ্যা জানিয়া মুক্তিলাভ করিবেন, আমরাও তেমনি ইংরেজ রাজত্বকে মায়া বা মিথ্যা জানিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিব। ইহা বেজায় দার্শনিক ব্যাপার। রাজনীতিতে এতটা বেদান্ত সকলে বুঝিবে না। এই ব্যাখ্যার একটা খারাপ দিকও আছে। যদি মায়াই হয়, তবে উহার ধার পাশ দিয়া আমাদের যাইবার কি দরকার? আছে, থাকুক।

ইহার ঠিক দুই বৎসর পরে আলিপুর বোমার মামলার পর জেল হইতে বাহির হইয়া অরবিন্দ বিডন স্কোয়ারের এক সভায় (১৯০৯, ১৩ই জুন) এক বক্তৃতা করিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের এই মায়া থিওরিকে অনুসরণ করিয়া ইংরেজ গর্ভণমেন্টকে মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ("In reality they never were there, they were maya, illusions.)"।

দার্শনিক চিন্তায় অরবিন্দ মায়াবাদী নহেন, লীলাবাদী। তথাপি তিনি বিপিনচন্দ্রকে অনসরণ করিয়া মায়ার পক্ষেই বক্তৃতা দিলেন। ইংরেজ গর্ভণমেন্টকে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবের লীলা বলিলেন না। কিন্তু ইহা দুই বৎসর পরের ঘটনা।

লাজপত রায় ও অজিত সিং-এর হঠাৎ নির্বাসনের খবর পাইয়া বিপিনচন্দ্র ১২ই মে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

লাজপৎ রায় ও অজিত সিং-এর নির্বাসন

সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পঞ্চাশ বৎসর পর পাঞ্জাবে গুজব রটিয়াছিল আবার তেমনি একটি বিদ্রোহ হইবে। হঠাৎ কৃষিকর বৃদ্ধি হওয়ায় বারী দোয়াব খালে চেনাব বস্তীর প্রজারা বর্দ্ধিত কর দিবে না স্থির করিল। এই সব কৃষকদের বহু আত্মীয় স্বজন শিখ রেজিমেন্টের সৈন্য ছিল। 'India' নামে দেশী কাগজ ভারতীয় সৈন্যদিগকে রাজদ্রোহে উত্তেজিত করিল। লাজপত রায় ২২ শে মার্চ এবং অজিত সিং ৭ই এবং ২১শে এপ্রিল, কৃষকদের সভায় ডাকিয়া বলিলেন যে, "বর্দ্ধিত কর হ্রাস না হওয়া তোমরা চাষবাস করিও না।" এই সভায় পেন্‌সন্-ভোগী অনেক শিখ সৈন্যও ছিল। ফলে ২রা মে, রাওয়ালপিন্ডিতে ক্ষিপ্ত কৃষক জনতা

সাহেবদের বাংলো ও বাগান আক্রমণ কবিয়া তছ্নচ্ করিয়া দিন। খাল ও রেলওয়ে ধ্বংস করা হইল। নিবেদিতা ইহাকে সত্যই একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ বলিয়া মনে করিলেন। ("It was armed rebellion with all its force." — ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৫)। ১৯০৫ সনের বাংলার বয়কট আন্দোলনকেও নিবেদিতা মিঃ গোখলেকে লন্ডনে চিঠি লিখিবার সময় একটা সশস্ত্র বিদ্রোহের পূর্বাভাস বলিয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ফরাসী বিপ্লব ও আইরিশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ফল। এবং তাহার বিপ্লবী মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ।

৯ই মে, লাজপাত রায় ও অজিত সিংকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়া বর্মায় মান্দালয় দুর্গে প্রেরণ করা হইল। কলিকাতায় ভীষণ প্রতিক্রিয়া, উৎসাহ ও আতঙ্কের মধ্যে দেখা দিল। অরবিন্দ রাত্রিতে ঘুমাইয়া ছিলেন, তাঁহাকে খবর দেওয়া মাত্রই তিনি নিদ্রোত্থিত হইয়া বন্দেমাতরমের জন্য লিখিলেন, "Men of the Punjab! Race of the Lion! আমলাতন্ত্র আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে, যুদ্ধ দাও। একজন লাজপতের জায়গায় একশ লাজপত দন্ডায়মান হও। এখন বক্তৃতা দিবার ও প্রবন্ধ লিখিবার সময় অতীত হইয়াছে।" ("The time now for speeches and fine writings is past."—বন্দেমাতরম্, ১০ মে) উত্তেজনার বিদ্যুৎ তরঙ্গ যখন এইরূপে স্বদেশী বাংলার আকাশে ঝিম্ঝিম্ করিতেছিল ঠিক সেই সময় টাউনহলে একটা সভা হইল। নিবেদিতা বক্তৃতা করিলেন। বিষয় ছিল, Dynamic Religion। তিনি বলিলেন আর কথা নয়। এস এবার আমরা কাজ আরম্ভ করি ("No more words—words—words—let us have deeds—deeds—deeds.") অরবিন্দের ১০ই মে বন্দেমাতরমের লেখার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। নিবেদিতা ও অরবিন্দ ঠিক একই সময়ে একই ইঙ্গিত করিতেছেন। এই দুই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বিপ্লবীর চিন্তাস্রোত একই খাতে প্রবাহিত হইতেছে।

বিপিচন্দ্র নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিয়া বলিলেন, "ইহা Dynamic Religion নয়। ইহা Dynamite"।

বেলুড় মঠের উৎসব

জুলাই মাসে বেলুড় মঠে উৎসব হইল। নিবেদিতার শিষ্য যুগান্তর দলের যুবকেরা তাহাকে বেলুড় মঠে লইয়া গেল। নিবেদিতা, যে ঘরে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যে ঘরে তিনি পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৯০২, ৫ই জুলাই প্রাতে) পুষ্পে আচ্ছাদিত স্বামিজীর মৃতদেহকে পাখা দিয়া বাতাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মস্তক আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেই ঘরে তীর্থযাত্রীর মত

কর জোড়ে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর বারান্দা দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিলেন। ফরাসী জীবন চরিতে আছে, মহেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গে ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা, কিন্তু আমার মনে হয়, মহেন্দ্র নয়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গে ছিলেন। মঠের নীচে বিশাল জনতা নিবেদিতাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "আমাদিগকে কিছু বলুন।" নিবেদিতা তাঁহার বন্ধুদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "Must I do so?" "আমি কি কিছু বলিব?" তাহারা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "না কিছু বলিবেন না। শুধু আশীর্বাদ জানান।" নিবেদিতা হাত তুলিয়া শুধু বলিলেন, "ওয়া গুরু কি ফতে"! জনতা উত্তরে প্রতিধ্বনি করিল "ওয়া গুরু কি ফতে!" জনতার প্রতি তিনি কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। জনতাও উত্তরে তাঁহার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিল। তারপরে তিনি দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীজীর কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল।

যুগান্তরের মামলা

পুলিশের গোয়েন্দা সদাসর্বক্ষণ নিবেদিতার পশ্চাতে অনুধাবন করিত; কাজেই বেলুড় মঠে কোনরূপ বক্তৃতা দিতে তাঁহাকে নিষেধ হইয়াছিল। অরবিন্দ এই সময় লিখিলেন, "আরও অত্যাচার চাই"—"wanted more repression" —(বন্দেমাতরম্ ১৮ই জুলাই, ১৯০৭) ইহার কারণ, ৩রা জুলাই পুলিশ যুগান্তর অফিসে খানা তল্লাস করিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জামালপুরের হাঙ্গামার তদন্ত করিয়া ৫ই জুলাই যুগান্তর অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সম্পাদক হিসাবে গ্রেপ্তার করা হইল। ২২শে জুলাই বিচার আরম্ভ হইল। সুতরাং ১৮ই জুলাই এই অত্যাচারকেই লক্ষ্য করিয়া অরবিন্দ লিখিলেন—"wanted more repression"

"জামালপুরে সতের বৎসরের এক বালক সুধীর এক ভাঙা বন্দুক হাতে লইয়া এক মন্দিরের ভিতর আনীত বহু হিন্দু মহিলা ও শিশুদের প্রাণ, ধর্ম্ম ও সতীত্ব সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ইংরেজ পুলিস সুপারিণ্টেন্ডেন্ট পরিচালিত বিশ হাজার উন্মত্ত মুসলমান গুন্ডার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।" (দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৮)

যুগান্তরের দুইটি প্রবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে আসামী করা হইল। তিনি দায়িত্ব স্বীকার করিলেন। প্রবন্ধ দুইটি অবশ্য তিনি লেখেন নাই। বারীন্দ্র কোন দায়িত্বই গ্রহণ করিল না। প্রথম প্রবন্ধ ১৯০৭, ৭ই এপ্রিল। এই প্রবন্ধে লেখা

হইয়াছে, বিপ্লবের পূর্বে —প্রত্যেক দেশেই তিনটি দল দেখা যায়। যথা — (১) দেশদ্রোহী বিভীষণ, (২) রাজভক্ত মডারেট (৩) বেপরোয়া বিপ্লববাদী। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ১৯০৭, ৫ই মে। ইহার ইংরেজি অনুবাদ হইতেছে, "you Englishmen are a demon, you are an Asura. You have set Musalmans against the Hidus." — (Bande Mataram, 26th July, 1907)। রাওলাট কমিটি যুগান্তরের তিনটি সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছে (১) Welcome Unrest (১১ই এপ্রিল, ১৯০৭), (২) বিপ্লবীরা দেশীয় সৈন্য ভাগাইবে (১২ই আগষ্ট, ১৯০৭), (৩) পাগলের চিঠি, ইহাতে গরিলা যুদ্ধের উস্কানী আছে (২৬শে আগষ্ট, ১৯০৭)।

ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইবার পর ভগিনী নিবেদিতা পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত দশ হাজার টাকা জামীন হইবার জন্য স্বয়ং আদালতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "পুলিশ আমাকে ধৃত করিবার পর আমার মকদ্দমার সময়ে যখন কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট সুইন্‌হো দশ হাজার টাকা জামীন তলব করেন তখন নিবেদিতা এই জামানৎ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন।" (দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; পৃঃ ৯৪)। 'ইংলিশম্যান' কাগজ নিবেদিতাকে দেশদ্রোহী বলিয়া গালি দিল। এই ঘটনায় পুলিশের বড় কর্ত্তারা নিবেদিতাকে গ্রেপ্তার করিবেন, কিংবা নির্বাসন দন্ড দিবেন, জল্পনা কল্পনা আরম্ভ করিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হইল। তিনি আদালতে হাস্যমুখে এ দন্ডের আদেশ গ্রহণ করিলেন। অরবিন্দ ইহার জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। (বন্দেমাতরম্, ১৯০৭, ২৫ শে জুলাই)।

ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্থান

জাতীয় দলের নেতারা নিবেদিতাকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহাকে নির্বাসন দন্ড দেওয়া হইবে প্রায় স্থির হইল। তিনি হাস্য করিলেন। নির্বাসন বা কারাগার তিনি কিছুর ভয় করিলেন না; কিন্তু বন্ধুরা তাঁহাকে বুঝাইল যে, ভারতের বাহিরে গিয়াও তিনি ভারতের জন্যই বহুকাজ করিতে পারিবেন—যাহা নির্বাসন বা কারাগারে থাকিয়া তিনি পারিবেন না। অবশেষে তিনি রাজী হইলেন।

১৯০৭-র আগষ্ট মাসে দুই বৎসরের জন্য তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যে কারণে এবং যে অবস্থায় প্রিন্স ক্রপাটকিন ইংল্যান্ডে পালাইয়া আসিয়া এই সময় অবস্থান করিতেছিলেন ঠিক সেই কারণে এবং সেই অবস্থায় নিবেদিতা ভারত ছাড়িয়া লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একই অবস্থা, একই কারণ,

ইতিহাস-বিখ্যাত বিপ্লবীরা সবদেশেই এইরূপ করিয়াছেন। বিপ্লবীদের ইহা একটি টেক্‌নিক্। নিবেদিতার মৃত্যু ভয় নাই সুতরাং কারাগার বা নির্বাসনের ভয়ে তিনি পালান নাই। ভারতের বাহিরে আসিয়া ভারতের জন্যই আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারিবেন আশা করিয়াই তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

নিবেদিতা জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ গিয়া সমুদ্রে পড়িল। উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া নিবেদিতাকে লইয়া জাহাজ ভাসিয়া চলিল। নিবেদিতা জাহাজে একাকী কি ভাবিতেছিলেন? ১৮৯৯, ২০ শে জুন গোলকুন্ডা জাহাজে উঠিয়া নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত লন্ডন যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ ৬ সপ্তাহ একত্রে জাহাজে বাস করিয়াছিলেন। ডেকের উপর স্বামিজীর সহিত একত্রে বেড়াইবার সময় কত জ্ঞান, ধর্ম ও পুণ্য কাহিনীর কথাই না তিনি স্বামিজীর মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। সে আজ ৮ বৎসর আগের কথা। আজ নিবেদিতা একা চলিয়াছেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্য্যের মধ্য হইতেই হঠাৎ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বাগবাজারের ছোট বাড়ীটির কথা মনে হইল। সেখানে সিন্ ফিন্‌দের টেক্‌নিক্ শিক্ষাপ্রার্থী যুবকের দল তাঁহাকে দিবারাত্রি ঘিরিয়া থাকিত। তিনি একটি রিভল্‌ভার হাতে লইয়া যুবদের সম্মুখে খেলা করিতেন, যেন হত্যা করা অথবা হত হওয়া কিছুই নয়। সেই যুবকদের শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তারপরে তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়টিও ছাড়িয়া আসিতে হইল, দীর্ঘ দুই বৎসরের জন্য। স্কুলের মেয়েদের কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্কুলটির যে কি দশা হইবে, তাহাও তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

কারলাইল্ সাহেব (যিনি সার্কুলার জারি করিয়া 'বন্দেমাতরম্' গান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন) ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নিবেদিতা সিন্ ফিন্-দের অনুকারী বিপ্লবের কার্য্য করেন কিনা? উত্তরে ভূপেন্দ্র বসু হাঁ, কি না যাহাই বলিয়া থাকুন তাহা প্রকাশ হয় নাই। গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিবেদিতার কার্য্য কলাপ কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা নিবেদিতা সম্পর্কে অতিশয় সজাগ ছিলেন।

'এম্পায়ার' কাগজের সম্পাদক মিঃ জে, এফ, ব্লেয়ার ভগিনী নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন। তিনি নিবেদিতা সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্র যে বিপ্লবের আবহাওয়া সৃষ্টি না করিয়াছিল — নিবেদিতা একা তাহা করিয়াছিলেন।

বাংলার যুবকদের উপর তাঁহার এত প্রভাব ছিল যে, অনেকেই তাহা জানিতেই পারে নাই।*

১৯০৭ আগষ্ট, নিবেদিতা জাহাজে উঠিয়া লন্ডন অভিমুখে রওনা হইলেন।

লন্ডন (সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)

নিবেদিতা লন্ডনে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার পূর্ব-পরিচিত মিসেস্ ওলে বুল এবং মিস্ ম্যাকলিওড্ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন, এবং তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আচার্য্য জগদীশ বসু এবং তাঁহার পত্নী, লেডী অবলা বসু, অল্প কিছুদিন পরেই, নিবেদিতার সহিত গিয়া মিলিত হইলেন। লন্ডনের জনতা হইতে কিছু দূরে "ক্লাপহ্যাম কমন্" (Clapham Common)। এখানে তিনি একটি সুন্দর বাসোপযোগী বাগান বাড়ী আসবাবপত্র সহ ভাড়া করিলেন।

প্রসিদ্ধ সংবাদিক, নিবেদিতার বন্ধু মিঃ র‍্যাট্ক্লিফ্ নিবেদিতার বাড়ির অতি নিকটেই থাকিতেন। নিবেদিতা তাঁহার কাছে যাইতেন। নিবেদিতার কাজের জন্য মিঃ র‍্যাট্ক্লিফ্-কে তাঁহার প্রয়োজন ছিল। নিবেদিতার যখন লন্ডনে যাইবার প্রয়োজন হইত, তখন তিনি ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে সেণ্ট্ জেম্স্ কোর্ট্ অঞ্চলে মিসেস্ ওলে বুলের প্রাসাদোপম গৃহে যাইয়া থাকিতেন।

প্রিন্স ক্রপাটকিনের* সহিত নিবেদিতা (১৮৯০–১৮৯৫) ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পূর্বেই (১৮৮৫ নভেম্বর) নিবেদিতা প্রিন্স্ ক্রপাটকিনের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

---

*"Her — Nivedita's — influence over young Bengal was greater than most people suspected, she probably did more to create an atmosphere of unrest than all the newspapers in the world."—"প্রবর্ত্তক" ১৩৩১, আশ্বিন।

** প্রিন্স ক্রপাটকিন্ — ১৮৪২, ৯ই ডিসেম্বর মস্কৌ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১, মস্কৌর নিকটে একটি সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিবেদিতার মৃত্যুর পরেও তিনি দশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার বৈপ্লবিক মতবাদ ও কার্য্যকলাপের দরুণ ইউরোপের বহু সহরে তিনি গ্রেপ্তার হন ও কারাবাস করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লন্ডনের নিকটে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইংল্যান্ডে সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত। তিনি প্রত্যেক দেশেই শাসন ক্ষমতার বিলোপ চাহিয়াছিলেন এবং সমাজের প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিলে (mutual aid) ইহা সম্ভব হইতে পারে। এই "mutual aid" মতবাদই ইতিহাসে তাঁহার অবদান। রাশিয়াতে বিপ্লব আরম্ভ হইলে তিনি ১৯১৭, জুন মাসে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর মস্কৌর নিকটে একটি সহরে বাস করেন এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। নিবেদিতার মাধ্যমে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

এই প্রিন্স ক্রপাটকিনের বাড়ীও বেশী দূরে ছিল না। সেখানে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত প্রিন্স ক্রপাটকিনের প্যারী (Paris) প্রদর্শনীতে (১৯০০) ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমেই হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ পরিচয় হয়। নিবেদিতা প্রিন্স ক্রপাটকিনের নিকটেও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, ভারতবর্ষ — তথা বাংলা দেশের — রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতেন, এবং বুদ্ধি, পরামর্শ নিতেন। এই রূপে লন্ডন সমাজ তাঁহার মনকে সতেজ করিয়া তুলিল।

এই সব বন্ধু-বান্ধবের সহিত তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার কথা বার্ত্তায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাঁহার কর্মপন্থাকে সমর্থন করিল। তিনি লন্ডনস্থ রুশীয় রাষ্ট্রদূতাবাসে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের — অথবা কুশাসনের — একটি বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরিলেন।

ইংরেজ ভদ্রলোকদের বাড়ীতে ছোট খাট অনুষ্ঠানে তিনি আহুত হইতে লাগিলেন ("She figured as an event in the re-unions in London."), মেয়েরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি করিয়া কলিকাতায় তিনি পুলিশের হাত এড়াইয়া চলিতেন, পুরুষেরা তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে হাউস অফ্ কমন্সে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়াছিলেন। তখন হাউস অফ্ কমন্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তুমুল তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। নিবেদিতা অবিলম্বে হাউস্ অফ্ কমন্সে গিয়া ভারত সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক শুনিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা সাংবাদিকের কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় খবর ইত্যাদি এইভাবে সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইলেন। মিঃ র‍্যাট্‌ক্লিফ ও মিঃ ষ্টেড্ তাঁহাকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি লন্ডনের কাগজে "Nealus" ছদ্মনামে ভারতের রাজনীতির কথা লিখিতে লাগিলেন, আবার অন্যদিকে বাংলা দেশের কাগজে লন্ডনে ভারতের রাজনীতির যে প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল তাহার খবর দিতে লাগিলেন।

এই সময় মিঃ কেয়র্ হার্ডি ভারতবর্ষ হইতে লন্ডনে ফিরিয়া গেলেন। নিবেদিতা কতকগুলি ভারতীয় যুবককে সঙ্গে লইয়া মিঃ কেয়র হার্ডিকে অভ্যর্থনা করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে তখন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর খবর লন্ডনে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড-ভ্রমে মিসেস্ কেনেডি ও মিস্ কেনেডির উপর নিবেদিতার অর্দ্ধশিক্ষিত যুগান্তরের দল, ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে দিয়া

বোমা ছুঁড়িয়া (১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল) নিহত করিল। ফলে, অরবিন্দ ও নিবেদিতার বিপ্লবী দলের যুবকেরা গ্রেপ্তার হইলেন (১৯০৮, ২রা মে)। অরবিন্দকে কারারুদ্ধ রাখিয়া এক বৎসর বিচার চলিল, জেলের মধ্যেই রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে সত্যেন বসু ও কানাই দত্ত গুলি করিয়া (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) হত্যা করিল। কানাইয়ের (১০ই নভেম্বর, ১৯০৮) ও সত্যেনের (২৩শে নভেম্বর, ১৯০৮) ফাঁসী হইয়া গেল। একদিকে সন্ত্রাসবাদীরা বোমা ছুঁড়িতেছে, অন্যদিকে গভর্ণমেন্ট যুবকদের বিনা বিচারে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইতেছে। লোকমান্য তিলককে ১৯০৮, জুলাই মাসে ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। দুই মাস পর্য্যন্ত জানাই গেল না, কোথায় তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। লন্ডনে "ক্যাক্স্‌টন হল"-এ তিলকের কারাদণ্ডের জন্য প্রতিবাদ সভা হইল। ইহার ফলে হাউস অফ্ কমন্সে একটি তুমুল ঝড় বাহিয়া গেল। ভারতবর্ষ হইতে গোপনে নিবেদিতা সংবাদ পাইলেন যে, সেখানে এক মহা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহার ফলে বিপ্লবপন্থীদের দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

নিবেদিতা শুনিলেন, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ কলিকাতার চরমপন্থী (extremist) এবং বিপ্লবপন্থী (revolutionary) কাগজগুলি গভর্ণমেন্ট বিলকুল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' 'বন্দেমাতরম্' এই সবগুলি কাগজের প্রকাশ গভর্ণমেন্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এ সংবাদে নিবেদিতা লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই স্থির করিলেন যে এই সমস্ত কাগজগুলি ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে পুনরায় প্রকাশ করিয়া গোপনে ভারতবর্ষে পাঠাইতে হইবে। অসীম সাহসিকতার সহিত তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাস জেল হইল। ২৭ শে অক্টোবর, ১৯০৭ ক্যাম্বেল হাসপাতালে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু হইল। বাংলার স্বদেশীর এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থার উত্তাপ লন্ডনে নিবেদিতার দেহ মনকে ছাইয়া ফেলিল। তাঁহার অন্তরে যে বিপ্লবের অগ্নিশিখা, তাহা আরও জ্বলিয়া উঠিল।

বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৮, আগষ্ট মাসে লন্ডনে গিয়া উপনীত হইলেন।

আয়ার্ল্যান্ড (সেপ্টেম্বর, ১৯০৮)

অতঃপর নিবেদিতা ১৫ বৎসর পর তাঁহার জন্মভূমি আয়ার্ল্যান্ডে তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহার ভাই কিছুদিন পূর্বে মাত্র বিবাহ করিয়াছেন। নিবেদিতার সঙ্গে মিসেস্ ওলে বুল, মিস্ ম্যাক্লিওড্, জগদীশ বসু ও তাঁহার পত্নীও গেলেন। নিবেদিতার ভাইয়ের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, ইংল্যান্ডের অধীনতা হইতে আয়ার্ল্যান্ডকে মুক্ত করিবার সমর্থনে যে সকল সংবাদপত্র

বাহির হয় তাহা গোপনে বাংলা দেশে পাঠান হইবে। তখন বাংলা দেশ অর্থই ভারতবর্ষ। আবার বাংলা দেশের বিপ্লবপন্থী কাগজগুলিও গোপনে আয়ার্ল্যাণ্ডে পাঠান হইবে।

নিবেদিতা আয়ার্ল্যাণ্ডে পৌঁছিয়াই স্বদেশের মাটি চুম্বন করিলেন, মাঠে কৃষকদিগকে ইংল্যাণ্ডের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন।

আমেরিকা (অক্টোবর, ১৯০৮)

নিবেদিতা মাত্র একমাস আয়ার্ল্যাণ্ডে থাকিয়াই আমেরিকা গমন করিলেন। মিসেস্ ওলে বুল এই যাত্রার জন্য পথের সমস্ত ব্যয়ভার সানন্দে বহন করিলেন। নিবেদিতা আমেরিকা পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাংলা দেশের পলাতক বিপ্লবী যুবকগণ মিসেস্ ওলে বুলের আশ্রয়ে আসিয়া জড় হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১১ মাস জেল খাটিয়া, এই অক্টোবরে তিনিও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কেন না বাংলা দেশে থাকিবার আর উপায় নাই। নিবেদিতা আমেরিকায় কেম্ব্রিজে মিসেস্ ওলে বুলের গৃহে তিন মাস অবস্থান করিলেন।

নিবেদিতা চিন্তা করিলেন যে, ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশের কোন স্থানে এই সকল পলাতক বিপ্লবীদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা। কিন্তু এজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। অতএব তিনি অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন।

তিনি বাল্‌টিমোর (Baltimore), বোষ্টন্ (Boston) ও নিউইয়র্ক (New York) সহরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বৎসরের শেষভাগে এই বক্তৃতার ফলে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। ("The close of 1908 brought her a shower of gold.")।

এক নিবেদিতা ছাড়া কে এই কার্য্য পারিতেন?

মাতার মৃত্যু

এই সময় (সম্ভবতঃ ১৯০৯, জানুয়ারী) ইংল্যাণ্ড হইতে তার আসিল যে, তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায়। তিনি তখনই ইংল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন। ওয়ার্কডেলস্থ কার্লি নামক স্থানে তাঁহার ভগ্নীর গৃহে তাঁহার পীড়িতা মাতার রোগ শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। নিবেদিতাকে দেখিয়া তাঁহার মাতা মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। এই হাস্যের ইঙ্গিত যে তাঁহার মাতার মনে শান্তি আসিয়াছে, তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে পর, মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি শক্ত এবং

অসাড় হইয়া গেলেন। কিন্তু কোন ভাবোচ্ছাস প্রকাশ করিলেন না। ("She looked at the whole thing as a spectator without any emotion.")। ইহা নিবেদিতা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দের মৃতদেহকে সকাল হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত হাত পাখা দিয়া বাতাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, ক্রন্দন করেন নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে নিবেদিতা সম্পর্কে বক্রোক্তি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

নিবেদিতা খবর পাইলেন যে, জগদীশ বসু ও তাঁহার পত্নী আমেরিকা হইতে লন্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন (১৯০৯, এপ্রিল) এবং আগামী জুলাই মাসে তাঁহারা ভারতে ফিরিবেন। এবং নিবেদিতাকেও তাঁহাদের সহিত ভারতে ফিরিতে হইবে।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামা

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা কাথিয়াবাড়বাসী একজন গুজরাটি ভদ্রলোক। তিনি ১৯০৫, জানুয়ারী মাসে লন্ডনে ("Indian Home Rule Socity") স্থাপন করিয়া 'Indian Sociologist' নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে থাকেন। ইউরোপ প্রবাসী ধনী ভারতবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া কয়েকটি ভারতীয় যুবককে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে লইয়া যান। প্যারী (Paris) নগরে ধনী ব্যবসায়ী শ্রীধর রঞ্জিৎরাণা. কৃষ্ণবর্মাকে এই কাজে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। যে সকল যুবক কৃষ্ণবর্মার প্ররোচনায় ইংল্যান্ডে গমন করেন, তাহার মধ্যে একজন বিনায়ক সবরকার। ইনি মারাঠি যুবক। লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউস, কৃষ্ণবর্মা ও তাহার সঙ্গীদের বিপ্লববাদের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল। ১৯০৭ সালে হাউস অফ কমন্সে কৃষ্ণবর্মার বিপ্লববাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। ইংল্যান্ড নিরাপদ স্থান নয় বলিয়া কৃষ্ণবর্মা প্যারী (Paris) নগরীতে আশ্রয় লন। কিন্তু তাঁহার পত্রিকা 'Indian Sociologist' তখনও লন্ডন হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইতিমধ্যে বাংলা দেশে ১৯০৮, মে মাসে আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ প্রভৃতি ধরা পড়ায়, লন্ডনে 'Indian Sociologist' এর উপর ব্রিটিশ পুলিশ কড়া নজর দেন, ইহার মুদ্রাকরকে দুই বার জেলে পাঠান। কৃষ্ণবর্মা তখন তাঁহার পত্রিকাখানিকে প্যারী (Paris) নগরীতে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। রুশীয় "নিহিলিষ্ট"-গণের অনুকরণে ভারতে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করাই কৃষ্ণবর্মার পরিকল্পনা ছিল।

নিবেদিতা খবর পাইলেন যে, ভারতের বিপ্লবপন্থী খবরের কাগজ যথাক্রমে লন্ডন, প্যারী (Paris) ও বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কথিয়াবাড়বাসী কৃষ্ণবর্মা এবং মাদাম কামার অধীনে একদল ভারতীয় বিপ্লবপন্থী যুবকেরা আসিয়া

সংঘবদ্ধ ভাবে মিলিত হইয়াছে। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাই বিপ্লবপন্থী কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা কৃষ্ণবর্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু মুল উদ্দেশ্য দুইজনেরই এক। এই দুইজনের মধ্যে দেখাশুনা হওয়ারই কথা। কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাইতেছি না। লন্ডনে না হইলেও প্যারী (Paris) নগরীতে দেখা হইতে পারিত। বার্লিনে পারিত। জেনেভাতেও পারিত।

বিপিনচন্দ্র পাল ও 'স্বরাজ' পত্রিকা

ভগিনী নিবেদিতার লন্ডনে আসিবার ঠিক এক বৎসর পরে বিপিনচন্দ্র লন্ডনে আসেন, এবং ১৯১১ সনে ভারতে ফিরিয়া যান। লন্ডন হইতেই বিপিনচন্দ্র ১৯০৯ সালে 'স্বরাজ' নামে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। সুতরাং একই কার্য্যে ব্রতী, পর্ব পরিচিত ভগিনী নিবেদিতার সহিত বিপিনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। কিন্তু সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিত লেখক কিছুহ বলেন না। এবং এই সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণও আমরা পাইতেছি না।

কিন্তু আমরা বিপিনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরঞ্জন পালের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, প্যারী (Paris) নগরীতে এক হোটেলে বিপিনচন্দ্রের সহিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। নিরঞ্জন পাল তখন উপস্থিত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র কৃষ্ণবর্মার সহিত রুশীয় প্রণালীতে ভারতে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। বিপিনচন্দ্র গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার বিরোধী। সুতরাং বিপিনচন্দ্র যে কারণে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, ঠিক সেই কারণেই ভগিনী নিবেদিতার সহিতও তিনি একমত হইতে পারেন নাই, অথবা পারিতেন না।

কার্জন উইলি হত্যা (১৯০৯, ১লা জুলাই)

নিবেদিতা ভারতে রওনা হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এই বিপ্লবপন্থী সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ কেন্দ্র স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং তিনি বার্লিন পর্য্যন্তও গমন করিলেন। জেনেভাতে আসিয়া "বন্দেমাতরম্" প্রকাশের অফিসে গমন করিলেন। জেনেভার এই 'বন্দেমাতরম্' অফিসেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লন্ডনে একজন হিন্দু যুবক কার্জন উইলিকে হত্যা করিয়াছে।

মদনলাল ধিঙ্গড়া একজন পাঞ্জাবী যুবক। তিনি হত্যা করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন। যথা, —

I attempted to shed English blood intentionally and of

purpose as an humble protest against the inhuman transportations and hangings of Indian youths ... I do not want to say anything in defence of myself, but simply to prove the justice of my deed, I hold the English peaple responsible for the murder of 80 millions of Indian people in the last 50 years, and they are responsible for taking away $100,000,000 every year from India to this country. Just as the Germans have no right to occupy England, so the English have no right to occupy India."

ধিঙ্গড়া কোন কিছুই গোপন করিলেন না। হত্যার কারণ, খোলসা করিয়া ব্যক্ত করিয়া গেলেন। হত্যাকারীদের এইরূপ বিবৃতি বা কৈফিয়ৎ ইতিহাসের উপাদান। ইহা না জানিলে, ইতিহাস লেখা যায় না। ভগিনী নিবেদিতা জেনেভা থাকিতেই ধিঙ্গড়ার বিবৃতি (statement) পাঠ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবর্মা এবং নিবেদিতা, এই দুইজনের কেহই হত্যাকাণ্ডের সময় লন্ডনে ছিলেন না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ধিঙ্গড়া পাঞ্জাবী ছাত্র বুঝিলাম,—কিন্তু তাঁহার মধ্যে বৈপ্লবিক খুনেব মন্ত্র কে দিল? কোথা হইতে আসিল? শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা? না,—ভগিনী নিবেদিতা? ইহারা দুজনেই ত সন্ত্রাসবাদী যুবকদের লইয়া বিপ্লবের আগুনের খেলা খেলিতেছিলেন।

নিবেদিতার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন (১৯০৯, আগষ্ট)

চারিদিকের বাতাস বিপদের বার্ত্তা বহন করিতেছে। নিবেদিতা বুঝিতে পারিতেছেন না তাঁর অদৃষ্টে কি ঘটিবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতে ফিরিয়া সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

তিনি জাহাজে উঠিলেন। সঙ্গে জগদীশ চন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী ছিলেন। জাহাজে উঠিবার সময়েই তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন ও "মিসেস্ মার্গট" (Mrs Margot) ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই নামেই, এবং সেই পোষাকেই, তিনি একাকী বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। কেহ কিছুই সন্দেহ করিল না। জগদীশ চন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী আগেই জাহাজ হইতে নামিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতা বোম্বাই হইতে সোজা ট্রেনে কলিকাতা আসিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন পথে (By an indirect route across the country) কলিকাতায় আসিলেন। এইরূপে দেখাইলেন যে, তিনি জগদীশ চন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নীর সহিত আসেন নাই, এবং তিনি ভগিনী নিবেদিতাও নহেন।

কলিকাতা বাগবাজারে তাঁহার নিজ গৃহে এই ছদ্ম বেশে আসিবার পরেও

তিন সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহির হন নাই। পরে যখন দেখিলেন যে, পুলিশ তাহাকে কোন রূপ সন্দেহ করিতেছে না, তখন তিনি আস্তে আস্তে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া ঘরের বাহির হইতে লাগিলেন। ইহা ১৯০৯ আগষ্ট মাসের ঘটনা। (এই প্রবন্ধের কতকগুলি ঘটনা ফরাসী জীবন চরিত হইতে গৃহীত। কেন না, অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য)।

সুরাট কংগ্রেস

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জেলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ভগিনী নিবেদিতা ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর কার্জন উইলি হত্যার অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার অনুপস্থিতকালে, বাংলা দেশে কি কি সব বিপর্য্যয় কান্ড ঘটিয়া নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি ঘটনার সহিত ভগিনী নিবেদিতার কোথায় কিরূপ যোগাযোগ ছিল তাহা সংক্ষেপে বলা দরকার।

রাওলাট কমিটি 'যুগান্তর' এর তিনটি প্রবন্ধের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন — (১৯০৭, ১১ই এপ্রিল, প্রবন্ধের নাম "Welcome unrest — whose historical name is revolt", (২) ১৯০৭, ১২ই আগষ্ট, — এই প্রবন্ধে বিপ্লবীদের দ্বারা দেশীয় সৈন্য ভাগাইবার কথা আছে; (৩) ১৯০৬, ২৬শে আগষ্ট, — এই প্রবন্ধের ইংরেজী তর্জমায় আছে "I am dreaming as if the future guerrilla were looting money and as if the future war had commenced in the shape of petty dacoities (gang robberies)" (Rowlatt Committee Report, p. 16).

শেষের দুইটি প্রবন্ধ ভূপেন্দ্রনাথ জেলে যাওয়ার পরের মাসেই প্রকাশিত হয়। এই তিনটি প্রবন্ধ হইতে অরবিন্দ ও নিবেদিতার বৈপ্লবিক দলের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, — প্রথম গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি; দ্বিতীয় গরিলা যুদ্ধ; তৃতীয়, প্রকাশ্য বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ। রাওলাট করিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 'টেকনিক্' 'আইরিশ ও রাশিয়ান' বিপ্লব-পদ্ধতির অনুকরণ। ভগিনী নিবেদিতা আইরিশ ও রাশিয়ান বিপ্লব পদ্ধতির 'টেকনিক্' অরবিন্দ প্রবর্ত্তিত গুপ্ত সমিতির দলকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং এই 'যুগান্তর'-এর বৈপ্লবিক দলটির শিক্ষাগুরু — ভগিনী নিবেদিতা, এবং ইহার দীক্ষাগুরু — শ্রী অরবিন্দ।

অরবিন্দ "ভবানীমন্দির" নামে একখানি বিপ্লববাদের চটিগ্রন্থ, — ১৯০৫ সনের শেষভাগে, বারীন্দ্রকুমারকে দিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। রাওলাট কমিটি এই চটিগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন — "The book is a

remarkable instance of perversion of religious ideals to political purposes," (R.C. Report, p. 17). অরবিন্দ এহ্ 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থে বলিলেন যে মা সন্ত্রাসবাদী যুবক দলকে সকল রকম বিপদ আপদে রক্ষা করিবেন; তাদের গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি কাজে সাহায্য করিবেন। ইহাই ছিল অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মে ধর্মের প্রেরণা। ইহা অতি প্রাকৃত; এবং নিবেদিতার বিপ্লবকর্মে 'আইরিশ রাশিয়ান' টেকনিক্ হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিবেদিতার টেকনিকে ধর্মের আবরণ নাই। অলৌকিক বা অতি প্রাকৃত কিছুই নাই। অরবিন্দ যে মা ভবানীর উপর কবিতা লিখিয়াছেন, সে রকম কোন কবিতা নিবেদিতা লেখেন নাই। বিপ্লবী অরবিন্দ ও বিপ্লবী নিবেদিতার পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য তাঁহাদের উভয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অরবিন্দের mysticism নিবেদিতায় নাই। নিবেদিতার বিপ্লববাদের technique অরবিন্দের জানা নাই। একে অপরকে সম্পূর্ণ করিয়াছে — একথা বলা চলেও — আবার চলেও না।

সংবাদপত্র দলনের সূচনা মাত্র ভগিনী নিবেদিতা 'যুগান্তর'-এর মামলা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তারপর 'বন্দেমাতরম্' মোকদ্দমায় (১৯০৭, ১৬ই আগষ্ট) অরবিন্দ গ্রেপ্তারের কথা শুনিবামাত্রই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া জামিনে খালাস হইলেন। এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়া বিপিনচন্দ্র পাল বিবেকের দোহাই দিয়া সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস জেল হইল। ওদিকে সুশীল সেন নামে ১৪ বছরের একজন বালকের সঙ্গে আদালত প্রাঙ্গনে ইন্‌স্পেকটর হেনরির সহিত ঘুষাঘুষি হওয়ায়, মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ঐ চৌদ্দ বৎসরের বালককে ১৫টি প্রচন্ড বেত্রাঘাতের দন্ড দিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। ফলে, সুশীল মুরারী পুকুর বাগানে গুপ্ত সমিতির দলে ভর্ত্তি হইল। 'বন্দেমাতরম্' কাগজের সম্পাদক কে প্রমাণ না পাওয়ায় অরবিন্দ খালাস পাইলেন। কেবল দুইটি নির্দোষীর শাস্তি হইল — বিপিনচন্দ্র পাল ও বালক সুশীল সেন।

ইতিপূর্বেই ২রা আগষ্ট, অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন না এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার কোনই হাত ছিল না। তাছাড়া পরিচালকবৃন্দের নিকট তাঁহার কার্য্যাবলী অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত মনে হইয়াছিল।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ১৩ই আগষ্ট 'সন্ধ্যা' কাগজে এক প্রবন্ধ লিখিলেন, — "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।" প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক। অতএব, ৩১শে আগষ্ট উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। উপাধ্যায় জবাব দাখিল করিলেন —

"I accept the entire responsibility of the paper and the

article in question. But I don't want to take any part in the trial, because I do not believe that in carrying out my humble share of this God-appointed mission of 'Swaraj', I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

ইহা বিপিনচন্দ্রের বিবেকের দোহাই অপেক্ষা কড়া জবাব। ভবিষ্যতে ভারতের কোন নেতাই এ রকম কড়া জবাব ইংরেজের আদালতে দেন নাই। মিঃ সি, আর, দাস — বিপিন পাল ও উপাধ্যায় এই উভয়ের পক্ষে আদালতে দন্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই দুই জনের একজনেরও অপরাধ অস্বীকার করেন নাই। যেমন আসামী, তার উপযুক্ত কৌসুলী। উপাধ্যায়ের জবাবে মিঃ সি, আর, দাশের হাত ছিল, একথা মিঃ সি, আর, দাশ আমাকে বলিয়াছেন। বিপিন বাবুর জবাব বিপিন বাবু নিজেই লিখিয়াছিলেন। উপাধ্যায় মিঃ সি আর, দাশকে বলিয়াছিলেন "চিত্ত, ফিরিঙ্গির আদালতে মিছে কথা বলা হবে না।"

২৭শে অক্টোবর, ক্যাম্বেল হাসপাতালে বিচারাধীন অবস্থায় ব্রাহ্মবান্ধবের মৃত্যু হইল। কাজেই তিনি যা বলিয়াছিলেন তা' ঠিক — "ইংরেজের সাধ্য নাই, আমাকে জেলে দেয়।"

এই সংবাদপত্র দলনের প্রতিক্রিয়া ইউরোপ প্রবাস কালে, ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে কিরূপে দেখা গিয়াছিল তাহা আমরা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। ইউরোপ প্রবাস কালে প্রতি পদক্ষেপে বাংলার রাজনীতির উদ্দাম ঝটিকার সহিত তিনি সমান তালে পা ফেলিয়াছেন। কি অদ্ভুত এই জীবনের গতিবেগ!

২৮শে অক্টোবর, বারীন্দ্র প্রমুখ নিবেদিতার যুগান্তরের দল মুরারীপুকুর বাগানে গিয়া "Battle for the Motherland" এর জন্য সম্যক আয়োজন আরম্ভ করিল।

১৯০৭, ১লা নভেম্বর, বড়লাট Seditious Meetings Act পাশ করিলেন। আগে সংবাদপত্র গেল, তারপরে সভা সমিতি বন্ধ হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে সভা সমিতি বন্ধ হওয়ায় গুপ্ত সমিতির কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিল না। কেন না প্রকাশ্যে সভা করিয়া সন্ত্রাসবাদীরা পরামর্শ করে না। ইহা অরবিন্দের মত এবং তিনি নিজেই ইহা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯০৭, ৬ই ডিসেম্বর, মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সের দিন, ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন উল্টাইবার জন্য লাইনের উপর বোমা ফাটান হয়। বোমা ফাটিয়াছিল, কিন্তু

ট্রেন উল্টায় নাই। সুতরাং রাত্রিতে ছোটলাটের নিদ্রারও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কোনদিন, কখনও তাঁহাকে এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে দেখা যায় নাই। যেমন ফুলার বধে, তেমনি ফ্রেজার বধের ব্যর্থতায় বারীন্দ্রের উপনেতৃত্বের অকর্ম্মন্যতা প্রত্যক্ষ করা গেল।

মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে অরবিন্দের সহিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। অরবিন্দ চরমপন্থীদের লইয়া পৃথক কনফারেন্স করিলেন। আমরা মেদিনীপুরেই সুরাট কংগ্রেসের পূর্বাভাস বুঝিতে পারিলাম। "Without them (moderates) if it must be" ইহাই অরবিন্দের মত।

মেদিনীপুর কনফারেন্সের দুই সপ্তাহ পর, এবং সুরাট কংগ্রেসের তিন দিন পূর্বে, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এ্যালেন গুরুতর আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু মরিলেন না — বাঁচিয়া উঠিলেন। এই গুপ্ত হত্যাকারী, বারীন্দ্র বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের দলভুক্ত ছিল না। থাকিলে, হয়তো মিঃ এ্যালেনের দেহ গুলীতে বিদ্ধ হইত না। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন— "অরবিন্দ বারীনের কথা ছাড়া আর কারও কথা কানে তোলেন না। আর অন্যে যে suggestion দেয়, ঠিক তার উল্‌টা করাই বারীনের স্বভাব।" (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ২৬০)।

তারপরেই সুরাট কংগ্রেস, লোকমান্য তিলক ও অরবিন্দ বোম্বাই মডারেটদের সহিত ঝগড়া করিয়া পৃথক হইয়া গেলেন। ২৬ শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। একখানি মারাঠি জুতা কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিল। মিঃ নেভিন্‌সন্ এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, —

"Suddenly something flew through the air — a shoe — Maratha shoe — reddish leather, pointed toe, sole studded with lead. It struck Surendranath Banerjee on the cheek; it cannoned off upon Sir Pheroze shah Mehta ... I caught glimpses of the Indian National Congress dissolving in chaos ... like Goethe at the Battle of Valmy, I could have said, 'To day marks the beginning of a new era, and you can say that you were present at it'." (New Spirit in India, Nevinson, p. 258)

এই কংগ্রেসে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হইয়াছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসের সময় উপাধ্যায় পরলোকে; বিপিনচন্দ্র বক্‌সার জেলে, নিবেদিতা বিলাতে। অরবিন্দ, সুরাট কংগ্রেসের পরেই ১৯০৮, জানুয়ারী মাসে বরোদায় গিয়া বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন, লেলের নিকট

যোগাভ্যাসের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন। অরবিন্দ ও লেলে, "দুইজনেই দিবারাত্র মুখোমুখী ধ্যানে কাটান।"

ফরাসী চন্দনগরের মেয়র মঃ তার্দিভিলার উপরেও বারীন্দ্রের দল বোমা ছুঁড়িয়াছিল। তার্দিভিলার গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই। এই বোমাটি হেমচন্দ্র প্যারিস হইতে সদ্য ফিরিয়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। ইহা সুরাট কংগ্রেসের পরের ঘটনা।

হেমচন্দ্র প্যারিস হইতে ফিরিয়া সমস্ত ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতিতে ছাইয়া ফেলিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বারীন্দ্র সুরাট কংগ্রেসের সময় একটি গুপ্তচক্র বসাইয়া অরবিন্দকে সুরাটেই লিখিয়াছিলেন, —

"Dear brother, — We must have sweets all over India ready made for emergency. I wait here for your answer."

— Barindra Kumar Ghosh

আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারিষ্টার মিঃ সি, আর, দাশ বারীন্দ্রের এই চিঠিখানিকে জাল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। উহা সুদক্ষ কৌসুঁলীর বাক্ বিভূতির কৌশল মাত্র। কেন না, বারীন্দ্র নিজে আমাকে বলিয়াছেন, তাহার এই চিঠি জাল নহে, সত্য চিঠি।

নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে তাঁহারই অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকের দল এই সব কান্ড করিতেছে। ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতিতে ছাইয়া ফেলা নিবেদিতার পরিকল্পনা। আরও উল্লেখযোগ্য যে নিবেদিতা গুপ্ত সমিতিগুলিকে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ পল্লীমুখী করেন নাই। গরিলা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদিতা ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথামত কাজ হয় নাই। এমন কি হেমচন্দ্রের কথামতও কাজ হয় নাই। অরবিন্দের এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। যদি থাকিয়া থাকে তো তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বারীন্দ্রের "হাম্ বড়াই" — অদূরদর্শিতা হঠকারিতা নিবেদিতার সুষ্ঠ বৈপ্লবিক পরিকল্পনাকে হঠাৎ ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিয়া ভন্ডুল করিয়া দিয়াছে। ইতিহাস এই রূঢ় সত্যকে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

অরবিন্দ গ্রেপ্তার — ১৯০৮

বিপিনচন্দ্র পাল ৯ই মার্চ বক্সার জেল হইতে মুক্তি পাইলেন।

তারপর ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য আদিষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। মাণিকতলার বাগান হইতেই তাঁহারা আদেশ পাইলেন।

অরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারুচন্দ্র দত্ত একত্র আদেশ দিলেন। ৩১ শে এপ্রিল রাত্রি ৮ টার সময় বোমা ছোঁড়া হইল। কিন্তু ভ্রমক্রমে মিসেস্ কেনেডি ও মিস্ কেনেডি এই দুই ইংরেজ মহিলার প্রাণ গেল। ১লা মে, অরবিন্দ কলিকাতায় টেলিগ্রাফে এই খবর পাইয়া বলিলেন, — "It was darkness, — it was darkness, — the mistake was due to that."— প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিল। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়া ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দান করিল। ১৯০৮, ১১ই আগষ্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দড়িটা ঠিকমত দেওয়া ছিল না। ক্ষুদিরাম ঘাতককে বলিল, "দড়িটা ঠিক করিয়া দাও।"

নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে — 'রাশিয়ান' ও 'সিন্ ফিন্' 'টেকনিকে' অনভিজ্ঞ, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতে কৌতূহলী, — হয় তো বিশ্বাসী — অরবিন্দের নেতৃত্বে ও সবজান্তা, হামবড়াই বারীন্দ্রের উপনেতৃত্বে, দেশ ও জাতি এই সব অমূল্য জীবন হারাইল। মারিবার জন্য গুলি ছুঁড়িয়া যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া যায় — মারিতে না পারা যায়, — তবে সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

২রা মে, কলিকাতায় অরবিন্দ এবং তাঁহার মাণিকতলা বাগানে বারীন্দ্র প্রমুখ যুবকদের গ্রেপ্তার করা হইল। অরবিন্দ এক বৎসর জেলে কাটাইলেন। ১৯০৯, ৬ই মে, বেকসুর খালাস পাইলেন। ইহা ব্যারিষ্টার মিঃ সি, আর, দাশের এক স্মরণীয় কীর্ত্তি। বারীন্দ্র প্রভৃতির যাবজ্জীবন দীপান্তর হইল। ইহাও মিঃ সি, আর, দাশের আর একটি কীর্ত্তি। কেন না, বারীন্দ্র প্রমুখদের ফাঁসীর আদেশ হইয়াছিল। তিনি হাইকোর্টে আপীলে উহা রহিত করিয়াছিলেন। জেলে অরবিন্দ ভগবানের দর্শন পাইলেন। দেয়ালে, বৃক্ষে সর্বত্র তিনি বাসুদেব দেখিলেন। কিন্তু জেলের মধ্যে আর এক বিস্ময়কর কান্ড হইল। নরেন গোঁসাইকে পুলিশ আগে ধরে নাই। বারীন্দ্র অযথা তাহার নাম প্রকাশ করিয়া ধরাইয়া দিল। সেই আক্রোশে নরেন গোঁসাই অরবিন্দ প্রমুখ সকলের অপরাধই 'এ্যাপ্রুভার' (approver, রাজসাক্ষী) হইয়া স্বীকার করিল। ১৯০৯, ১লা সেপ্টেম্বর জেলের মধ্যেই সত্যেন বসু ও কানাই দত্ত নরেন গোঁসাইকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিল। সে কথা বলা হইয়াছে। বারীন্দ্র কুমারকে এই হত্যার কথা আগে কিছুই বলা হয় নাই। তাঁহার নেতৃত্বে বিষম আঘাত পড়িল। সুতরাং সেই রাত্রেই জেলের মধ্যে বারীন্দ্র সকলকে লইয়া সভা করিয়া এই হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করিল।

নিবেদিতা কলিকাতায় থাকিলে বারীন্দ্র কুমার যেভাবে মাণিকতলা বাগানের সন্ত্রাসবাদী যুবকের দলটিকে অরবিন্দের স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া পুলিশের

হাতে ধরাইয়া দিল, এবং পুলিশের নিকট গুপ্ত সমিতির সুস্পষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সমস্ত কথা ফাঁস করিয়া দিল, এবং দিয়া "My mission is over" বলিয়া গুপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিল, তাহা সম্ভব হইত না। কেন না, এইরূপ কন্‌ফেশন্ (confession, স্বীকাররোক্তি) করিলে, নিবেদিতার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইবে।

আলিপুর বোমার মামলায় 'স্বদেশী' প্রজ্জ্বলিত অবস্থা চরমে উঠিল, তাহার পর হইতেই নির্বাপিত হইতে চলিল। ধুমায়িত-প্রজ্জ্বলিত-নির্বাপিত, স্বদেশীর পর পর এই তিনটি অবস্থায় কথাই আমরা বলিয়া আসিয়াছি।

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর প্রাণ গেল; নরেন গোঁসাই খুন হইল। ১০ই নভেম্বর, কানাইয়ের ফাঁসী হইল। ফাঁসীর হুকুম শুনিবার পর তাঁহার ওজন ১৬ পাউন্ড বাড়িয়া গিয়াছিল। ২৩শে নভেম্বর সত্যেনের ফাঁসী হইল।

৭ই নভেম্বর, ওভারটুন্ হলে ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলী করা হইল। ছোটলাট বাঁচিয়া গেলেন। ৯ই নভেম্বর, পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জীকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। হত্যাকারী আচার্য পি, সি, রায়ের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিল। জগদীশ চন্দ্র বসুর মাধ্যমে নিবেদিতাই এই সব যুবকদের আচার্য্য পি, সি, রায়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

২৪শে জুন, লোকমান্য তিলক ৬ বৎসরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়া মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ হইলেন। আগষ্ট মাসে বিপিনচন্দ্র বিলাত গমন করিলেন।

১১ই ডিসেম্বর, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিন বিহারী দাশ, ভূপেন্দ্র চন্দ্র নাগ, বিনা বিচারে নির্বাসিত হইলেন। এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ যেদিন মুক্তি পাইলেন সেদিন নিবেদিতা তাঁহার বিদ্যালয় মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লবে শোভিত করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ আরও অত্যাচার চাহিয়াছিলেন। অত্যাচারের চরম হইল। ইহাতে জাতির মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে, বিপিনচন্দ্র ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা সত্য হইল। দূরদর্শীতায় বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ অপেক্ষা অধিকতর সাবধানী এবং অগ্রণী। ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতি দূরের কথা, এই সব ঘটনায় এক মারাঠা ও পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেরই, — বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদির পিলে চমকাইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবর্ষে বাঙ্গালী এই পিলে চমকান কাজ অকুতোভয়ে করিয়াছিল। নিবেদিতা এই পিলে চমকান কাজের শিক্ষাগুরু।

মাদ্রাজ কংগ্রেস — ১৯০৮, ডিসেম্বর

সুরাটের দক্ষযজ্ঞের পর বাংলার অগ্নিযুগের যে জ্বলন্ত পরিস্থিতির মধ্যে এই কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল, তাহা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী আলোচনায় প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। এই অধিবেশনেও ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ দ্বিতীয়বার সভাপতি হইলেন।

এই কংগ্রেসে চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী কোন নেতাই উপস্থিত ছিলেন না। সুরাটে মিঃ তিলক ও অরবিন্দ ছিলেন। এ কংগ্রেসে তিলক মান্দালয় দুর্গে, আর অরবিন্দ আলিপুর জেলে আবদ্ধ। বিপিন পাল লন্ডনে, আর নিবেদিতা আমেরিকায় বাংলা হইতে পলাতক বিপ্লবী যুবকদের সাহায্যকল্পে টাকা সংগ্রহের জন্য বাল্‌টিমোর (Baltimore), বোষ্টন্ (Boston) ও নিউইয়র্ক (New york) সহরে জোর বক্তৃতা করিতেছেন। নিবেদিতা বসিয়া নাই। আর ইহাই নিবেদিতার জীবন চরিত।

ডাঃ ঘোষের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, ইহাতে বাংলার বিপ্লববাদের কথা আছে। তিনি বোম্বাইয়ের মডারেট নহেন, পুরাদস্তুর বাঙ্গালী। এমন কি ভাগিনী নিবেদিতার অতিশয় গুণমুগ্ধ। তিনি সভ্য জগতের একজন শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্। তিনি বলিলেন, দলন মূলক আইন (Represive Laws) গুপ্ত সমিতির জন্ম দিয়াছে। এবং যদিও আমরা সন্ত্রাসবাদকে খুবই নিন্দা করি, তথাপি ইহা একবার জন্মিলে সহজে মরে না। ("Secret crime invariably dogs the footsteps of coercion.*** We condemn Anarchism most, but Anarchism dies hard.")

নিবেদিতার মৃত্যুর পর টাউন হলের বিরাট শোক সভায় (২৩শে মার্চ, ১৯১২) সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ ঘোষ বলিয়াছিলেন যে, "কেহ কেহর মতে নিবেদিতা আমাদের কতিপয় যুবককে হয়তো বিপথে চালিত করিয়াছিলেন ("A few raw lads, too impetuous to be sober, went astroy.")। কিন্তু আমাদের জাতীয়-জীবনের যে উন্মেষ আমরা লক্ষ্য করি, উহা ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাতেই সম্ভব হইয়াছে ("If we are conscious of a budding national life at the present day, it is to a great extent due to the teaching of Sister Nivadita.")

লন্ডনে সন্ত্রাসবাদ

জেনেভায় ভগিনী নিবেদিতা কার্জন উইলির হত্যার সংবাদ প্রথম শুনিয়াছিলেন। হত্যাকারী পাঞ্জাবী যুবক মদনলাল ধিঙ্গড়ার বিবৃতিও তিনি জেনেভাতেই পাঠ

করিয়া ছিলেন। এদিকে বাংলা দেশ, কলিকাতায় — অরবিন্দের উপর এই কার্জন উইলি হত্যার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল? অরবিন্দ ১৯০৯, ৩১ জুলাই 'কর্মযোগীন'-এ লিখিলেন --

"Madanlal Dhingra. — We have no wish whatever to load the memory of this unfortunate young man with curses and denunciation. If a random patriotism was at its back, we have little hope that reflection will induce him to change his views. Here his country remains behind to bear the consequences of his act."

১৯০৯, ৮ই জুলাই মিঃ গোখ্‌লে, এই হত্যাকান্ডের মাত্র সাত দিন পরে, পুণাতে এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, ধিঙ্গড়ার এই অপকার্য্যে তাঁহার মাথা মাটিতে নুইয়া পড়িয়াছে। অরবিন্দের মাথা সে রকম কিছুই নুইয়া পড়িল না। তিনি স্পষ্ট লিখিলেন, এই হতভাগ্য যুবককে (ধিঙ্গড়া) আমি অভিশাপ (curses) দিতে চাই না, আর ধিক্কারও (denunciation) দিতে চাই না। কেন না, অরবিন্দ ২৪শে জুলাই 'কর্মযোগীন'-এ লিখিয়াছেন যে যাহার মধ্যে মা কালী প্রবেশ করেন, তাহার কাছে ন্যায় যুক্তি বা সম্ভব-অসম্ভব কিছুরই জ্ঞান থাকে না। ('Kali when She entered into a man cares nothing for rationality and possibility.")। সুতরাং ধিঙ্গড়ার মধ্যে যদি মা কালী প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে আর কে কি করিবে? ইহাই অরবিন্দের অভিপ্রায়।

মিঃ গোখ্‌লে ঐ পুণা বক্তৃতায় আরও বলিলেন, — যাহারা ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে তাহারা পাগলাগারদের বাহিরে পাগলামাত্র! ১৭ই জুলাই, অরবিন্দ, গোখ্‌লের এই বক্তৃতার জবাব দিলেন — "Exit Vibhishion"— অর্থাৎ মিঃ গোখ্‌লে আমাদের দেশে একজন দেশদ্রোহী ও স্বজাতিবিদ্রোহী, ত্রেতাযুগের বিভিষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। গোখ্‌লের গুণমুগ্ধ নিবেদিতা অরবিন্দের এই কথায় নিশ্চয়ই দুঃখ বোধ করিয়া থাকিবেন।

কার্জন উইলির হত্যা লইয়া কলিকাতা ও পুণায়, অরবিন্দ ও মিঃ গোখ্‌লের মধ্যে এইরূপ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া যখন দেখা দিতেছে — তখনও ভগিনী নিবেদিতা ইংল্যান্ডেই আছেন। মাত্র দুই সপ্তাহ পরেই তিনি ভারত অভিমুখে রওনা হইলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও বেলুড় মঠ

১৯০৯ আগষ্ট, মিসেস্ মারগট (Mrs Margot) কলিকাতা বাগবাজারে তাঁহার বাড়ীতে

পৌঁছিয়াই ছদ্মবেশ ও মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। আবার যে কে সেই ভগিনী নিবেদিতা হইলেন, তথাপি তিনি সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহির হইলেন না, লুকাইয়া থাকিলেন। তাঁহার বাড়ীর গলিতে পুলিশের আনাগোনা চলিতেছিল। তাঁহার স্কুলের ছাত্রীদের উপরেও পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিল। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে, নিবেদিতাকে যে পুলিশ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও গ্রেপ্তার করে নাই তাহার কারণ উপরওয়ালাদের উপর নিবেদিতার যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

এদিকে বেলুড় মঠের অবস্থাও খুব সঙ্গীন। সন্ত্রাসবাদী দুইজন যুবক দেবব্রত বসু এবং শচীন্দ্রনাথ ঐ মঠের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল। গভর্ণমেন্টের ধমকানি সত্ত্বেও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই দুইটি যুবককে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন নাই। ফলে মঠের চারিদিকে একটি পুলিশের বেষ্টনী দিবারাত্র পাহারা দিতেছিল। মঠের ভিতরেই হউক, অথবা বাহিরেই হউক, একথা সত্য যে, অনেক বিপ্লবপন্থী যুবক পুলিশের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এবং স্বামীজীর প্রচারিত ধর্মাদর্শে দেশমাতৃকার সেবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। গেরুয়া বস্ত্র পরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ সম্পর্কে কঠোর নিষেধ-বিধি প্রচার করিলেন। কোন অপরিচিত ব্যক্তির মঠে প্রবেশ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ভগিনী নিবেদিতার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন যখন প্রকাশ্যে ঘোষিত হইল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিলেন — "a due precaution" — যে নিবেদিতার কার্য্যাবলী ও দলের সহিত মাঠের কোনই সংশ্রব নাই। মঠ ও নিবেদিতার দল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। তথাপি বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা বলিয়া সগর্বে ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না। বেলুড় মঠ ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতার জীবন একটি বিচ্ছেদ রেখা টানিয়া দিল।

মদনলাল ধিঙ্গড়া

নিবেদিতা কলিকাতা ফিরিয়াই দেখিতে পাইলেন লন্ডনে কার্জন উইলিকে হত্যার জন্য অরবিন্দ, ধিঙ্গড়াকে কোনরূপ অভিশাপ ('Curse') অথবা ধিক্কার (denunciation) দিতে অসমর্থ বলিয়া (কর্মযোগীন, ৩১শে জুলাই) লিখিলেন। পরন্তু নিবেদিতার বন্ধু গোখ্‌লে তাঁহার পুণা বক্তৃতায় (৮ই জুলাই) ধিঙ্গড়াকে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিলেন। আবার নিবেদিতার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ধিঙ্গড়ার কার্য্যকে বিশ্বাসঘাতকাপূর্ণ ও কাপুরুষোচিত বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন (His was

a foul, treacherous and cowardly deed. — মর্ডাণ রিভিউ, আগষ্ট ১৯০৯) এবং সেই সঙ্গে আরও বলিলেন যে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা দ্বারা কোন দেশ বড় হয় না (Political assassination has never made any country great. — মডার্ণ রিভিউ, আগষ্ট ১৯০৮)। কিন্তু ধিঙ্গড়ার মৃতদেহকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী দাহ না করাইয়া গভর্ণমেন্ট যে কবর দিয়াছিলেন, এজন্য তিনি গভর্ণমেন্টের জিঘাংসা প্রবৃত্তিকে অতিশয় নিন্দা করিয়াছিলেন। (মডার্ণ রিভিউ, ১৯০৯ অক্টোবর)

সেপ্টেম্বর হইতেই নিবেদিতা পুনরায় মডার্ণ রিভিউ সম্পাদকের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই দুইজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকের যোগাযোগ একে অন্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে — পুর্ণতা প্রদান করিয়াছে। এই সম্পর্কে নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতের ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ — The audacious woman and the prudent man completed each other."

ধিঙ্গড়ার কার্য্যকলাপ শুধু ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডেই আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই, পরন্তু ইউরোপের বহু বিপ্লবের কেন্দ্রে অভূতপর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। আয়ার্ল্যান্ডে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল —"Eire ধিঙ্গড়াকে সম্মান করিতেছে।" ইহাতে কি নিবেদিতার হাত ছিল না?

আয়ার্ল্যান্ড যাহাকে সম্মান করিতেছে, আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লবী মেয়ে নিবেদিতাও যে তাহাকে সম্মান করিতেছেন, একথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। নিবেদিতা এই সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার নিস্তব্ধতার মধ্যেই ধিঙ্গড়াকে তাঁহার সমর্থন আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

যে রাজনৈতিক আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার জন্য সন্ত্রাসবাদীরা গুপ্তহত্যা করে, ধিঙ্গড়া তাহা ষোলকলায় পূর্ণ করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিল। একজন বা কয়েকজন ইংরাজকে মারিলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে না সত্য, কিন্তু ইহা বিপ্লববাদীদের পথ কিছুটা পরিষ্কার করিবে বলিয়াই সন্ত্রাসবাদীদের ধারণা। নতুবা তাহারা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে যাইবে কেন? প্রাণ দিতে যাওয়াটা তো কিছু ছেলেখেলা নয়। বিশেষতঃ মরণভীতু দেশে।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা

ধিঙ্গড়া শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার আশ্রিত পাঞ্জাবী যুবক। এবং শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও প্রেরিত হইয়া ধিঙ্গড়া কার্জন উইলিকে হত্যা করিয়াছিল। এই সম্পর্কে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

"আমি নৌরজীকে, ফিরোজ শা মেহতাকে এবং দিন শা ওয়াচাকে বুঝি।

ইহারা পার্শী ব্যবসায়ী। ইহুদিদের মত ইহাদের কোনো দেশেই জন্মভূমির আকর্ষণ নাই, ইহারা জানে স্বর্ণমুদ্রা ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী। কিন্তু বুঝিনা গোখ্‌লেকে। তুহ ব্যাটা মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, সেবাব্রতী, তোর কেন এই চাটুকার বৃত্তি? তোমরা জান ত, ধিঙ্গড়ার কার্য্যের পর ঐ ব্যাটা পুণায়, বোম্বেতে কিরূপ প্রলাপ বকেছে? সে চায় ভারতে ইংরেজ শাসন অটল রাখতে। তার সর্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির মেমোরেন্ডমেই একটি ধারায় আছে, ভারতে যে কোনো প্রকারে ব্রিটিশ রাজ্য অটুট রাখা এই সোসাইটির একটি উদ্দেশ্য। অথচ এমন লোককেও বেছে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সভাপতি করেন। গোখ্‌লে বলেছে, বিনা অস্ত্রে ভারত স্বাধীন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইংরেজের সঙ্গে অস্ত্রপরীক্ষা করা আরও দুই শতাব্দী সম্ভব নয়। সুতরাং আরও একশত বৎসর স্বাধীনতার কথা এবং ভাবাও উন্মাদের লক্ষণ বলে আমি মনে করি।

যাক্ আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। মোট কথা এই, গোখলের মন্তব্য হতে আমরা বুঝি যে অস্ত্র ব্যতীত ভারত উদ্ধার অসম্ভব। কবে কখন অস্ত্র আবশ্যক, সে সম্পর্কে তাঁর কাছে উপদেশ নিতে হবে না। তিনি জ্যোতিষী নহেন, ভবিষ্যৎদ্রষ্ট্রাও নহেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের দূরত্ব উভয় মেরুর মধ্যের দূরত্বের মত। আমি বলতে চাই, তোমরা বার্লিনে একটা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাতে পারবে? ধর, অর্থ যদি আমি চালাই, তোমাদের যদি কোনো আর্থিক ক্ষতি না হয়, —"

হেমচন্দ্র দাসকে তিনি বোমা প্রস্তুত শিক্ষার জন্য ব্যয় দিয়াছিলেন; অথচ হেমচন্দ্র অরবিন্দের যুগান্তরের দলের যুবক, আলিপুরের বোমার মামলায় একসঙ্গে ধৃত হইয়াছিলেন। এই সূত্রে দেখা যায় নিবেদিতা, অরবিন্দ ও শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাব সঙ্গে বিলক্ষণ যোগাযোগ ছিল। উপরে উল্লিখিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার সহিত নিবেদিতা ও অরবিন্দের যুগান্তরের দলের সম্পূর্ণ মতের মিল ছিল।

পরবর্ত্তী ইতিহাসেও এই পরিকল্পনার পদধ্বনি আমরা বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়ীবালামের তীরে (১৯১৫) এবং সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে জালালাবাদ পাহাড়ে (১৯৩০) শুনিতে পাইব। পরিশেষে নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর গৌরবজ্জ্বল কোহিমা ইম্ফল আক্রমণ ও বিজয়ে (১৯৪৪) এই পরিকল্পনার শেষ পরিপুষ্টি ও পরিণতি আমরা দেখিতে পাইব। পরবর্ত্তী ইতিহাসের এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলিকে একসঙ্গে গ্রথিত দেখিলে নিবেদিতা ও অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদের সূচনা ও গুরুত্ব ইতিহাস পথে আমরা বুঝিতে পারিব না।

ধিঙ্গড়া প্রসঙ্গে অপর দুইটি ভদ্রমহিলার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা

প্রয়োজন। সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কার্জন উইলির হত্যার পর বিলাতের 'টাইমস্' পত্রে ধিঙ্গাড়াকে প্রশংসা করিয়া এক পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। কি সর্বনাশ হায়দারাবাদ হইতে সরোজিনী নাইডু তাড়াতাড়ি টাইমস্-এ দুইখানি পত্র লিখিয়া বলিলেন যে "বীরেন্দ্রনাথের সহিত আমাদের কোনই সংশ্রব নাই। সে বিগড়াইয়া গিয়াছে। আমি, আমার পিতা এবং আমাদের পরিবারবর্গের সকলে নিজাম ভক্ত ও বৃটিশ ভক্ত।" বটেই তো!

মিসেস্ এ্যানি বেসান্ত লিখিলেন, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা নিজে বিদেশে সুখশান্তিতে সুরক্ষিত হইয়া ভারতবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। 'ভীরু' এই বিশেষণটি দ্বারাও কৃষ্ণবর্মার প্রকৃত চরিত্র বর্ণিত হয় না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন —

"বেসান্ত নিবে সে নৈবেদ্য
অর্পিত যা নিবেদিতায়।"

সংবাদ আসিয়াছে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা আলীপুর জেলে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকারী কানাই দত্তের একটি আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তি চন্দননগরে প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপ হইতে পাঠাইতেছেন।

অরবিন্দ ও নিবেদিতা

নিবেদিতা কলিকাতা পৌঁছিবার মাত্র তিন মাস পূর্বে অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় এক বৎসর কারাবাসের পর (৬ই মে, ১৯০৯) খালাস পাইয়াছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ সি, আর, দাশ তাঁহাকে খালাস করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন (Mr. Narton) তাঁহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে পারেন নাই। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিং-এ রাস্তায় ভ্রমণকালে মিঃ সি, আর, দাশের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার কোটের বোতামের ঘরে একটি বড় লাল গোলাপ ফুল গুঁজিয়া দিয়া স্মিতহাস্যে বলিয়াছিলেন "আমি আপনাকে মহৎ বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু আপনি এত মহৎ তাহা জানিতাম না — "I knew you to be great, but I did not know that you are so great."

এক বৎসর কারাবাস কালে অরবিন্দের গুরুতর মানসিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিয়া গীতার সাধন করাইয়াছেন। ফলে, তিনি কারাগারের অভ্যন্তরে একটি বৃক্ষকে বৃক্ষ না দেখিয়া বাসুদেব দেখিয়াছেন। কারাগারের উচ্চপ্রাচীর ও সিপাই শাস্ত্রীদের না দেখিয়া শুধু বাসুদেব দেখিয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন। না দেখিয়া মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু

তাঁহার দেখার ফলে বৃক্ষ বাসুদেবে পরিণত হয় নাই। বৃক্ষ বৃক্ষই রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে বলে দৃষ্টিভ্রম। এক বস্তু অবলম্বনে অপর বস্তু দেখা, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। উইলিয়াম জেমস্ (William James) প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদগণ ইহাকে বলিবেন "Illusion"— যাহা নয়, তাহাই দেখা, due to "misdircted imagination." আমাদের বৈদান্তিকেরা ইহাকে বলিবেন "অধ্যাস।" অরবিন্দ মে মাসে উত্তরপাড়া বক্তৃতায় এই বাসুদেব দেখার কথা সবিস্তারে বলিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে আর একটি গুরুতর পরিবর্ত্তনের কথাও বলিয়াছেন। আগে তিনি জাতীয়তাবাদকেই ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে সেই মত পরিবর্ত্তন করিয়া সনাতন ধর্মকেই (হিন্দুধর্ম) জাতীয়তাবাদ বলিয়া প্রচার করিতে আদেশ পাইয়াছেন। (I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith; I say that it is the Sanatana Dharma which for us is nationalism.)। মতের এই বিপরীতমুখী পরিবর্ত্তন পরবর্ত্তীকালে অরবিন্দকে রাজনীতি ছাড়িতে প্রেরণা দিয়াছে। যদিও রাজনীতি ছাড়ার আরও কারণ ছিল।

অরবিন্দ ১৯০৯, ১৯শে জুন 'কর্মযোগীন' পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লিখিলেন, শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ পূর্ণতর সমন্বয় দিয়া গিয়াছেন (Ramkrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Sankaracharya.)। ইহা এক অতি বিতর্কমূলক কথা। তর্কে প্রবৃত্ত হইবার এ স্থান নয়।

আমরা শুধু দেখিতেছি যে নিবেদিতা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই অরবিন্দ বঙ্কিমের প্রভাব বহুলাংশে কাটাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই প্রথম সংখ্যাতেই অরবিন্দ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত চিত্রকলাকে অতি উচ্চস্থান দিলেন। এমন কি পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে বড় সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাও নিবেদিতা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বের ঘটনা। বিপিনচন্দ্র পালের ইংল্যান্ডে প্রচারকার্য্যকে অরবিন্দ আদৌ পছন্দ করিতেছেন না — "Self-help and passive resistance are not the things to preach before the English people in England." অরবিন্দ তাঁহার যোগের কথাও এই প্রথম সংখ্যাতে খোলসা লিখিলেন যে, যোগের গূঢ়তত্ত্ব মানবজাতির নিকট প্রকাশিত না হইলে ক্রমোন্নতির পথে মনুষ্যজাতি ইহার পরের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে পারিবে না (Yoga must be revealed to mankind, because without it mankind cannot take the next step in the human evolution.)।

জেল হইতে বাহির হইয়া অরবিন্দ ৬ নং কলেজ স্কোয়ার তাঁহার ন' মেশো কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকুমার বাবু তখন আগ্রা জেলে আবদ্ধ। অরবিন্দ জেলে যাইবার পূর্বে সমগ্র দেশ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন, সব নিস্তব্ধ, কেহই 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করে না। তিলক মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ, তিনি গীতারহস্য লিখিতেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল লন্ডনে 'স্বরাজ' (Swaraj) পত্র প্রকাশ করিয়া Aetiology of Bomb লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, গভর্ণমেন্টের অত্যাচারই বোমা-কাল্টের (Cult) জন্ম দিয়াছে। গভর্ণমেন্ট ইহাতে বেজায় খাপ্পা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ ষ্টেড (Mr. Stead) 'রিভিউ অব রিভিউস' (Review of Reviews) পত্রিকায় ইহার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে, — "so careful, so judicious and so well imformed a study of causes which led to the apparition of the Bomb in India", এরূপ প্রশংসা আর দেখা যায় না। বাংলার অপরাপর এগারটি নেতা নির্বাসিত। অরবিন্দ একা কোন দিক সামলাইতে না পারিয়া অতিশয় অসহায় বোধ করিতে ছিলেন। ১লা জুলাই লন্ডনে কার্জন উইলিকে হত্যার পর ৩১শে জুলাই কলিকাতায় অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের গুজব উঠিল। অরবিন্দ দেশবাসীকে খোলা চিঠি লিখিলেন। এইরূপ তিনবার তাহাকে গ্রেপ্তারের গুজব উঠিবে এবং তিনবারই দেশবাসীকে খোলা চিঠি লিখিয়া গ্রেপ্তাবের জন্য প্রস্তুত হইবেন। অরবিন্দ লিখিলেন, — "Rumour that Calcutta police submitted case for my departation to the Govt ... In case of my departation and if I do not return from it, it may stand as my last political will and testament to my countrymen." (৩* শে জুলাই, ১৯০৯)

এই পরিস্থিতির মধ্যেই নিবেদিতা ছদ্মবেশে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অরবিন্দ অধীর আগ্রহে নিবেদিতার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন [It was she (Nivedita) for whom he (Aurobindo) had been waiting.]। দুই বৎসর পরে অরবিন্দ ও নিবেদিতা পুনরায় মিলিত হইলেন। এই দুই মহা বিপ্লবী সেদিন ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস সেই কথাই বলিবে এবং ভুল বলিবে না।

নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় ত্যাগ

পুরা দুই বৎসর অনুপস্থিতির পর নিবেদিতা দেখিলেন যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি আর চলে না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেও পাঁচ মাস বন্ধ থাকিবে। ক্রিশ্চিয়ানা

পারিবারিক কারণে আমেরিকা গিয়াছিলেন। নিবেদিতার ইচ্ছামত বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছিল না। টাকার অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, — "তিনি (নিবেদিতা) যে ইহার টাকা বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে — ইহা সত্য কথা।" আজ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আমরা নিবেদিতার উচ্চ প্রশংসায় মুখর। কিন্তু সেদিন বাগবাজারের চারিপাশের হিন্দু সমাজ এই বিদ্যালয়টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোনই চেষ্টা করে নাই। কলিকাতার আদি বাসিন্দা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তাঁহার প্রাপ্য যথোচিত সমাদর তিনি পান নাই। হিন্দুরা তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। যে কলঙ্ক সত্য, তাহাকে গোপন করিয়া লাভ নাই। স্কুল পরিচালনায় মঠের সন্ন্যাসীদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিবেদিতার স্কুল ছাড়িবার আর একটি কারণ। তাহারা নিবেদিতার শিক্ষা-পদ্ধতি বুঝিতে অক্ষম ছিলেন। তাহারা অবতার পূজা, অবতারবাদ প্রচার লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এবং শিক্ষা ব্যাপারে নিবেদিতার তুলনায় অনভিজ্ঞ। দরিদ্র হইলেই ছাত্রীরা সব সময়ে মেধাবী হয় না। এই বিদ্যালয়ে তেমন মেধাবী ছাত্রী জোটে নাই। কাজেই নিবেদিতার মত বিদুষী শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকার কোন গভীর ছাপ ছাত্রীদের উপর পড়ে নাই। কোন ছাত্রী এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার নামের গৌরব বহন করিয়া দেশের সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। এই বিদ্যালয় পরিচালনায় নিবেদিতা যে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহার শক্তির অপচয় হইতেছে। আরও অনেক কারণে তিনি স্কুলের পরিচালনা ভার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ভাল কাজে আমাদের দেশে যত বিঘ্ন অন্য দেশে তত নয়।

অজান্তা — ১৯০৯, ডিসেম্বর

বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু আমাদিগকে (১৪।৯।৫৩) নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া জানাইয়াছেন — "কলিকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব Mr. E, B, Havell সাহেবের বন্ধু Dr. W. Herringham এর পত্নী বিলাতের বিখ্যাত মহিলা চিত্রশিল্পী Mrs. C. J. Herringham ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অজান্তা গুহা চিত্রাবলীর নকল লইবার জন্য বিলাত হইতে আসেন। তাঁহার সহিত বিলাত হইতে Miss Davis নাম্নী আর একজন মহিলা শিল্পীও আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অনুজ্ঞাক্রমে The Modern Society of Oriental Art এর তরফ হইতে Mrs Herringham—এর সাহায্যের জন্য প্রেরিত হন।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ বস, তাঁহার পত্নী, Sister Nivedita ও Sister Christiana সঙ্গে Mrs Herringham-এর পূর্বে পরিচয় থাকায় সেই সময় বড়দিনের অবকাশে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা সেইখানে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে যান।

পর বৎসর ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে Mrs Herringham পুনরায় প্রতিলিপির জন্য বিলাত হইতে আসেন। এইবার শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীসমরেন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে সাহায্য করেন।"*

ঠিক এই সম্পর্কেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, — "ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়। বাগবাজারের ছোট্টঘরটিতে তিনি থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। নন্দলালদের কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন। অজন্তায় তো তিনিই পাঠালেন নন্দলালকে। একদিন আমায় নিবেদিতা বললেন, 'অজন্তায় মিসেস্ হ্যারিংহাম এসেছে। তুমিও তোমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দাও, তার কাজে সাহায্য করবে। দু'পক্ষেরই উপকার হবে। আমি চিঠি লিখে সব করে দিচ্ছি।' বললুম, 'আচ্ছা'। নিবেদিতা তখন মিসেস হ্যারিংহ্যামকে চিঠি লিখে দিলেন। উত্তরে মিসেস হ্যারিংহাম জানালেন, বোম্বে থেকে তিনি আর্টিস্ট পেয়েছেন তাঁর কাজে সাহায্য করবার। নতুন আর্টিস্ট জানেন না কাউকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিবেদিতা ছেড়ে দেবার মেয়ে নন। বুঝেছিলেন এতে করে নন্দলালের উপকার হবে। যে করে হোক পাঠাবেনই তাদের। আবার তাঁকে চিঠি লিখলেন। আমায় বললেন, খরচপত্তর সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে দাও অজন্তায়। এরকম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না। নিবেদিতা যখন বুঝেছেন এতে নন্দলালের ভালো হবে, আমিও তাই মেনে নিয়ে সমস্ত খরচ-পত্তর দিয়ে নন্দলালদের ক'জনকে পাঠিয়ে দিলুম অজন্তায়। পাঠিয়ে দিয়ে তখন আমার ভাবনা। কি জানি, পরের ছেলে, পাহাড়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলুম, যদি কিছু হয়। মনে আর শান্তি পাইনে, গেলুম আবার নিবেদিতার কাছে। বললুম, 'সেখানে ওদের খাওয়াদাওয়াই বা কি হচ্ছে, রান্নার লোক নেই সঙ্গে, ছেলেমানুষ সব।' নিবেদিতা বললেন, "আচ্ছা আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।" বলে গণেন মহারাজকে ডাকিয়ে আনলেন। ডাল, চাল, তেল, নুন, ময়দা, ঘি, আর একজন রাধুঁনি সঙ্গে দিয়ে বিলিব্যবস্থা বলে কয়ে গণেনকে পাঠিয়ে দিলেন নন্দলালের কাছে। তবে নিশ্চিন্ত হই।

* আমার ভগিনীসমা শ্রীমতী বীণা বসু বি, এ, শান্তিনিকেতনে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুর নিকট হইতে উপরে উদ্ধৃত লেখাটি পাঠাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। আমি এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। — লেখক

নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হত না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি।" (জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১১১-১২)।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা দেশেই নূতন ধরণে প্রাচ্য রীতিতে ভারতীয় চিত্রকলার উদ্ভব হয়। প্রসবাগারে ভগিনী নিবেদিতাই ইহার প্রথম ও প্রধান ধাত্রী। আজ দেশ-বিদেশে এই চিত্রকলার কতই না উচ্চপ্রশংসা শুনিতেছি। ইহা মনে করিয়া ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া আমরা কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারি না। একটা গোটা জাতির কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য।

লাহোর কংগ্রেস (১৯০৯, ডিসেম্বর)

পন্ডিত মদনমোহন মালব্য এই কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি গোঁড়া রক্ষণশীল কনৌজী ব্রাহ্মণ এবং অতি ঘোরতর মডারেট। তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় দীর্ঘ। তিনি তিনটি গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টার বেজায় নিন্দা করিলেন। মদনলাল ধিঙ্গড়া কর্ত্তৃক লন্ডনে কার্জন উইলি হত্যা, — নাসিকে ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Jackson কে হত্যা. — আমেদাবাদে Lord Minto-র গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ। অরবিন্দ, নিবেদিতা, যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়াছেন তাহা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক ও বিপিন পাল নাই, — দলহীন অরবিন্দ একা আসিতে পারেন নাই। নিবেদিতাকে কাশী কংগ্রেসে (১৯০৫) তিল ভান্ডেশ্বরের গলিতে এক জীর্ণ বাড়ীতে বসিয়া ঐ কংগ্রেসের কলকাঠি নাড়িতে দেখিয়াছি। কিন্তু আজ আর সে কংগ্রেসও নাই আর সে নিবেদিতাও নাই।

পন্ডিত মালব্য লালমোহন ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে ইংরেজী ভাষায় এ রকম বাগ্মী দেখা যায় না। রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুতেও তিনি গভীর শোক প্রকাশ করিলেন। নিবেদিতাকে রমেশচন্দ্র দত্ত কন্যার মত দেখিতেন ও স্নেহ করিতেন। নিবেদিতাও রমেশচন্দ্রের অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। এই সম্পর্কে বিনয় সরকার বলিয়াছেন "নিবেদিতা লোকগুলোকে বাজিয়ে নিতে জানে।"

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

অরবিন্দ 'ধর্ম' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া (23rd August, 1909) প্রথম সংখ্যাতেই লিখিলেন "আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা—মতির একতা নাই, গতির স্থিরতা নাই, অগ্রগামী পশ্চাদগামী, বিপ্লববাদী শান্তিপ্রিয়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়। ... এই সময় অগ্রসর হইবার দিন নহে, আত্মরক্ষার দিন, যেন উদ্দাম আচরণে

বিপক্ষকে সুযোগ দান না করি, কিংবা ভীরুতা প্রকাশে নিগ্রহনীতিকে সফল না করি।"

সন্ত্রাসবাদীরা অরবিন্দের এই উপদেশ গ্রহণ করিল বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। নিবেদিতা এই পরিস্থিতির মধ্যেই দুই বৎসর পর কলিকাতায় ফিরিয়া অরবিন্দের সহিত মিলিত হইলেন।

গভর্ণমেন্ট অনুশীলন সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। যুগান্তরের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনুশীলনের দলও বন্ধ হইল। অরবিন্দ কর্মযোগীনে লিখিলেন —"Government is determined to allow no organisation to exist among the Bengalees."

১২ই পৌষ, 'ধর্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন "আবার জাগো — বঙ্গবাসী অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ; যে নবজাগরণ হইয়াছিল, যে নবপ্রাণ সঞ্চারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ... কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য না কর।"

সন্ত্রাসবাদ ও বোমা নিক্ষেপের কার্য অরবিন্দ বন্ধ করিবার কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা তাহা শুনিতেছে না।

অরবিন্দের নির্বাসন বিভীষিকার ২য় ও ৩য় দফা

সন্ত্রাসবাদীরা যখনই একটা গুপ্তহত্যা করে, তখনই অরবিন্দের নির্বাসনের গুজব রটে। আর তিনিও তখনই দেশবাসীর নিকট একটি খোলা চিঠি লিখিয়া প্রস্তুত হন। নাসিকে Mr. Jackson-কে হত্যার পর অরবিন্দকে নির্বাসনের গুজব রটিল, তিনিও 'কর্মযোগীনে' (২৫শে. ডিসেম্বর) "To my countrymen" এই খোলা চিঠি লিখিলেন।

আবার তৃতীয়বার অরবিন্দকে নির্বাসনের গুজব উঠিল। অরবিন্দ কর্মযোগীন পত্রিকায় "Menace of Deportation" লিখিলেন। ধর্ম পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন, যাকেই নির্বাসন কর এবং যত জনকেই নির্বাসন কর 'কালচক্রের গতি থামিবার নয়।"

গোয়েন্দা আলম্ খুন — ১৯১০, ২৪শে ডিসেম্বর

আলীপুর বোমার মামলায় গোয়েন্দা আলম্ Mr. Norton-এর দক্ষিণ হস্ত ছিল। কর্মযোগীনে লেখা হইল — The Victim was the righthand man of Mr. Norton in Alipore Bomb case".

"হত্যাকারী রিভলবার দিয়া পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। আলম্ তৎক্ষণাৎ সটান চিৎ হইয়া পড়িয়া যায় এবং দু'একবার গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া মরিয়া যায়। গুলি খাওয়ার ৩।৪ মিনিট পরে আলম্ মরিয়া যায়।" [ধর্ম, ১৮ই মাঘ, (১লা ফেব্রুয়ারী)]

অরবিন্দ ২৯শে জানুয়ারী কর্মযোগীনে লিখিলেন, "হাইকোর্টে আলমকে হত্যা, হত্যাকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। — ("Boldest of the many bold acts of violence ... They (the terrorists) prefer public places and crowded buildings,— Nasik — London — Calcutta — Goshwami in Jail — these are remarkable features.)" অরবিন্দ "Boldest of the bold" বলায় এক হিসাবে প্রশংসাই করিলেন। নিন্দার মত তো শুনাইল না।

গোয়েন্দা আলমের খুন অরবিন্দের প্রস্থানাভিমুখের গতিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিবে, ইহা আমরা একমাস পরেই দেখিতে পাইব।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে, আলমকে খুনের পূর্বে অরবিন্দকে স্পষ্ট জানান হইয়াছিল এবং তিনিও সম্মতি দিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে খবরের কাগজে সন্ত্রাসবাদীদের "উদ্দাম আচরণ" করিতে নিষেধ করিয়া গোপনে তিনি কি গুপ্তহত্যার পরামর্শ দিয়াছিলেন? প্রকৃত ঘটনা জানিলে এক নিবেদিতাই জানিতেন। নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতে সাহস করিয়া এসব কথা লেখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ঐ গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ হয় নাই।

নির্বাসিতের মুক্তি

যে নয়জন নেতা ১৯০৮ ডিসেম্বরে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ১৩ই ফেব্রুয়ারী মুক্তি পাইলেন। অরবিন্দ ১৬ই ফেব্রুয়ারী চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া রেঙ্গুন মেইন ষ্টিমারে, কলিকাতা আগত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সতীশ চ্যাটার্জীকে অভ্যর্থনা করিলেন।

নিবেদিতা এই মুক্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার বিদ্যালয়ের তোরণদ্বারে মঙ্গলঘট কদলীবৃক্ষ ও আম্রপল্লবে শোভিত করিলেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতা এক সঙ্গেই কাজ করিতেছেন। Viceroy Lord Minto বক্তৃতায় বলিলেন যে "We are now face to face with an anarchical conspiracy waging war against British and Indian Communities alike."

অরবিন্দ Lord Minto-র বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন যে

ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা anarchist নয়। তাহারা অরাজকতা চায় না। সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজ্যশাসনই চায়।

"Anarchism — It is different from terrorism. The Irish Fenians did the same thing as the Indian Terrorists are now practising, but nobody ever called them Anarchists."

[Karma-yogin, 12th February]

অরবিন্দ চন্দননগর প্রস্থানের মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্বে বড়লাটের কথার প্রতিবাদে আয়ার্ল্যাণ্ডের "সিন্ ফিন্"-দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ভারতের সন্ত্রাসবাদীদিগকে সমর্থনই করিয়া গেলেন। অরবিন্দের কথার মধ্যেই আমরা নিবেদিতার সমর্থনও পাই।

বড়লাট যখন সভা সমিতির আন্দোলনকারী নেতাদের মুক্তি দিতেছেন ঠিক সেই সময়ে অরবিন্দকে নির্বাসনের জন্য গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছেন কেন? বড়লাট কি অরবিন্দকে সভা সমিতির নেতা মনে করেন না? পরন্তু বাঙ্গালী "সিন ফিন"-দের নেতা মনে করেন? যদি করেন তবে তা ঠিকই করেন ভুল করেন না। তবে একই সঙ্গে নিবেদিতার গ্রেপ্তার যে কেন হইল না তাহার অবশ্যই কারণ ছিল। সে কারণ অদ্যবধি আমাদের নিকট অনেকাংশে অজ্ঞাত।

নিবেদিতার পরামর্শ ও অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থান

নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতে আছে যে বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের যোগীন মা তাঁহার এক আত্মীয় গোয়েন্দা পুলিশ শশীভূষণ দের নিকট শুনিলেন যে অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি মঠে ফিরিয়া স্বামী সারদানন্দকে এই খবর দিলেন। খোঁজ নিয়া জানা গেল খবর ঠিক। স্বামী সারদানন্দ গণেন মহারাজকে অরবিন্দের নিকট পাঠাইলেন। গণেন মহারাজ দৌড়াইয়া কর্মযোগীন অফিসে অরবিন্দের নিকট গেলেন। অরবিন্দ এই সংবাদ শুনিয়া কিছুক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন। পরে গণেন মহারাজকে বলিলেন "যদি নিবেদিতা কর্মযোগীনের ভার নেয় তবে আমি চন্দননগর যাইব।" তিনি তাঁহার শেষ লেখা "Open Letter to my fellow citizens, my political testament" লিখিলেন এবং সেই রাত্রেই নিবেদিতার বাড়ী গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা করিয়া চন্দননগর প্রস্থান করিলেন।

নিবেদিতা অতঃপর কয়েক সপ্তাহ কর্মযোগীন পত্রিকা চালাইলেন।

চন্দননগরে অরবিন্দ (মার্চ ১৯১০)

সমস্ত মার্চ মাস অরবিন্দ চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়ীতে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন এবং সেখান হইতে বাগবাজারে নিবেদিতার সহিত এবং কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র, তাঁহার মাসতুত ভাই সুকুমার মিত্রের সহিত লোক পাঠাইয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। ইহা আমরা সুকুমার মিত্রের নিকট শুনিয়াছি। মতিলাল রায় তাঁহার এক কাঠের গুদামে অন্ধকারে অরবিন্দকে লুকাইয়া রাখিতেন। মতিলালের স্ত্রীও ইহা জানিতেন না। তিনি একদিন প্রাতে গামছা পরিয়া কৌতূহলবশতঃ ঐ গুদামঘর খুলিতেই দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে এবং তাঁহার দিকে "মিটমিট করিয়া চাহিয়া আছে।" মতিলাল রায়ের স্ত্রী আদুল গায়ে ছিলেন, লজ্জায় জিভ কাটিয়া দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন। পরক্ষণেই মতিলাল রায় ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই অরবিন্দ বলিলেন, "Moti, Moti I have seen Kali"। যিনি আলিপুর জেলে বৃক্ষতে বাসুদেব দেখিয়াছিলেন তিনি মতিলাল রায়ের স্ত্রীকে মা-কালী দেখিলেন। বৃক্ষ যেমন বাসুদেবে রূপান্তরিত হন নাই, মতিলাল রায়ের স্ত্রীও তেমনি মা-কালীতে রূপান্তরিত হন নাই। যে মতিলাল রায়ের স্ত্রী ছিলেন তাহাই রহিয়া গেলেন। অরবিন্দের এই ভ্রমকে রজ্জুতে সর্পভ্রম বলা যায়। মনঃস্তত্ত্ববিদ্ W. James ইহাকে বলিয়াছেন, "misdirected imagination"। বেদান্ত ইহাকে বলে "অধ্যাস"। যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে তাই দেখা।

অরবিন্দের প্রস্থানের পর নিবেদিতা

অরবিন্দ কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ কোন খবর দিতে পারে না। মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। গুজব রটিল তিব্বতে মহাত্মাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। কেহ বলিল বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে।

নিবেদিতা ইহার প্রতিবাদ করিয়া কর্মযোগীনে লিখিলেন "শ্রী অরবিন্দ এখানেই আছেন। (Sree Arabindo is hear) তিনি সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে থাকিতে চান, কাজেই তাঁহার ঠিকানা গোপন রাখা হইয়াছে।" নিবেদিতা, অরবিন্দ চলিয়া যাওয়ার দুই-তিন সপ্তাহ পর, নিজের নামেই কর্মযোগীনে লিখিলেন ...

I believe in Indiia, one, indissoluble, indivisible. National unity rests on the foundation of common heart, common interest, common love.

I believe that the force which is expressed in the Vedas and the Upanishadas, in the formation of religions and empires, in the science of savants and in the meditation of saints

is born once more amongst us and has to-day the name of Nationality.

I believe that present India has taken the plunge from deep roots in her past and that before her rise a glorious future.

O, Nationality! Come to me! Bring me joy or sorrow, glory or approbrium, but grant that I may belong to thee!"

Nivedita
Karma-yogin, 28th Falgoon 1316
(Saturday, 12th March 1910)

অরবিন্দ পন্ডিচেরী পৌঁছিলে নিবেদিতা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ ইংরেজী কাগজে ছাপাইবার জন্য অরবিন্দের ঠিকানা পাঠাইয়া দিলেন (১০ই এপ্রিল, ১৯১০)। অরবিন্দ সম্পর্কে যে দায়িত্ব নিবেদিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সর্বতোভাবে তিনি পালন করিলেন।

নিবেদিতার তীর্থ ভ্রমণ

কিছুকাল উদাসিনীভাবে কাটাইয়া নিবেদিতা উত্তরবঙ্গে স্বামী সদানন্দকে দেখিতে গেলেন। তিনি তখন রুগ্নশয্যায় আর্ত দীনহীন অবস্থায় রোগ ভোগ করিতেছিলেন। প্রলাপের অবস্থায় বিড় বিড় করিয়া তিনি নিবেদিতাকে শিবের আবাস কৈলাসধাম যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। নিবেদিতা আচার্য্য জগদীশ বসু ও লেডী অবলা বসুকে হিমালয়ের তীর্থগুলি ভ্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহারাও উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গ্রীষ্মের ছুটিতে নিবেদিতাকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

প্রথমে তাঁহারা কয়েদিন হরিদ্বারে কাটাইলেন। নিবেদিতা ব্রহ্ম-কুন্ডের ঘাটে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের পিছনে বসিয়া শিবের ও গঙ্গার আরতি দেখিলেন। রজঃ কুড়াইয়া পকেটে রাখিলেন। আর শিবময় চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

জগদীশ বসু ও তাঁহার ভাগিনেয় অরবিন্দ বসু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। আর লেডী বসু ও নিবেদিতা পাল্কীতে চড়িলেন। এইরূপে তাঁহারা এক চটীর পর আর আর এক চটী অতিক্রম করিয়া অবশেষে কেদারনাথে গিয়া উপনীত হইলেন। মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হইল। জনতার ধাক্কা খাইতে খাইতে প্রায় পিষিয়া গিয়া তাঁহারা বহু কষ্টে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। "শিবোহম্, শিবোহম্" ধ্বনিতে দিঙ্‌মন্ডল পূর্ণ হইল। সারারাত্রি ঐরূপ গেল। নিবেদিতা অচলভাবে সময় কাটাইলেন। কেদার নাথ সম্পর্কে নিবেদিতা নিজে লিখিয়াছেন, — "Above all, Kedar Nath is the shrine of the sadhus. As in the days of Buddhism, so in those of Sankaracharya, and as then so also now the

yellow robe gleams and glistens in all directions." (The Northern Tirtha — by Nivedita, p. 47)

নিবেদিতা শিবের ধ্যানে এতটা তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে আচার্য্য জগদীশ বসুর ভাগিনেয় অরবিন্দ বসু হতভম্ব হইয়া গেলেন। কেন না বোসেরা ব্রহ্মজ্ঞানী। সুতরাং শিবভাবের ছোঁয়াচ তাঁহাদের গায়ে লাগে না। তাঁহারা শুধু হিমালয় পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন। যুবক অরবিন্দ তাহার মাতুল আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রকে নিবেদিতার রকম সকম বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরদিন দেখা গেল, নিবেদিতা তাঁহার কপালে ভস্ম লেপন করিয়াছেন। তাঁহার মত একজন বিদুষী মহিলার পক্ষে এইরূপ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া অতিশয় অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। যুবক অরবিন্দ নিবেদিতাকে একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল, 'এসব ব্যাপারের অর্থ কি?" নিবেদিতা বলিলেন, 'তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না। আমি প্রাতে যখন পর্বতের উপর দিয়া বেড়াইতে যাই, তখন তুমি আমার সঙ্গে যাইও। কিন্তু কোন কথা বলিও না।'

বদ্রীনারায়ণ সম্পর্কে নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ... "Badri itself, with glaciers and snows its velvet terraces and its silver moonlight, was enough, Our only regret was the shortness of our three days' stay."

— (The Northern Tirtha—by Nivedita p.62)

বদ্রীনারায়ণের সহিত তিব্বত এমন কি চীন পর্য্যন্ত যাইবার পথ এক সময়ে ছিল। নিবেদিতা তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া —

জয় কেদারনাথ স্বামী কী জয়।
জয় বদ্রী বিশাল কী জয়।।*

১৯১০, জুলাই হইতে ডিসেম্বর

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও লেডি অবলা বসুর সহিত কেদারনাথ ও বদ্রিনারায়ণ তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া নিবেদিতা জুলাই মাসে বাগবাজারে ফিরিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে দীক্ষা দিবার সময় "শিবঃ, শিবঃ শিবঃ," এই মন্ত্র জপ করিতে বলিয়া ছিলেন। হিমালয় শিবের আবাসভূমি, সুতরাং হিমালয়ের তীর্থ ভ্রমণের সময় নিবেদিতা শিব ধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশ বসুরা

* নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিত ও নিবেদিতা লিখিত "The Northern Tirtha গ্রন্থ এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁহারা শিব মানেন না। নিবেদিতার মত এতবড় একজন বিদুষী মহিলার পক্ষে এইরূপ শিবময়ভাবে তন্ময় হওয়াতে তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ পন্ডিচেরীতে স্থিতিলাভ করিয়াছেন। নিবেদিতার যুগান্তরের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরদের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। মিঃ সি, আর, দাস হইকোর্টে আপীল করিয়া ফাঁসীর হুকুম রহিত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ মঞ্জুর করাইয়াছেন। ১২ই ডিসেম্বর 'মহারাজা' স্টীমারে বারীন্দ্রেরা আন্দামানে রওনা হইয়া যাইতেছেন। অরবিন্দ প্রস্থানের পূর্বে কর্মযোগীনে লিখিয়াছিলেন যে, "Government is determined to allow no organisation to exist among the Bengalees."

বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই কথা বলিয়া সন্ত্রাসবাদীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তখন কি অরবিন্দ, কি নিবেদিতা কেহই তাঁহার কথা শোনেন নাই। এখন বিপিনচন্দ্রের কথাই ঠিক হইল। অতি ভয়াবহ পরিস্থিতি। স্বদেশী আন্দোলন সম্পূর্ণ নির্বাপিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। নিবেদিতার মনে হতাশ ভাব আসিয়াছে।

তিনি মনে শান্তি পাইবার জন্য মাতা সারদাদেবীর নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার স্কুলটির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ইহার পরিচালনার ভার মঠের সন্ন্যাসীরা নিয়াছেন — "Materially she was separated from her school." — (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩৩৩)।

স্বামী বিবেকানন্দের একখানি সম্পূর্ণ জীবন চরিত লিখিবার জন্য আমেরিকা হইতে তিনি অনেক চিঠিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেগুলিও তিনি মঠের সন্ন্যাসীদের হাতে তুলিয়া দিলেন।

এখন তিনি কি করিবেন ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বাগবাজারের বাড়ীতে এই সময় যাওয়া আসা করিতেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ইংরেজী তর্জমার জন্য নিবেদিতার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধগুলি অতুলনীয়। এই প্রবন্ধের সবগুলি এখনও পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে ছাপা হয় নাই। মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত এই সময় তাঁহার ঘনিষ্ঠতা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কংগ্রেস, ১৯১০, ডিসেম্বর — এলাহাবাদ

এই কংগ্রেসের সভাপতি স্যর উইলিয়ম ওয়েডরবার্ণ (Sir William Wedderburn)। তিনি দ্বিতীয়বার সভাপতি হইলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই কংগ্রেসে তিনি প্রথমবার সভাপতি হন। তিনি বলিলেন স্থলপথে ও জলপথে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে ইংরেজের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অতএব, ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই ভারতবাসীর আদর্শ হওয়া উচিত। সুর অনেক নামিয়া গিয়াছে। ১৯০৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজীর "স্বরাজের" আদর্শ লোকমান্য তিলক ও বাংলার চরমপন্থীরা প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতার কাছাকাছি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তখন "Protection from foreign aggression by sea and land" — এই কথাই উঠে নাই। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সভাপতি বলিলেন যে ইহাতে কোনই ফল হয় নাই। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা কেবল "wholesale prosecutions and much personal sufferings" ব্যতীত দেশের উন্নতি একচুলও অগ্রসর করিয়া দিতে পারে নাই।

নিবেদিতার কার্য্যকলাপের উপর ইহা নিঃসন্দেহে এক অতি সুতীব্র কটাক্ষ। নিবেদিতা ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ করিয়া থাকিবেন।

নিবেদিতার আমেরিকা গমন — Mrs. Ole Bull-এর মৃত্যু

শীতকালে (১৯১১ জানুয়ারী) আমেবিকা হইতে খবর আসিল যে "ধীরামাতা" (Mrs. Ole Bull) মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়াছেন। এবং তিনি ভগিনী নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। মিসেস্ ওলে বুলকে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার "দ্বিতীয় মাতা" (Second Mother) বলিতেন ও মিসেস্ ওলে বুল আচার্য্য জগদীশ বসুকেও পোষ্যপুত্র (adopted son) বলিয়া স্নেহ করিতেন। মিসেস্ ওলে বুল এক অতি ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। তিনি নরওয়ের (Narway) অধিবাসীনী ছিলেন। যে দুই বৎসর ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতা হইতে পুলিশের ভয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেইকালে জগদীশ বসু ও তাঁহার পত্নী লেডী বসু ভগিনী নিবেদিতার সহিত অনেক সময় পাশ্চাত্য দেশে একত্রে কাটাইয়াছেন। মিসেস্ ওলে বুলের সহিত তাঁহার এই মানসপুত্র ও কন্যার (জগদীশ বসু ও নিবেদিতা) সাক্ষাৎ হইয়াছে। এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতার টাকার অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছিল। ভারত — রিশেষতঃ বাংলা দেশ হইতে পলাতক সন্ত্রাসবাদী যুবকদের আমেরিকায় বসবাস করিবার জন্য তিনি প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। মিসেস্ ওলে বুল এই সময় তাহার মানসকন্যা নিবেদিতাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন

এবং জগদীশ বাবুর বোস্ ইন্‌ষ্টিটিউট (Bose Institute) প্রতিষ্ঠাকল্পেও অনেক অর্থ দিয়াছিলেন। নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতকার লিখিয়াছেন যে, "নিবেদিতাকে তাহার স্কুলের জন্য দুই হাজার পাউন্ড এবং জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁহার বসু ইনষ্টিটিউটের জন্য তিন হাজার পাউন্ড দিয়াছিলেন।"—(ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩৩৪)।

ভগিনী নিবেদিতা যখন মিসেস্ ওলে বুলের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শেষ মুহূর্ত্তের আর অধিক দেরি নাই। মিসেস্ ওলে বুল খুব মানসিক অশান্তির মধ্যে কাটাইতেছিলেন। কেন না, তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যা ওলিয়াকে যে কোন কারণেই হৌক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। ওলিয়া আসিলেন না, নিবেদিতাকে কাছে পাইয়া মিসেস্ ওলে বুল কিছুটা শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাত্রে প্রলাপ সমানে চলিতে লাগিল। মৃত্যুর পর তাঁহার উইল ও তৎসংক্রান্ত টাকা কড়ির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে কি হইবে ভাবিয়া তিনি অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক নিবেদিতা ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

নিবেদিতা, মিসেস্ ওলে বুলের মৃত্যুর দুই চারিদিন পূর্বে পরিত্যক্তা কন্যা ওলিয়াকে জানাইলেন, কিন্তু ওলিয়া আসিয়াই নিবেদিতার সহিত হিংস্র কলহে প্রবৃত্ত হইল। ওলিয়া নিবেদিতাকে বলিল, "তুমি ভারতবর্ষ হইতে যাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছ। তুমি আমার মার অনেক টাকা নিয়াছ, এবং আরও অনেক টাকা নিতে আসিয়াছ। আমার মাকে তুমি যাদু করিয়াছ। এখানে মৃত্যু সময়েও তোমার আসিবার কি প্রয়োজন ছিল" — ইত্যাদি। নিবেদিতা ওলিয়ার অভিযোগ সমস্তই অস্বীকার করিলেন। তিনি ওলিয়ার সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মিসেস ওলে বুলের মৃত্যু হইল। ওলিয়া তাহার মায়ের উইল লইয়া মোকদ্দমা জুড়িয়া দিল, নিবেদিতা ঐ মোকদ্দমায় জড়িত হইলেন। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে (Spring) সম্ভবতঃ মার্চ মাসে — ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লতিকা ঘোষকে (বি, এ, কলিঃ, বি, লিট, অকস্‌ন) লেডি অবলা বসু এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা এইরূপ —

"নিবেদিতা তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে মিসেস্ ওলে বুলকে দেখিতে আমেরিকা গমন করেন। মিসেস্ ওলে বুল পেটের যন্ত্রণায় (খুব সম্ভবতঃ ক্যান্সার রোগে) অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নিবেদিতা ডাঃ নীলরতন সরকারের নিকট হইতে বেলের মোরব্বা মিসেস্ ওলে বুলের জন্য সংগ্রহ করিয়া

লইয়া যান। নিবেদিতার উপস্থিতকালেই মিসেস্ ওলে বুলের মৃত্যু হয়। মিসেস্ ওলে বুল তাঁহার উইলে রামকৃষ্ণ মিশনকে অনেক টাকা দান করিয়া যান। মিসেস্ ওলে বুলের কন্যা (ওলিয়া) রামকৃষ্ণ মিশনকে এত টাকা দেওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, নিবেদিতা তাহার মাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে। এবং নিবেদিতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবে বলিয়া শাসাইল। নিবেদিতা নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হইতেন, যদি না মিসেস্ ওলে বুলের ভ্রাতা ও তাঁহার পত্নী নিবেদিতাকে লুকাইয়া রাখিয়া গোপনে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিতেন। শোনা যায়, পরে মিসেস্ ওলে বুলের কন্যা তাহার ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু নিবেদিতা এই আঘাতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পড়ায় তাঁহার শরীর ও মন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার ছয়মাস পর মিসেস্ ওলে বুলের কন্যার রাজযক্ষ্মায় (গ্যালপিং থাইসিস) মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইয়া নিবেদিতার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়।”

কিন্তু ফরাসী জীবন চরিতে আছে, নিবেদিতার ভারতে ফিরিবার দুই মাস পর দুঃসংবাদ আসিল যে, ওলিয়া মোকদ্দমা চালু থাকায় সময়েই আত্মহত্যা করিয়াছে। নিবেদিতা এই সংবাদে অতিশয় মর্মাহত হইলেন। মিসেস্ ওলে বুলের ভ্রাতা নিবেদিতাকে জানাইলেন যে, মিসেস্ ওলে বুলের উইলের মোকদ্দমায় তিনি ভারতবর্ষে যাঁহাকে যে পরিমাণে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আদালতের অনুমতি অনুসারে দেওয়া হইবে। মোকদ্দমাটি ফাঁসিয়া যাওয়াতে নিবেদিতা নিশ্চই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রীতিকর ঘটনায় তাঁহার দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া গেল। এবং আর পাঁচ মাস পরেই তাঁহার ক্লান্ত দেহ হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করিবে।

ফরাসী জীবন চরিতকার ও লেডি অবলা বসুর কথার মধ্যে মূল ঘটনার সম্পূর্ণ মিল রহিয়া গিয়াছে। তবে নিবেদিতা ভারতে ফিরিবার পর, ওলিয়াব মৃত্যু দুই মাস পরে হয়, কি ছয় মাস পরে হয়, এই খানে তারিখে একটু গরমিল দেখা যায়। তাছাড়া ওলিয়া রাজযক্ষ্মায় মরে, কিংবা আত্মহত্যা করে, এখানেও গরমিল আছে।

সংসারের নিষ্ঠুর নিপীড়নে নিবেদিতার মহৎ হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ, তাঁহার শেষ জীবন অতিশয় বেদনাদায়ক। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু, তাঁহার পত্নী লেডী অবলা বসু ও গণেন মহারাজ না থাকিলে ভগিনী নিবেদিতার যে কি অবস্থা হইত তাহা ভাবা যায় না।

আন্তর্জাতিক কংগ্রেস — ১৯১১

লন্ডনে এই কংগ্রেস হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই কংগ্রেস উদ্বোধন করেন। লন্ডনের রাস্তায় প্ল্যাকার্ড মারা হইয়াছিল এই বলিয়া যে, “The light Comes

from the East." নিবেদিতা এই কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাইতে না পারিয়া তাঁহার প্রবন্ধটি ("The Position of Women In India") পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই কংগ্রেসের বক্তৃতাগুলি লইয়া যে গ্রন্থ ছাপা হয়, তাহাতে নিবেদিতার প্রবন্ধটিও ছাপা হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের নারী জাতির সহিত পাশ্চাত্য দেশের নারী জাতির তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশের নারী জাতির পারিবারিক আদর্শ ভারতের নারী জাতির পারিবারিক আদর্শের মত আধ্যাত্মিক ও পবিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর ভারত ও চীনের নারী জাতির নাগরিক আদর্শ (civic ideal) পাশ্চাত্য দেশের নারী জাতিদের মত হওয়া উচিত।

মৃত্যুর বৎসরে নিবেদিতা পণ্ডিত সমাজে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মহিলা। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার অতিশয় গুণমুগ্ধ ছিলেন। ডন সোসাইটির সুত্রপাত হইতেই নিবেদিতা ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সংশ্রবে আসিয়া ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

ডন পত্রিকা (Dawn) ১৯১৯

এই মৃত্যুর বৎসরেও এই পত্রিকাটিতে তাঁহার একটি প্রবন্ধ দেখিতে পাই "Unity of life and type in India"। ভারত দ্বিখন্ডিত হওয়ার পরেও যাঁহারা অখন্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন, তাঁহারা ভগিনী নিবেদিতার এই প্রবন্ধ হইতে যেরূপ প্রেরণা পাইবেন তাহা আর কোথা হইতেও পাইবেন না। ভারত এক এবং অভিভাজ্য (Indivisible), ইহা তিনি অরবিন্দ চন্দননগরে প্রস্থানের পরের মাসেও 'কর্মযোগীন' পত্রিকায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতা ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

এই সময়কার (১৯১১, জুলাই) একটি চিত্র আমরা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা হইতে পাই।

"এই সময় অর্থাৎ যখন মৃত্যুর যাত্রী হইয়া তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাইবেন, তাহার দুই মাস পূর্ব্বে, তিনি আমার নিকট হইতে একটি প্রস্তরময় 'প্রজ্ঞা পারমিতা'র বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, 'এ মূর্ত্তি আপনাকে দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি, আপনি এটি না নেন — ইহাই আমার ইচ্ছা।' তিনি বলিলেন, 'আমি আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।' একরূপ জোর করিয়াই সেই মুর্ত্তি লইয়া গিয়া তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ একটা কুলুঙ্গীর সঙ্গে গাঁথিয়া ফেলিয়া তিনি অতি যত্নে পুষ্প ও ধূপ দীপ দিয়া

প্রত্যহ তাহার সেবা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভীত কণ্ঠে ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, 'এ মূর্ত্তি আপনি গৃহে এখনই লইয়া যাউন, এবং আমাকে রক্ষা করুন। যেদিন হইতে এই মূর্ত্তি এই গৃহে আসিয়াছে, সেই দিন হইতে নিবেদিতার যে কত অশান্তি ঘটিয়াছে তাহা আর কি বলিবার? মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে শান্তি দিয়াছে মাত্র।' আমি বলিলাম, 'কেন? এ মূর্ত্তি তো স্যার জগদীশচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম — তাঁহাকে পাঠাইয়া দিন।' ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, 'ব্রাহ্ম হইলে কি হইবে! তাঁহারা কিছুতেই এ মূর্ত্তি নিতে সম্মত নহেন।' ক্রিশ্চিয়ানা এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমি বিগ্রহখানির অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

"দার্জ্জিলিং যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল। আমি তাহার দুইখানি তাঁহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন। পুস্তক পাইয়া যে তিনি কতরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব।"

"... যেদিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইতেছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া তিনি অনেক কবিকেই তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা দিতেন। — কিন্তু তিনি নিধুবাবুর গানের যত প্রশংসা করিতেন, এত আর কাহারো নহে। রামপ্রসাদ কি চন্ডীদাসেরও নয়।" (ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃঃ ৩৭২, ৭৩)

মৃত্যুপথযাত্রী নিবেদিতা — ১৯১১, অক্টোবর

১৯১১, সেপ্টেম্বর — জগদীশ চন্দ্র বসু ও তদীয় পত্নী লেডি অবলা বসু, ভগিনী নিবেদিতাকে তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে দার্জিলিং যাইবার অনুরোধ করিলেন। নিবেদিতা বলিলেন, "আপনারা আগে চলিয়া যান আমি পরে যাইতেছি।"

বসুদম্পতি নিবেদিতার আগমনের জন্য দার্জিলিং-এ অতি আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা সিকিম যাইবার জন্য বিছানাপত্র বাঁধিয়া ঘোড়া ভাড়া করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নিবেদিতা আসিলেই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। নিবেদিতা আসিলেন। কিন্তু আসিয়াই জ্বরে পড়িলেন। ইহা ১৯১১, ১লা অক্টোবর হইবে। দুইদিন পর ডাক্তার নীলরতন সরকার ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিলেন। দেখিয়াই বলিলেন, জীবনের আশা নেই — malignant dysentry

হইয়াছে। ডাক্তারেরা বলেন, "ম্যালেরিয়া জ্বরে intestinal type of malignant malaria হইয়া blood-dysentry হয়।" পাহাড়ের দেশে, এই ব্যাধি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়। কিন্তু রোগীকে তখন কলিকাতায় আনাও সম্ভব ছিল না। কলিকাতা থাকিতেই তাঁহার এই ব্যাধি হইয়াছিল। তিনি চাপিয়া রাখিয়াছিলেন — কাহাকেও বলেনও নাই, উপযুক্ত চিকিৎসাও করান নাই। তিনি শেষ মুহূর্ত্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। লেডি অবলা বসু রাত্রিদিন সর্বক্ষণ ভগিনী নিবেদিতার রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষায় রত ছিলেন। তিনি শেষ কয়েকদিন কাহারও সহিত কোন কথা বলেন নাই। চক্ষু বুজিয়া থাকিতেন। এই সময় তিনি প্রাণায়াম করিতেছিলেন। তাঁহার মন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার হাতে জপের মালা ছিল বটে, কিন্তু আঙ্গুল দ্বারা ঐ মালা সরাইতে ছিলেন না। বাহিরের জগৎ তাঁহার নিকট অস্পষ্ট ও ছায়ার মত অনুভূত হইতেছিল। — "ভাসে ব্যোমে ছায়াসম বিশ্ব চরাচর।" চিত্তের একাগ্রতা তাঁহাকে সমাধিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। এই সবিকল্প সমাধির অবস্থায় তাঁহার সমস্ত জীবন একটা স্রোতের মত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রবাহিত হইতেছিল।

এগার দিন তিনি এই নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার উপাস্য শিবের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও দেহরক্ষার পূর্বে শিবের সহিত কথা বলিতেছিলেন — "এখন পুট্‌লিপাট্‌লা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। অব শিব পার করো মেরে নইয়া — হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।"(কালিফোর্ণিয়া হইতে স্বামিজী কর্ত্তৃক লিখিত ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ তারিখের পত্র)।

গণেন মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে কিছু ফল (দোফলা গাছের আম) লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিবেদিতা ফলগুলি "প্রসাদ" বলিয়া গ্রহণ করিলেন। শেষ বারের মত, মৃত্যুর পূর্বে, তিনি বন্ধুগণকে লইয়া একত্র ভোজন করিলেন। তারপর জীবনের শেষ প্রার্থনা তিনি নিজেই করিলেন —

"অসতোমা সদগময় তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

"অসৎ হইতে আমাকে সৎ স্বরূপে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও!

হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।"

মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে বলিতে শোনা গেল— "The bark is sinking down, but I could lift the sun."—"আমার দেহ ভেলা ডুবিতেছে, কিন্তু আমি সূর্য্যকেও তুলিয়া ধরিতে পারি (এমন শক্তি আছে)।" (ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩৪১)।

নিবেদিতার মৃত্যু — ১৯১১, ১৩ই অক্টোবর

পরদিন (১৩ই অক্টোবর) অতি প্রত্যুষে তাঁহার মৃত্যু হইল। গণেন মহারাজ তাঁহার পায়ের ছাপ তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পূর্ব নির্দেশমত তাঁহার মৃতদেহে আগুন দেওয়া হইল। সব শেষ হইয়া গেল। কেবল পড়িয়া রহিল কয়েক মুষ্ঠি ভস্ম।

এই ভস্ম চারিটি স্থানে প্রেরিত হইল। প্রথমে, বেলুড় মঠ; দ্বিতীয় বাগবাজারে বশি সেনের মন্দিরে ('chapel'); তৃতীয় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এবং চতুর্থ, আয়ার্ল্যান্ডে তাঁহার নিজ গৃহে (Great Torringdon) পারিবারিক সমাধিস্থানে।*

বসু বিজ্ঞান মিন্দিরে কোন প্রস্তর ফলকে ভগিনী নিবেদিতার নাম লিখিত হয় নাই। শুধু একটি মহিলা হাতে প্রদীপ লইয়া যাইতেছেন, এই প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিয়া তাঁহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ রাখা হইয়াছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্ধকারে পথ প্রদর্শক। এই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্বরূপ মহীয়সী মহিলার ইহা উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ দার্জিলিং-এর শ্মশানে ভগিনী নিবেদিতার কোন স্মৃতি ফলক রাখেন নাই দেখিয়া অনেক বৎসর পরে স্বামী অভেদানন্দ ঐ পবিত্র শ্মশানভূমিতে একটি প্রস্তর ফলকে ভগিনী নিবেদিতার নামাঙ্কিত করিয়া প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

১। ভগিনী নিবেদিতা ও সভ্য জগতে নারীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা।

২। Gleanings from Sister Nivedita

(ক) The Indian National Congress

(খ) Footfalls of Indian History

---

* Yet another portion of the ashes of Nivedita lies between the honey-suckles, under the sign of the Cross in her family tomb at Great Torringdon."(Nivedita, Lizelle Reymond, p. 341)

(গ) The Web of Indian Life

৩। In MEMORIAM : a few tributes —

(ক) by S. K. Ratcliffe

(খ) by Rabindranath Tagore

(গ) by Ramananda Chatterjee

(ঘ) by H. W. Nevinson

(ঙ) by Prof. Patrick Geddes

ভগিনী নিবেদিতা ও সভ্যজগতে নারীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা

গত জুলাই মাসে (১৯১১) লন্ডন মহানগরীতে যে Inter-Racial Congress বা আন্তর্জাতিক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের পরলোকগতা পূজনীয়া ভগিনী নিবেদিতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সুসভ্য জাতি সকলের মধ্যে স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের শিখিবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। আমাদের এই জাতীয় জাগরণের দিনে, প্রাচীন ধর্ম্ম ও রীতিনীতির সহিত সম্যক্ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, পরিবার ও সমাজে স্ত্রীজাতির দেয় ও প্রাপ্য (duties and rights) সম্বন্ধে যতই বিশদ আলোচনা হয়, জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতির অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে, ভগিনী নিবেদিতা সাধারণ ভাবে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। সেদিন টাউনহলে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি রক্ষার জন্য যে সভা আহূত হয়, সেই সভায় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ভগিনী নিবেদিতাকে একজন Idealist, অর্থাৎ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিতা রমণী বলিয়া পরিচয় দেন। ইহার সত্যতা অতি সহজেই অনুভূত হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে, কোন জাতির সামাজিক রীতি নীতি আলোচনা করিতে হইলে, ঐ সমস্ত সামাজিক রীতি নীতির পশ্চাতে যে জাতীয় আদর্শ (ideals) বিদ্যমান, সেই সকল আদর্শের সহিত যথার্থ ভাবে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতে হইবে। এবং এইরূপ না করার ফলে আধুনিক খ্যাতনামা বহু সমাজবিজ্ঞানবিদ, কোন বিশেষ বিশেষ সভ্যতার উপর যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। সামাজিক রীতি নীতিগুলি জাতীয় আদর্শের বহিঃপ্রকাশ মাত্র (expressions of the ideals)। এবং ঐ সমস্ত আদর্শই সামাজিক জীবনের বিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, তদ্‌সংশ্লিষ্ট রীতি নীতিগুলিকে অবস্থার উপযোগীরূপে নিয়মিত ও চালিত করে। সুতরাং ভগিনী নিবেদিতার মতে কোন জাতির বিধান

ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেই জাতির আদর্শনুযায়ী, বিচার করিতে হইবে। এবং যদি প্রতিষ্ঠানগুলি (forms and institutions) কালক্রমে দূষিত হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য ঐ জাতীয় আদর্শগুলিকেই সব সময়ে নিন্দা করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে না। দেখিতে হইবে যে যদিও প্রতিষ্ঠান বা রীতি নীতিগুলি কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়াছে, তথাপি ঐ সমস্ত রীতি নীতিগুলি যে সকল উন্নত জাতীয় আদর্শের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেই সমস্ত উন্নত আদর্শকে যথাযথ অনুসরণ করিলে আবার দোষমুক্ত হইয়া সামাজিক জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার করিতে পারে কি না। যেখানে জাতীয় আদর্শকে অনুসরণ করিয়াও তাহা সম্ভবপর নয়, সেখানে অবশ্যই সেরূপ আদর্শকে পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে সেরূপ সম্ভব, — সেখানেও যদি বর্জন নীতি অবলম্বন করা হয়, এবং তাহার স্থানে সম্যক্ অবিচারিত বিদেশীয় রীতি নীতির অন্ধ অনুকরণ করা হয়, তবে 'পরধর্ম' নিশ্চয়ই 'ভয়াবহ' হইবে সন্দেহ নাই। অনেক খ্যাতনামা লেখক চীনদেশের বিবাহ প্রথায় স্ত্রীর কোন স্বতন্ত্র অধিকারের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া ইহার নিন্দা করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে — "That marriage can be brutalized is doubt-less as true in the case of China as in that of England." অর্থাৎ আদর্শের অপব্যবহার করিলে, চীনে কেন ইংল্যান্ডেও বিবাহ ব্যাপার পশুত্বের পদবীতে নামিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তিনি বলেন যে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, চীনের ঐ বিশেষ বিবাহ প্রথা, পশুত্বের দিকে না যাইয়া তাহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ দেবত্বের দিকেও আমাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারে কিনা। "All that we have a right to ask is, whether it has also the opposite possibility, and in what degree and frequency? যদি তাহা পারে ও চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর হয়, তবে এই জাগরণের দিনে, প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় উন্নত আদর্শের দিকেই ফিরাইয়া লইবার যথাযথ চেষ্টা করা উচিত।

কোন জাতির প্রচীন আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ভগিনী নিবেদিতার এই যে একটি শ্রদ্ধার দৃষ্টি; — শুধু শ্রদ্ধার নয়, বর্ত্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের সম্যক্ অনুমোদিত এই যে সংস্কারের নীতি ও প্রণালী, তাহা আমাদের দেশের সংস্কার ব্যবসায়ীদিগের (Professional reformers) বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ হওয়া উচিত।

শ্রেণীবিভাগ (Classificaton)

বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা কালে জগতের সমগ্র স্ত্রীজাতিকে ভগিনী নিবেদিতা যে দুই বিশেষ শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,

— তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে জগতের সমগ্র স্ত্রীজাতিকে শুধু এশিয়া ও ইউরোপে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। কেন না এশিয়ার নারীজাতির সাধারণ অবস্থার সঙ্গে হয়ত জাপানের স্ত্রীচরিত্রের সামঞ্জস্য হইবে না। আবার ইউরোপের স্ত্রীচরিত্রের সহিত আমেরিকার স্ত্রীচরিত্রেরও অনেক বিষয়ে বিরোধ হইবার আশঙ্কা আছে। এশিয়া ও ইউরোপ ছাড়িয়া দিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এরূপ শ্রেণীবিভাগেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমান ('modern') বা মধ্য যুগ ('medieval') এই দুইটি বিভাগে জগতের সমগ্র নারী জাতিকে আজ যদি কেহ শ্রেণীবদ্ধ করিতে যান, তবে তাহাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে, আদর্শের বিভিন্নতা বা বিশেষত্বের উপরেই আমরা একটা সত্যিকার শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। সমগ্র মানব সমাজ, অন্ততঃ নারীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে, দুইটি পৃথক আদর্শ দ্বারা বিভক্ত হইতে পারে। পৃথিবীর সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যে অনেকগুলি নাগরিক আদর্শ ('The civic ideal') দ্বারা আবার কতকগুলি পারিবারিক আদর্শ দ্বারা (The Family ideal) নিয়ন্ত্রিত। এক্ষণে ভগিনী নিবেদিতা সুসভ্য মানব সমাজের সমগ্র স্ত্রীজাতিকে, নাগরিক (Civic) ও পারিবারিক (family) এই দুই বৃহৎ আদর্শের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে আনিয়া দাঁড় করাইতে চান।*

নাগরিক আদর্শ (The Civic ideal)

নাগরিক আদর্শের নিদর্শন এই যে, যে সমাজ এইরূপ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত, সেই সমাজে বা রাষ্ট্রে (The State), স্ত্রী ও পুরুষ, পরিবার নিরপেক্ষ হইয়া, তাহাদের স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। এই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমানভাবে নাগরিক বা citizen, এই স্ত্রী ও পুরুষের নাগরিক জীবনের সহিত পরিবার অপেক্ষা রাষ্ট্রের (The State) সম্বন্ধই অধিকতর ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্র বা State ই সেখানে স্ত্রী বা পুরুষের ব্যক্তিত্বকে নিয়মিত করে। সেখানে পুরুষ বা স্ত্রী পরিবারের অধীনে না আসিয়াও শুধু নাগরিক ভাবেই জীবন যাপন করিতে পারে। এই নাগরিক আদর্শে স্ত্রী বা পুরুষের ব্যক্তিত্ব এত বেশী পরিস্ফুট হয় যে, সেখানে পারিবারিক জীবন স্ত্রী বা পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

---

* "Perhaps the only true classification is based on ideals and if so, we might divide human society, in so far as woman is concerned, in to communities dominated by the civic, and communities dominated by the family ideal." Sister Nivedita

আমেরিকাতে এই নাগরিক জীবনের আদর্শ (The civic ideal) এত বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে যে, সেখানে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই 'The American Citizen' এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়। এই নাগরিক আদর্শের প্রভাবে পারিবারিক বন্ধন বহু পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি অনেকে আশঙ্কা করেন যে পারিবারিক জীবনের মূল উপাদান যে যৌন পার্থক্য বা বিশেষত্ব, ক্রমে তাহা আর বড় একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসিবে না।*

ইংরেজ রমণীদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের যে দুর্দান্ত প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহার সম্মুখেও সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে এই নাগরিক জীবনের আদর্শই বিদ্যমান। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে, যখন কোন জাতি বা কোন বিশেষ যুগ, একটা নূতন রকমের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য মাতিয়া উঠে তখনই স্ত্রীজাতির অবস্থার মধ্যে, এই নাগরিক আদর্শের প্রভাব একটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করে।

আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ছাড়িয়া দিয়া, আমরা ফরাসী জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে ইতিহাস, তাহার মধ্যেও ফরাসী রমণীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি।

তবেই, নাগরিক জীবনের আদর্শ যে সমাজে প্রবল, সেই সমাজে পরিবার অপেক্ষা রাষ্ট্রই (The State) স্ত্রীজাতির বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরিবারের গন্ডী অতিক্রম করিয়া নারীর কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সার্থকতা খুঁজিতে বাহির হয়। এবং সেই সমাজে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, 'ব্যক্তিত্ব' স্বধীন ও প্রখর হইয়া দাঁড়ায়। এবং স্ত্রী বা পুরুষের এই দুর্দম ব্যক্তিত্বকে নিয়মিত করিবার ভার, পরিবার অপেক্ষা রাষ্ট্রের হাতে গিয়া পড়ে। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর পাশ্চাত্য দেশে যে সমস্ত অভ্যুত্থান হইয়াছে, গত একশত বৎসরের মধ্যে, নাগরিক আদর্শের প্রভাবে তত্রত্য স্ত্রীসমাজের অবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

পারিবারিক আদর্শ (The Family Ideal)

প্রাচ্যদেশের জাতিসমূহের মধ্যে কিন্তু, পারিবারিক জীবনের আদর্শ দ্বারাই স্ত্রীসমাজ প্রধানতঃ আবহমান কাল হইতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত সমাজে পরিবারই (The Family) স্ত্রীজাতির প্রধান কর্মক্ষেত্র। নারীর সর্বপ্রকার চেষ্টা

* "The civitas tends to ignore the family ... and in its fullest development may perhaps come to ignore the sex." — Sister Nivedita

ও সেবা পরিবারের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিত্বের সহিতই সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, প্রাচ্য দেশের সমাজে সাধারণতঃ পরিবারের সহিতই সমাজের সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত নহে।

প্রাচ্য দেশের মধ্যে, ইস্‌লাম, চীন, ও হিন্দুজাতির মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও, এই পারিবারিক আদর্শই স্ত্রীসমাজের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহ, চীন ও হিন্দুদের মধ্যে থাকিলেও ইস্‌লামের পারিবারিক জীবনেই অধিকতর প্রশ্রয় পাইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে প্রাচীনকালে সেমিটিক্ (Semitic) জাতিগণ স্ত্রীপ্রধান জাতি দিগের দ্বারা (Matriarchal races) বেষ্টিত ও অভিভূত হওয়াতে, নিজেদের মধ্যে ঠিক তাহার বিপরীত পুরুষপ্রধান (Patriarchal type) পারিবারিক জীবনের আদর্শকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।

ইস্‌লামে এই বিপরীত আদর্শের ঐকান্তিক পরিপুষ্টিই তত্রত্য সমাজ বিধানে পুরুষের বহুবিবাহের জন্য দায়ী। ইহা ইস্‌লামের শক্তি ও দর্বলতা উভয়েরই পরিচায়ক ("It is at once the strength and the weakness of the Islamic civilization.")। সম্প্রতি Bahaism ইস্‌লামে স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

চীনদেশে কন্যার বিশ ও বরের ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। পিতা ও মাতা সমানভাবে সন্তানের নিকট সম্মান লাভ করে। পিতামাতার প্রতি ভক্তি চীনসমাজে বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, — "the filial piety is the central virtue of Chinese life",— পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার পূজার জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয় তাহাতে সম্পূর্ণই পুত্রের অধিকার; কন্যারা সময় সময় সাহায্য করিতে পারেন মাত্র।

চীনের মত হিন্দুদের মধ্যেও বংশপরম্পরা পারিবারিক জীবনকে অক্ষত রাখা একটা ধর্ম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুদের মধ্যে একান্ন-পরিবারই স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে। বিবাহ চুক্তিমূলক নহে, — ধর্ম জীবনে অগ্রসর হইবার একটা সোপানমাত্র, — Sacrament। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে divorce, বা বিধবা বিবাহ, উভয়ই হিন্দু জাতির নিকট অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় — "the notion of divorce is as impossible as the remarriage of the widows is abhorrent." আধুনিক হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত।

চীন, হিন্দু ও ইস্‌লাম এই তিন জাতির মধ্যেই পরিবারের বাহিরে স্ত্রীজাতির

স্বাধীনভাবে মিশিবার তেমন সুযোগ নাই। তবে নিয়মের কড়াকড়ি স্থান ও কালভেদে একরকম নয়।

প্রাচ্যদেশে স্ত্রীজাতির ধনসম্পত্তির অধিকার

যে দেশে পরিবারের মধ্যেই স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতা লাভ করে, সে দেশে সাধারণতঃ জীবনযাত্রার জন্য পুরুষের উপরই স্ত্রীকে নির্ভর করিতে হইবে। তবে হিন্দুদের মধ্যে, স্ত্রীধনের উপর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্ত্রী তাহার স্ত্রীধন দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারেন। মুসলমান সমাজে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য, স্বামীকে বহু অর্থ যৌতুকরূপে গচ্ছিত রাখিতে হয়। শুনা যায় কলিকাতার প্রত্যেক মুসলমান গাড়োয়ান (Cabman) তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য সহস্রাধিক মুদ্রা সঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হয়। বিবাহ ভগ্ন হইলে স্ত্রীকে স্বামী ঐ টাকা দিতে বাধ্য। ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ইস্‌লামে স্ত্রীজাতির ভরণপোষণের ব্যবস্থার একটা আভাস ইহা হইতে আমরা প্রাপ্ত হই।

ভগিনী নিবেদিতা চীনদেশের স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই, এইরূপ বলিয়াছেন। তবে অসহায়া চীনা রমণীগণ স্বামী অথবা পিতার পরিবারে আশ্রয় পান হহাতে সন্দেহ নাই।

ভবিষৎ উন্নতির আশা

প্রাচ্য ভূখন্ডের মধ্যে ভারতবর্ষেই দার্শনিক চিন্তা বা নূতন আদর্শের উদ্বোধন লক্ষিত হয়। অন্যান্য দেশে ক্রমে এই আদর্শ সংক্রামিত হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে হিন্দুজাতির মধ্যে পারিবারিক জীবনের আদর্শ চরমোন্নতি লাভ করিয়াছে।* স্বামীর সাহায্য এখানে ধর্ম। মাতৃত্ব এখানে নারী জীবনের চরম সার্থকতার একটি শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। একদিন কোন হিন্দু রমণী নাকি তাঁহাকে অত্যন্ত গর্বের সহিত বলিয়াছিল যে — "আমরা হিন্দু নারী, একবার জন্মগ্রহণ করি — একবার মরি — এবং একবার মাত্র বিবাহ করি।"

ইউরোপের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে সেখানে রমণীগণ পরিবার বন্ধনকে অনেকটা শিথিল করিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছেন; এই রাষ্ট্র বা নাগরিক জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া তাঁহারা সমাজের দুর্গতি

*"In India, "the sanctity and sweetness of family life has been raised to the rank of a greatest culture, Wifehood is a religion, Motherhood a dream of perfection."

আরো বিস্তৃত ও সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করিবেন, — তাঁহাদের দাসীত্বও সেই সঙ্গে আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। প্রাচ্যদেশের রমণীগণের অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে* তাহাতে কালে তাঁহাদিগের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিয়া নাগরিক জীবনের আদর্শকে তাঁহাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু প্রাচ্যদেশের রমণীগণের নিকট হইতে কি পাশ্চাত্য দেশের রমণীদের কিছু শিখিবার নাই? ভগিনী নিবেদিতা বলেন — অবশ্য আছে। পারিবারিক জীবনের একনিষ্ঠ পবিত্রতা ("the sanctity of the family") এবং বিশেষতঃ বিবাহ বন্ধনের অবিচ্ছিন্নতা ("particularly of the inviolability of marriage") এ দেশের রমণীদের নিকট হইতে খুব শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষার বিষয়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে মনঃস্বিনী ভগিনী নিবেদিতা প্রাচ্যদেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষা ও নাগরিক জীবনের আদর্শকে বিকাশ করিতে চান। এবং পাশ্চাত্য দেশের নারীসমাজেও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করিতে কৃতসংকল্প। এই আন্তর্জাতিক সম্মিলনের দিনে আদর্শের বিনিময় দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের নারীজাতি যদি এইরূপ একটা পূর্ণতর বিকাশ ও সার্থকতার দিকে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করেন, তবে ভবিষ্যতের মানব সমাজ তাহা হইতে অনেক আশা করিতে পারে।

কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে যাহারা হিন্দুয়ানীর বড়াই করেন এবং ভগিনী নিবেদিতাকে একটা বিজয়ের সামগ্রী বলিয়া জাতীয় গর্বে স্ফীত হন, তাঁহারা অনেকেই এই অসামান্যা নারীর হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের উপর যে একটা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল, তাহার বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা করেন না। ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে আমরা হিন্দু সমাজের উপর তাঁহার শুধু এই গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের নয়, পরন্তু আধুনিক কালের উপযোগী এই ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লাভ করিব। তিনি বিজাতীয় হইয়াও আমাদের মত হিন্দু ছিলেন বলিয়া যেন আমরা আস্ফালন না করি। পরন্তু তিনি বিজাতীয় হইয়াও আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন — ইহা ভাবিয়া যেন তাঁহার স্মৃতি শিখরের দিকে করজোড় ও সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করি।**

---

* "The woman of the East is already embarked on a course of self transformation which can only be achieved by endowing her with a full measure of civic and intellectual personality."

** রচনাটি 'দেবালয়' পত্রিকার ৩য় সংখ্যা, ৪র্থ ভাগে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক।

GLEANINGS

THE INDIAN NATIONAL CONGRESS*

Young India is fascinated by the political spectacle in European countries; fascinated and also perhaps hypnotised by it. She imagines, perhaps, that until she can reproduce the bear – garden of opposite parties, she has failed to emulate the vigour and energy of Western patriotism. This, at best, is the only excuse for that evil fashion which has made its appearance amongst us, of mutual recrimination, and mutual attack. Those who are fighting on different parts of the self-same field are wasting time and ammunition by turning their weapons on each other. The fact is, young India has yet to realise that hers is not a movement of partisan politics at all, but a national, that is to say, a unanimous progression. There is no difference of opinion on national questions, amongst honest men, in India.

Put Hindus and Mahomedans together on a legislative Council. Have they not always to be reckoned with as a single opinion? Who cares where the Brahmin eats, or whom he invites to his dinner parties? Does he, and the Kayastha, or the Vaidya, make opposite demands on the University Senate? As citizens, in the Municipality, is the good of one the good of the others or not? It is wonderful how long dust can be thrown in men's eyes, by talk that absolutely contradicts facts. It is wonderful how far the hounds can be drawn on a false sent. A large amount of misdirected activity and confused political thought arises, in India, from the mere fact that the political method here is largely imitative, and is apt to imitate the wrong things.

The one thing that strikes a first time visitor to the Congress, for instance, — a vistitor who goes with a determination to ignore preconceptions and judge as far as possible from facts, — is the extraordinary agrument of all the members, from extreme right to extreme left. An old man in this corner considers it so ill-advised to make a certain pronouncement that he will

* গ্রন্থের পৃঃ ৮১ দ্রষ্টব্য।

retire from the body if its enunciation be insisted on. A youngster over there pooh-poohs this overcaution, and challenges the old man to express his disbelief in the principle asserted. As likely as not, the young man is right. But these are the disagreements, over which young India, looking on, is apt to lash itself into a fury of vituperation and despair! It is clear to every outsider in the meantime, that there is here no stuff of difference, whatsoever, and that at such a computation the ship of the national movement in India must be manned by educated India, solid.

Thus the Congress represents not a political, or partisan movement, but the political side of a national movement — a very different things. It is successful, not in proportion as it sees its debates carry weight in high quarters, not in proportion as its views are officially adopted, but in proportion to the ability and earnestness with which it conducts its ows deliberations, in proportion to the number which it can call together and make efficient in political methods, and in proportion to the information it can disseminate throughout the country on questions of national significance. If these fundamental facts be once clearly understood, it will matter very little there-after what form the resolutions take in Congress, matter very little for an act of politeness, more or less, or about number of adjectives in a given sentence. Far it will be understood that the real task of the congress is that of an educational body, educating its own members in that new mode of thinking and feeling which constitutes a sense of nationality; educating them in the habit of prompt and united action, of political trustiness, of communal open-eyedness; educating itself, finally, in the knowledge of a mutual sympathy that embraces every member of the vast household which dwells between the Himalyas and Cape Comarin, between Manipur and Arabian Sea.

This implies, however, that the main body of army is not in the Congress, that this congress as a whole is merely one side, — the political side, — an incomparably vaster, though

less definitely organised host. And by the antithesis, not opposition, between the efforts of the two, progression is secured. Thus, corresponding to the Congress, the National Movement must have another, and non-political limb, as it were. But at the same time it is clear that this non-political must have greater difficulty than the political element in difining to itself its own objective.

And yet a programme — not a rigid platform but a suggestive immanation is almost a necessity to it. What are the tasks that the National Movement has to face and in what order?

The task of all alike is one, — the education of the whole nation, in all its parts, in a common sentiment of unity with each other and with their soil. But it is a mistake to think that this education will in every case come scholastically. Reading and writing will facilitate it, but it will not wait for the schoolmaster. Alredy we have seen the women expressing themselves through the Swadeshi tapasya. In national and civic existence, this cause has given them a step onward and upward that will never be retraced. But while the appeal made to then sympathies so effectively by this cry of the Homeland, when made to the people themselves — the inarticulate, helpless masses — it must be by means of the industrial reconstruction which the Swadeshi Vow has necessitated. Practice first, theory afterwards. First, mutual love and loyalty, and secondly, all that ideas, all that instruction can do to give to that new-born consciouness of brotherhood, intellectual depth and steadiness. What the National Movement as a whole has to do then is to nationalise and vecalise two great areas of moral force that are at present nationally almost mute. These areas consist of the woman and the peasants.

We love that which we think of, we think of that which we know. First then we must build up a clear conception, and afterwards love will come of itself, and thus through the length and breadth of our vast country will go the thrill of the great thought: "This and no other is our Motherland. We are Indians every one."

Here then we have one extreme of the task of nationalisation to be carried out by that immense body of nation-makers to which every student and every educated man and woman in India belong by natural right. At the far end of this line are those whose task it is to carry the national colours to higher ground. Here are the original workers in science, in history, in art, in letters, sworn to let no Western pass them in the race for excellence, vowed, whatever be their task, to conquer in it or to die.

The question which arises here as to the nature and duties of the pioneer intellect is quite different from a similar question as applied to workers of the second generation. The great majority of the nation-making generation bear to missionaries and architects of that conscionsness the same relation that the ordinary grihasta bears the sadhu. They cannot live that life themselves, yet by their sympathy and silent support, they make the life a possibility. It is important, then, that these should realise that the motto for age is, — Mutual aid, self-organisation, co-operation.

The Grihasta wants a little of the courage of the martyr in vowing himself, not to a battle of the spirit but to a determined worldly success. His should be the undertaking in financing national associations, farmers and organisations, co-operative credit enterprises. But first and last above all, he needs to understand that it is by these movements, these undertakings, these studies, that education will actually be carried far and wide and that the movement for Indian Nationality will gradually transform itself into the Indian Nation.

Civic And National Ideals by Sister Nivedita of Ramakrishna – Vivekananda. (3rd edition, pp. 49–56)

FOOTFALLS OF INDIAN HISTORY

The men who write, with the energy of the thunderbolt, for the attainment of the common goal of heart and conscience,

must be men accustomed to combined action and sustained co-opration; men who know the grounds of their faith in one another; men who are familiar with certain outstanding principles of conduct, and constantly dominated by them. Such character, such experience, is built up for the service of the nation by social forms like those of tribe and crew and lion-hunt. The requisite discipline is conferred by the necessity of obedience on peril of death. The large outlook and due combination of readiness for war with love or peace are created by lifelong considerations of the common good and the way in which it is to be served by a clear mutual understanding. And all these results have been produced on mankind, unsought by its history and environment.

THE WEB OF INDIAN LIFE

India is actually a unity, but few of her people realise the fact, and fewer still feel the appropriate emotion. No parochial ambition can, at this juncture, save the Motherland. The Mahratta may not seek the good of Maharashtra, nor the Sikh of the Punjab. There must be no revival of forgotten feuds. Not in such things lie the thrill of a Nationalist. Rather all must unite in a common glorification of India and the whole Indian past. Each must recognise what the others have contributed. There must be thinkers able to take advantage of every accident in local history, and to turn it to the advantage of the one great cause. The passion of nationality was so strong in the Punjab, in Rajputana, and under Sivaji, that it broke even the power of the Moghul Empire. Yet the fact that she has never had any definite and consolidated form of her own may be the critical element in the history of Bengal, to make her the welder and fuser of all the provinces today.

* * *

To assimilate an ideal and make our own persons a demonstration of its power — this is not imitation. A merely

imitative apperhension of the West — like that of the clerk in his office, the constitutional agitator in politics, the manufacturer who knows only enough of mechanical industry for a cheek-by-jowl competition with Manchester—is indeed the parent of death to the Orient. But to achieve a living, forceful heart-to -heart appropriation of the Western energy and its immediate re-translation in Eastern terms, is not death but life.

—*The Oriental Woman*

A FEW TRIBUTES

by S. K. Ratcliffe

It is now ten years since there was published, under the title of the Web of Indian life a book which immediately found its appropriate public. In England and America it was recognised as belonging to that newer and finer type of interpretation as applied to the East of which our time has produced some notewarthy examples; in India it was welcomed as almost the first attempt on the part of an English writer to present the ethical and social ideals embodied in the Indian woman and family. Many among the readers of the book were aware that its author stoood in unique relation to the Indian people, that she had identified herself without reserve with their life and been dedicated wholly to their service; while not a few were assured that she was destined to carry forward the task thus brilliantly begun of revealing the inner side of Eastern society to the West. But this was not to be. Two years ago she died, with her work in India, as it seemed to those who knew her best and had most reason to hope greatly, hardly more than envisaged and planned.

Margaret Noble, known for some twelve years to multitudes of people throughout India as sister Nivedita, was of Irisih parentage and birth, and was born at Diengannon, Co. Tyrone in 1867.

Very soon afterwards her father, Samuel Richard Noble, entered the Lancashire Independent College in preparation for the Congregational ministry; but did not live to fullil his early promise. Margaret, his elder daughter, passed from school in the north of England to a teachers' training', and was fortunate enough to become acquainted in London with some of the most distinguished apostles of the New Education. Her practical experience was gained as a teacher in various girls' schools, and more especially in association with a Dutch lady who had established in a subrub of South London a school of a thoroughly modern type. In 1892 being in her twentyfifth year, she opened at Wimbledon a school of her own in which she strove to give expression to the broad and fine conception of girls' education with which then and afterwards she was identified. At Wimbledon, too, she was the centre of a group of friends, eager inquirers into everything, given to the discussion of books, ethics and society with the confident energy of youth, and begining in several directions social work which has sinse borne varied fruit. Always, however, with Margaret Nobel, intellectual inquiry was immediately related to what she regarded as her proper work— education, and she was one of the most active of those, mostly, like herself, concerned with the newer application of educational theory, who, twenty years or so ago, founded the Sesame Club, the earliest in this country of those social centres for men and women which have since so largely multiplied.

Busy with her school and kindred schemes, abounding in life, a keen reader and thinker, with a continuously wide circle of friends— such she was in 1895 when there came into her life the influence which in a few months altered its whole current and purpose.

It was, as she has recorded in *The Master as I saw him*, at a drawing-room meeting, in Novemder of the year just mentioned that Margarte Nobel for the first time met the Swami Vivekananda who had been recognised by many as a challenging

figure in the London of that time. He had appeared before the Parliament of Religions, held during the Chicago Exhibition of 1893, as the first of the modern missionaries of Hindusthan to the Western world. He was unknown and had come unheralded, but his first discourse — the one incident of this curious assembly that is remembered today — was epochmaking. From it must be dated the widespread interest in Hindu thought and religion and especially in the philosophy of Vedanta, which has been so unmistakable a feature of educated America during past two decades.

Befor leaving India, he had been known as the specially chosen disciple of Ramakrishna Paramhansa the Bengali Saint who had lived in a temple garden at Dakshineshwar on the river a few miles above Calcutta, whose life and sayings were known to European readers through one of Max Muller's later books. To Sister Nivedita herself the life lived by Ramakrishna extended and interpreted by his chief follower summed up the Hindu Consciousness and stood for the final proof far "the sufficiency of any single creed or conception to lead the soul to Good as its true goal."

But Ramakrishna was a pure devotee, his concern was simply the realisation in the individul of Divine. Vivekananda was a man of action. Not only did he carry westword the message of Vedantism but he had dreams of a renewal of the life of India through the infusion of fresh knowledge and renascent ideals. He stood entirely aloof from politics, yet it is hardly surprising that his younger followers should have acclaimed him as something more than a teacher of Vedantism — as, in truth, the prophet of New India in a sense which, it seems quite certain, he never for a moment intended.

The Swami left America for England in August 1895, and few weeks later he had begun lecturing in London. Miss Noble had few oppartunities of hearing him befor his return to America during the winter, but in the spring of 1896 he was back in London, and was holding a class in the house of an English

friend in St George's Road, near Victoria Station. There she was a constant and for a time a hostile and contentious hearer. Always passionately religious, she had in her girlhood become a member of the Anglican Church and was deeply responsive to its ritual and sentiment. But the doctrines of orthodoxy had long ceased to hold her intelligence, and at twentyeight, in the full tide of her manifold intellectual interests, she was, it may be supposed, as completely detached form the religious beliefs of her childhood as from the occult ideas by which at that time some among her friends were interested. The message of Swami Vivekananda went to the mark, little as she recognised it at that time. She disputed his assertions, fought him in the disscussion class, provided indeed the strongest antagonism which he had to meet at any of his London gatherings. But it is clear that from the first his influence was winning. About his teaching there was nothing that could be associated with any sector special doctrine. Although himself obeying the impulse and fulfilling the purpose of his master Ramakrishna, he dealt always impersonally with the body of truth common to all religions, and dwelt upon the neccessity, especially in the present stage of world history, for the exchange of idieas between people, and specially between East and West. He was, too, much more than a preacher. While glorifying the Indian past and the ancient contribution of his people to the intellectual wealth of the world, he was a man of modern outlook, incessantly framing concrete schemes for the social regeneration of India. He was bent upon the firm establishment of the Order of Ramakrishna, of which he was the head—an order which he designed not for cotemplation alone, but for social service, he would, if he could, have comandeered the vast resources for educational enterprise, and he was resolved to initiate some definite egency for the education of Indian women. The last was the part of his programme which, from an early stage of their acquaintance, Swami Vivekananda seems to have marked out as the special work of Margaret Noble, and before he left England, at the end of 1896, she

had come to recognise the call. A year later she sailed for India, landed in Calcutta at the beginning of 1898, and made her home with some American friends at Belur, on the river a short distance form the city, where was established the headquarters of the Ramakrishna Misson. Soon after her arrival in Bengal she was admitted to the Order by the name of Nivedita (the Dedicated) thereafter the name by which she was known, for beyond the bounds of her personal activity.

When people asked, as they constantly did, what Sister Nivedita was doing in India, her own answer was always simple. She was a teacher, and in India she was doing nothing else than applying the principles which she had learned from her own instructors in Europe. The Swami Vivekananda's practical aims had been predominantly educational, and his English disciple went to India primarily under the idea that her own part in the far-reaching work to which she had set hand was to make a school in an Indian home, where the methods and ideals of the educationist might be brought within the cloistral domain of the Estern wife and mother. Begining as a tiny kindergarten, the school grew steadly until it had a large attendance of little Hindu girls upto the marriageable age, and a still larger number of married women and widows. As conducted by Sister Nivedita and her colleagues the school involved no uprooting from familiar surroundings. Neither child nor woman was taken from her home into a foreign world, her schooling demended only a daily migration from one home to another in the same lane or word. The principle was, as Sister Nivedita herself expressed it, by means of familiar factors of her daily life so to educate the Indian girl as to enable her to realise those ends which are themselves integral aspirations of that life. There was no attempt to convert her to any religious or social system alien to her own, but rather, by means of her own customs and traditions, to develop her in harmony with Indian ideals, the teachers themselves following these ideals as far as they could be made practicable. It appeared to some that

Sister Nivedita, alike in her school and in the zenana, was in certain respects a reactionery influence— upholding the *Purdha* and child marriage and perpectual widow-hood as institutions essential to the preservation of the society which she had learned to admire. But she was far indeed form seeking to maintain the old unchanged. "Under the old scheme" she said, "woman found not only a dicipline but a career," yet she saw that this old scheme was a preparation and an opportunity fitted only to the soil in which it grew. To the Indian as to the European woman the modern revolution has brought a narrowing of her lot, and has worught bavoc with the traditional skill in handicraft. Today every Indian women can cook, and that will. But she can not sew, and she has "nothing but gossip and prayer, when the afternoon siesta is over, wherewith to occupy her leisure." Hence the Sister and her colleagues found it necessary to teach the wives and widows needlework of various kind. But it may well be that they themselves learned more of the irresistible movemment of the modern spirit in the orthodox world of Hinduism, when they found themselves met by an insistent demand form the young wives to be taught English so that they might become in some real sense the companions of their husbands ...

Beginnig thus, with the conviction that the European can work fruitfully in India only upon the basis of that perfect co-operation with the children of the soil, Sister Nivedita was led to make the great renunciation. The land to whose service she had devoted herself made an overwhelming appeal to her— its history and thought, its people and their life, its present in subjection and social transition. There could be no partial surrender with her. she gave herself utterly. Accepting the lot of the Indian woman, living as her neighbours lived, in a little native house severly devoid of all inessentials, she worked among them in all seasons ...

It needs not be said that this was the secret of her extraordinary power India instinctive by understands every form

of renunciation, and it would, I conceive, be impossible to exaggerate the impression made by this of absolute sincerity and self dedication, with its rejoicing acceptance of the austerity and simplicity of the old Indian order. But this, of course, was not all. No one who knows the India of the past decade will need to be told that the influence of her idea and example went out from the little house in Baghbazar in everwidening circles as the years went on. Sister Nivedita was the most fervent and convinced of nationalists : the word continually on her lips was Nationality. She had unbounded faith in the reserve power of the Indian people, and her call to the younger generation was a ringing challenge to them to rise, not only to the height of the past, but to the demand of the future. Unsparing she could be, at times, in criticising the Indian character, but she never bated a jot of her belief in the certainty of its triumph, and it went hard with any one, European or Asiatic, who offered any kind of insult or dispargement to the people of her adoption. The beginning of work in India coincided with a stage of extraordinary deadnes in public and intellectual life. But the change was already on the way, and she had the joy of seeing the growth of a new spirit, the rapid formation of new ideals, the down,as she believed, of a renascent national life and power. The influences that have gone to the shapping of the New India are still obscure, but this may be said with complete assurance that among them all there has been no single factor that has surpassed, or equalled, the character and life and words of Margaret Noble.

Her house was a wonderful rendezvous. Not often did one meet a Western visitor, save at those times when an English or American friend would be making a stay in Calcutta but now here else, so far as my experience went, was there an opportunity making acquintance with so many interesting types of the Indian world. There would come members of the Councils and Leaders in the public affairs of Bengal; Indian artists; men of letters; men of science; orators, teachers, journalists, students, frequently a travelled member of the Order of Ramakrishna,

occasionally a wandering scholar, not seldom a public man or leader of religion from a far province. The experience was beyond expression delightful, and its influence, you knew was to be felt along many lines.

......

She was, of all the men and women one has known, the most vividly alive. Having renounced all that most of us hold dearest, she had the right to be earnest and to demand earnestness, but not in the smallest degree did the over-mastering purpose of her being her from the sphere of personal relations. At all times she tailed with an absolute concentration, her inner life was intense, austere and deeply controlled. Yet never was anyone more wholly and exquisite by human, more lovely and spontaneous in the sharing of daily services and joys.

In matters of personal conduct, as in weightier affairs of public or social activity, she was an unequalled counsellar, so extraordinary in its rapidity and sureness was her judgement. And those to whom she gave ennobling gift of her friendship knew her as the most perfect of comrades, while they hold the memory of that gift as the world's highest benediction. They think of her years of sustained and intense endeavour, of her openeyed and impassioned search for truth, of the courage, that never quailed, the noble compassionate heart, they think of her tending the victims of famine and plague, or ministering day by day among the humble folk with whom her lot was cast : putting heart into the hopeless and defeated, showing to the young and perplexed the star of a glowing faith and purpose, royally spending all the powers of a rich intelligence and overwhelming humanity far all who called upon her in their need.

RABINDRANATH TAGORE

She had a versatile, all-round genius, and with that there was another thing in her nature : that was her militancy. She had power, and she exerted that power with full force on the lives of others ...

I have not noticed in any other human being the wonderful power that was hers of absolute dedication of herself. In her own personality there was nothing which could stand in the way of this utter self-dedication. No bodily need, weakness or craving, no European habites which had grown up from infancy, on familiar affection or tender tie of kinship, no slight received from her own people; no indiffernce, weakness and want of self-sacrifice on the part of those for whom she had devoted her life, could turn her aride. He who has seen her has seen the essential form of man, the form of the spirit ... We have been blessed in that we have witnessed that unconquered nobility of man in Sister Nivedita.

The life which Sister Nivedita gave for us was a very great life. There was no defrauding of us on her part — that is, she gave herself up fully for the service of India, she did not keep anything back for her own use. Every moment of every day she gave whatever was best in her, whatever was noblest. For this she underwent all the privation and poverty that is possible for man. Her resolve was this and this alone— that she would only give that which was genuine, she would not mix self with it in the least,— no, not her hunger or thirst, profit or loss, name or fame, neither fear nor shrinking, nor ease nor rest ...

She was in fact a Mother of the people ... When she uttered the words "Our People" the tone of absolute kinship which struck the ear was not heard from any another among us. Whoever has seen what reality there was in her love of the people, has surely understood that we — while giving perhaps our time, our money, even our life — have not been able to

give them our heart; we have not acquired the power to know the people as absolutely real and near ... I have seen that Sister Nivedita saw the common people, touched them, did not simply think of them mentally.

—Modern Review, 1912

RAMANANDA CHATTERJEE

In adopting-Hindusim as her religion she did not inted to figure as the Pope of a new-fangled variety of that ancient faith. Unlike some well-known persons, she did not care for favour of or influence with the powers that be, nor did she hanker after the fleshpots of Anglo-Indian society. Even among Indians she did not cultivate society of the superstitious and fashionable aristocrats, as even some Hindu sannyassis do. She lived anong the poor and needly in an antiquated house in the northern quarters of Calcutta, lived a life of great simplicity, austerity and benevolence. To this house, with its little garden plot and the verandah facing it she was as deeply attached as any queen could be to her palace and pleasure ground ... She was a better Chirstian for being a Hindu. Her idealism in all the realms of thought was tinged by religion. For this reason we found that in her appreciation of art, she gave the higher place to religious art in all the countries, and when we asked her once to pick out good European paintings for reproduction, the majority were religious and those she liked best were, she once told us, the Madonnas ...

What we found in her was that her love and reverence for India did not make her forget or cease to value the sturdy virtues of the West, her mental equipoise enabled her write:

"Our Indian ideals may be said to centre in purity, patience, and faithfulness. The English on the other hand worship truth, courage and discilpline. There would be a good deal of good done to both sides by a mutual expression of these ideals. Amongst our many needs we have none like that of recovering

a manly discipline, at once free and unfalterning, and perhaps the present state of marriage laws in the West is a sufficient evidence of all that they have to learn from us, in the ethics that knit society together. It might be said indeed that in civic discipline Westerns are incomparable, and in social orientals. We might learn form each other"

Every unprejudiced and thinking man must admit that when a person so highly gifted as she was combines a knowledge of occidental Christian civilisation form the inside with a knowledge of Hindu civilisation form the inside, the results of her comparative reflection must be valuable ... she had the advantage too of intimate contact with both orthodox Hindus and with many leading Brahmos. She has rendered good service to the world and to India by writing with power and insight of much that is noble in the Hindu home, Hindu life and Hindu insitutions ...

In the spheres of sociology she was a clear and vigorous thinker. In many passages of her writing she has shown that Indian political economy must be written from a different stand-point from that of the West.

She took a profound and active interest in Indian politics. she was a pronounced Nationalist,but though there was nothing of the invertebrate or indefinite in her political and in her other views, though her political opinions were quite radical and definite, she never could forgive partisanship or faction fights ir Indian politics and journalism. she believed in the great need and efficacy of our presenting a united front. Nothing grieved her more than quarrels in our ranks. The promotion of the cause of Indian nationality was with her a mission and a passion, as was women's education.

She was, if one may be pardoned a trite epithet,a born journalist. she wrote with brilliancy and originality and, even on commonplace thems, with something like inspired fervour. She could write with great fasility and on a great variety of topics and could therefore comply with the request of many editors for her paragrphs and articles. But nothing that she wrote was commonplace, even the most hackneyed topics were

invested with her pen with a new power and grace, and became connected with the first principles of human action and with the primal source of all strength. She could never be a hireling ... She was not rich and had many calls on her purse, but she did not write in a certain European review, she told us once, because the editor wanted her to write on prescribed topics, though the remuneration promised was handsome.

Form the very birth of this Review, she helped us with her contribution and suggestions and in other ways in an uncommon measure. Her unsparing criticism, in private conversation, of our shortcomings and faults, was of not less advantage to us. The sense of value of all this help is daily growing upon us, and we feel that we must not try to give it adequate expression ... She was indeed a sister and she was nivedita, the dedicated, to the service of all who came within the orbit of her life's way.

Modern Review, November, 1911
(pp. 514—17)

PROF. PATRICK GRDDES

The whole personality of Nivedita her face, her voice, her changing moods and daily life, were ever expressing the alternating reaction of outward environment and inward spirit which goes on throughout the individual and social life. She was open at once to the concrete and the abstract, to the scientific and the philosophic, and her many moods were in perpetual interplay — sparkling with keen observation, with humourous or poetic interpretation, or opallike, suffused mystical with moral fire. All came out in her talks, her occasional lectures — each a striking improvisation—now in gentlest perusariveness leading her audience into sympathetic understanding, or even approval, of some aspect or feature of Indian life, unknown or perhaps repellent befor, or again, bursting into indignant flush and veritable thunder upon our complacent and supercilious British philistinism.

With children she was at once a born teacher and a skilled one. She would sit with them upon the floor in the firelight and tell them her Cradle *Tales of Hinduism* with a power and charm even excelling her written version of them, so touching this or that ardent young soul to dream of following her to the utmost East. Or she might give them a literature lesson — say, on Shelley's Skylark — and here demand, and arouse, their observation and their imagination in touch with the poet's. This union of science and symbol, which we too easily let slip apart, was ever with her. Thus of our many memory portraits none comes back more vividly than of her in autum twilight, now crooning, now chanting, the Hymn to Agni over the glowing, dying ambers of a garden-fire. Strange though the words were, we still hear the refrain. It was the tongue, the music, of Orient in Occident, the expression of spirit in nature—a face, a voice, a glow with energy, at peace with night.

H. W. NEVINSON

It is as vainto describe Sister Nivedita in two pages as to reduce fire to a farmula and call it knowledge. There was, indeed, something flame-like about her, and not only her language but her whole vital personality often reminded me of fire. Like fire, this and like Shiva, Kali, and other Indian powers of the spirit, she was at once destructive and creative, terrible and benificent. There was no dull tolerance about her, and I suppose no one ever called her gentle. Even with friends her disagreement could be achivement, and her contradiction was very direct. In face of the enemy her eyes turned to glowing steel, and under anger they deepened in colour, like Garibaldi's. Her scorn of presumptous ignorance and indignation at worng were blasting. I do not doubt that rage lacerated her own heart, but she withered the enemy up. No one would call her gentle.

But of all nobly sympathetic natures she was among the

finest. She identified herself with the Indians among whom she lived as barely half a dozen men and women from these islandas have done before. I do not mean merely by her adoption of Hindu symbolism for thought, nor by her purified from of Hindu worship ... But her readiness to accept and interpret what was clearest and highest in Hindu thought her capacity not merely for understanding Indian life, but for discovering and so intensifying the ideal in its customs, and the indignant revolt kindled in her by the insolence, degradation,and maiming restriction to which every subject race is necessarily exposed — form such imaginative sympathy, I think, arose the extraordinary power which she exercised over the more thoughtful and active of the Indian patriots around her. I do not know whether on the religious side it could be said of her, as of the philosopher, she was "drunk with God" but on the side of daily life and political thought it might certainly be said that she was drunk with India ...

Spiritual as she was, here was no impractible or dreamy spirit. Whether teaching in her little school among poor Indian streets of Calcutta, or struggling against the famine and exploitation of Eastern Bengal, or awakening in young India the spirit which marked the growing consciousness of nationality, her eye was fixed not only on some eternal absorption in the Infinite, but on the eternal issuse of the present moment here ... For a spirit like hers was not likely to meet with anything but battle in this world, and it is as a soldier is the War of Liberation that I remember her — a soldier with a flaming sword.